২য় ভাগ | বৈশাখ ১৩০২ | ১ম সংখ্যা

নব বরষে।

রবির কিরণ
উঠেছে ফুটিয়া
পুলকে ভাসিছে
চারিধার,
হৃদয়ের প্রীতি-
ফুল গুলি লয়ে
দিতেগো এসেছি
উপহার ;

ভুলে সব কথা
মুছে দুঃখ ব্যথা
মিলি ভাই বোনে
হরষে,
হাতে হাতে ধ'রে
চলি সবে মোরা
যেন এই নব
বরষে।

আমাদের কথা।

আর একটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবী আপন পথে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি বছর পরে আবার সেই পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র এক বৎসরের কাজ শেষ করিয়া আবার নূতন বৎসরের কাজ আরম্ভ করিয়াছে। 'সখা ও সাথী'র বয়সও একটি বছর বাড়িয়াছে; পুরাতন গিয়াছে, নূতন আসিয়াছে, পুরাতন বর্ষের কাজ শেষ করিয়া সেও আজ নূতন বর্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহার ক্ষীণ বল এবং ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সেও আজ সকলের সাথে মিলিয়া কাজ করিবে।

সে তাহার ক্ষুদ্র শক্তি সামর্থ্যের কথা একবারও ভাবিতেছে না। সে অপরিমিত আকাঙ্ক্ষা এবং উৎসাহ বুকে লইয়া, সাজ গোজ করিয়া সকলের সাথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলের সাথে মিলিয়া কত কাজ করিবে। এ পথে যে সেই সকলের অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং একার্য্যে যে অপরিমিত শক্তি সামর্থ্যের আবশ্যক তাহা সে বুঝে না এবং বুঝিতে চাহেও না। সকলের সাথে মিলিয়া সেও তার নিজের কর্ত্তব্য টুকুর জন্য প্রাণপণ খাটিবে ইহাই তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য।

সে লক্ষ্য সে মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলে নাই। সে চলিতে চলিতে কতবার পড়িয়াছে, আবার ধূলা ঝাড়িয়া নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে! সে আপন ক্ষুদ্র শক্তি সামর্থ্য লইয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু তবুও সে নিরাশ বা নিরুৎসাহ হয় নাই। আকাঙ্ক্ষার আবেগে এবং আগ্রহের আতিশয্যে তাহার শক্তি সামর্থ্য যে অতি ক্ষুদ্র, তাহা তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে স্থানই পায় নাই, তাই সে বার বার পড়িয়াও আবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছে!

সে তাহার কাজের ফলাফলের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিতেছে না। সে যে টুকু তাহার কাজ বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহার প্রতিই তাহার একমাত্র লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য ধরিয়াই সেই বার বার পড়িয়াও চলিতে বিরত হইতেছে না। তাহার কাজ যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না, তাহা সে নিজে না বুঝিতেছে তাহা নয়। কিন্তু সে বলিতেছে যে, তোমরা আমার কাজের ফলাফলের বিচার করিবার আগে, আমি প্রাণপণে আমার লক্ষ্য ধরিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছি কি না এবং আমার চেষ্টা ও যত্নের কোন ক্রটী বা কর্ত্তব্য পালনে কোন অবহেলা হইতেছে কিনা, তাহাও বিচার করিয়া দেখিও।

সে যে বার বার পড়িয়াও, তাহার লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে, ইহা দ্বারাই তাহার বিচার হইবে এই তাহার আশা। সে যে তাহার কর্ত্তব্য পালনে, তাহার ক্ষুদ্র শক্তি সামর্থ্য টুকু লইয়া প্রাণপণ যুঝিতেছে, ইহাতে সকলের কাছে উৎসাহ পাইবে এই আশাই সে করিয়াছে। কিন্তু সে কোথাও উৎসাহের পরিবর্ত্তে উপহাস লাভ করিয়াছে, কোথাও তাহার ক্ষুদ্র চেষ্টায় বাধাও পাইয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র শক্তি টুকু লইয়া পথে চলিতে চলিতে, নানা বিঘ্ন বাধায় যখন একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখনও সে যাহাদিগের নিকট একটুকু সাহায্য—অন্ততঃ পক্ষে একটু উৎসাহ বাক্য আশা করিয়াছিল, তাহাও পায় নাই। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে, একটুকু সাহায্যের আশায়, একান্ত বিশ্বাসের সহিত যাঁহাদিগের দিকে হাত বাড়াইয়াছে, তাঁহারাও তাহাকে নিরাশ করিয়াছেন, সে বিষণ্ণ মুখে ফিরিয়া আসিয়াছে।

সে তাহার এই ক্ষুদ্র জীবনে অনেক শিখিয়াছে। মানুষ ঠেকিয়া শেখে, এবং ঠেকিয়া যে শিক্ষা হয়, তেমন শিক্ষা বোধ করি আর কিছুতেই হয় না। আর কোন শিক্ষা না হইলেও তাহার এ শিক্ষাটুকু হইয়াছে যে, নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে তাহার বাঁচিবার আশা করা বৃথা। যে পড়িয়া যায়, তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিবার লোক বড় অল্প, বরং তাহাকে নানা বিঘ্ন বাধা ও নিরাশার কথা বলিয়া নিরস্ত করিবার লোকই অধিক। শুধু তাহাই নয়, সে তাহার ক্ষুদ্র জীবনে ইহাও দেখিয়াছে যে, সে যে শুধু সাহায্য ও উৎসাহের পরিবর্ত্তে অবহেলা ও উপহাস পাইয়াছে তাহা নয়, তাহার ক্ষুদ্র দেহে সময়ে সময়ে কঠিন আঘাৎ পর্য্যন্ত পাইয়াছে। তাহার ক্ষীণ দেহ ও ক্ষুদ্র প্রাণটুকুর জন্য একটু নিরাপদ স্থান খুঁজিয়া লওয়া তাহার বিশেষ আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কেননা যাঁহাদিগকে সে মিত্র বলিয়া মনে করে, তাঁহারাও তাহার ক্ষুদ্র দেহে এই নিষ্ঠুর আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কিন্তু আজ আর সে কথা নহে। একদিকে সে যেমন উপহাস, অবহেলা ও কঠিন আঘাত পাইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে সে উৎসাহ, সাহায্য ও স্নেহ মমতাও যথেষ্ট পাইয়াছে। যাঁহারা তাহার ক্ষুদ্র চেষ্টায় উৎসাহ দিয়াছেন, নিরাশায় আশ্বাস দিয়াছেন, বিঘ্ন বাধায় সাহায্য করিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকে সে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের একান্ত প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে। যাঁহারা তাহাকে তাহা দেন নাই, যাঁহারা তাহার ক্ষুদ্র চেষ্টাকে উপহাস করিয়াছেন, তাহার ক্ষুদ্র দেহে কঠিন আঘাত করিয়াছেন, সে তাঁহাদিগকেও হৃদয়ের প্রীতি দিতেছে এবং এ আশাও করিতেছে যে, উপহাস, অবহেলা, ও কঠিন আঘাতের পরিবর্ত্তে উৎসাহ সাহায্য এবং স্নেহ মমতা পাইয়া, সে আগামী বর্ষে এই দিনে তাঁহাদিগকে প্রীতির সহিত কৃতজ্ঞতাও জানাইতে সক্ষম হইবে।

যে সকল গ্রাহকবর্গ আদর করিয়া 'সখা ও সাথী'কে স্থান দিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও সে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে, এবং আগামী বর্ষে সে তাঁহাদিগের আরও প্রিয় হইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছে।

যিনি সকল শুভ সংকল্পের সহায় ও সিদ্ধিদাতা, আমরা তাঁহাকে আজ স্মরণ করি।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজকার্য্যে অতি উচ্চ পদ এবং দেশে ও বিদেশে প্রভূত যশ ও সম্মান লাভ করিলেও একমাত্র চরিত্রের মাহাত্ম্যেই গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগের আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। বিদ্যার সহিত বিনয়, উচ্চপদের সহিত অমায়িকতা, যশ ও প্রতিপত্তির সহিত শিষ্টাচারের এমন মিলন কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির সাধুতায় এবং চরিত্রের মাধুর্য্যে তিনি দেশের লোকের গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সহরতলী নারিকেলডাঙ্গায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাসের তিন বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুতে তাঁহার সমস্ত ভারই মাতার উপর পড়ে। গুরুদাসের মাতা একটি আদর্শ রমণী ছিলেন এবং গুরুদাস তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।

গুরুদাস এই অল্প বয়সে পিতৃহীন হইলেন; তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া আপনার পিতৃগৃহে গেলেন এবং সেখানে ছেলের লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বিদ্যালয়ে গুরুদাস যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার ফল স্বরূপ প্রতি পরীক্ষায় পুরস্কার এবং পরিশেষে অতি উচ্চ রাজপদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং উচ্চতর শিক্ষা তিনি তাঁহার মাতার কাছে পাইয়াছিলেন এবং তাহাতেই তিনি দেশ বাসীর এত প্রিয় হইয়াছেন। বিনয় শিষ্টাচার, নিষ্ঠা, সাধুতা, অমায়িকতা প্রভৃতি যে সদ্‌গুণ গুলি তাঁহার চরিত্রের ভূষণ, তাহা তিনি তাঁহার মাতার কাছেই পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই মাতা অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং তাঁহার শিক্ষা ও সদুপদেশই গুরুদাসের চরিত্র গঠনের প্রধান উপাদান ছিল। ছেলেবেলার একটি ঘটনা গুরুদাস বলিয়াছেন, তাহা এই খানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—

"যখন আমি চারি বৎসরের, সেই কালে ঠাকুর দালানের সিঁড়িতে ইট এবং মাটীর ঢিল লইয়া খেলা করিতেছিলাম, মাসী ঠাকুরাণী ঠাকুরের ভোগ লইয়া যাইবার সময় আমাকে ধমক দিয়া খেলার সামগ্রী পদ দ্বারা ঠেলিয়া ফেলিয়া দেন। তাহাতে আমার বড় রাগ হয় এবং রাগবশতঃ এক ঢিল তাঁহার পায়ে ছুড়িয়া মারি, তাহাতে আঘাত লাগে। এই ঘটনায় মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, ও আমাকে ক্রমাগত দশ বার ঘণ্টা ভর্ৎসনা করেন। সেই হইতে আমি ও রূপ কার্য্য জীবনে কখনও করি নাই। আমার মাতুল আমাকে আদর দেখাইতেছিলেন, কিন্তু জননী তাহার প্রতিবাদ করিলেন। এই ঘটনাটি আমার চিরস্মরণীয় এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।"

পুত্রের শিক্ষা ও পুত্রের চরিত্র গঠনে মাতার কতদূর দৃষ্টি এবং আগ্রহ ছিল এবং গুরুদাসও মাতার উপদেশে কি রূপ ভক্তি করিতেন এবং তাহা জীবনে পালন করিতেন, উল্লিখিত ঘটনাটিতে তাহা বেশ বুঝা যায়।
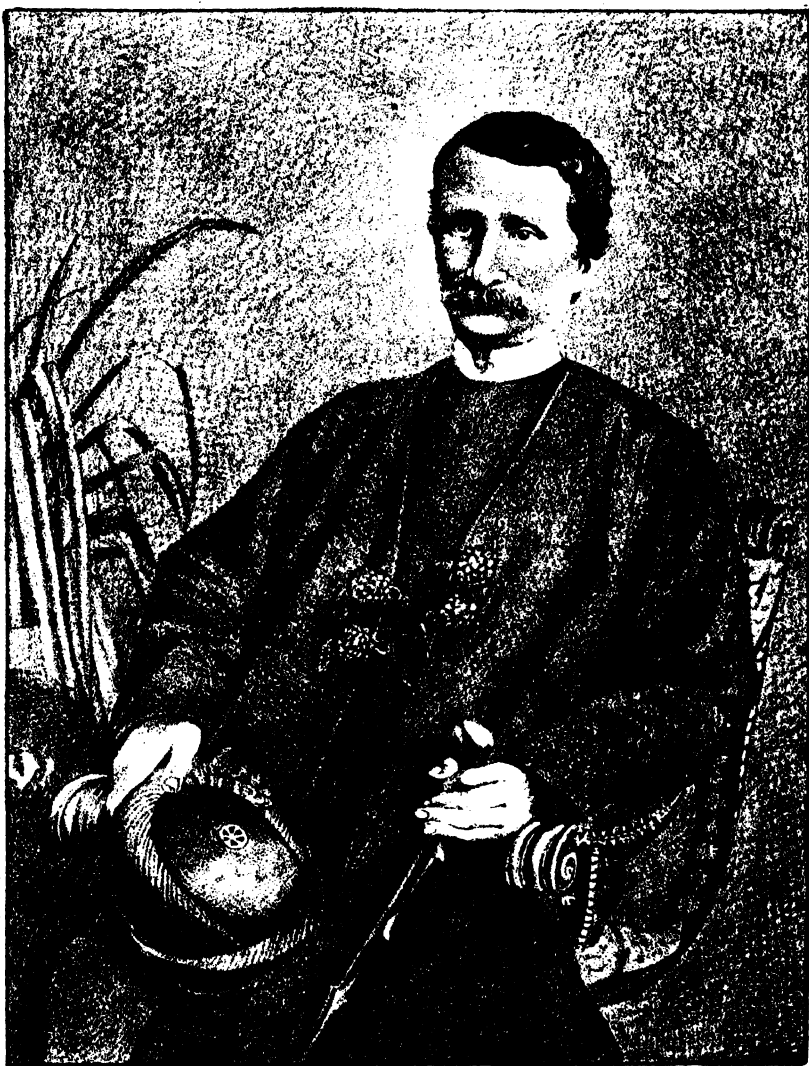
Gooroo Dass Banerjee

বাল্যকাল হইতেই গুরুদাসের পাঠের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হন, তখন তাঁহার বয়স যোল বৎসর। পরীক্ষার জন্য অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িতেন, তাহাতে তাঁহার মাতা বলিয়াছিলেন,—"এত পরিশ্রম করিলে কি হইবে? ঠাকুরের উপর নির্ভর রাখিয়া পরিমিত পরিশ্রম কর, যদি হবার হয় তাতেই হবে।" ঈশ্বরের উপর এমন সরল নির্ভরের ভাব কয়জনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়? পরমেশ্বরের কৃপা ভিন্ন কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না, গুরুদাসের মাতা সর্ব্বদাই তাঁহাকে এই কথা বলিতেন; এই জন্য গুরুদাসও মাতার ন্যায় একান্ত বিশ্বাসী এবং নির্ভরশীল।

গুরুদাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাঠে গুরুদাসের অতিশয় অনুরাগ ছিল; এল এ পরীক্ষায়ও যাহাতে বৃত্তি পাইতে পারেন, তাহার জন্য অধিকতর উৎসাহের সহিত পাঠে মনোযোগী হইলেন। তাঁহাকে এই রূপ পরিশ্রম করিতে দেখিয়া তাঁহার মাতা বলিয়াছিলেন,—"বেশী আশা করা ভাল নয়, যদি পাশ না হও, কি করিবে?" অপরিমিত আশা ও আকাঙ্ক্ষাই মানুষের দুঃখের একটি প্রধান কারণ। পুত্র যে প্রকার পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার আশানুরূপ ফল না হইলে শেষে ইহার জন্য কষ্ট পাইতে হইবে, এই আশাঙ্কায়ই মাতা তাঁহাকে এ কথা বলিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস বি এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইলেন এবং পর বৎসর এম এ পরীক্ষায় এবং তার পর বৎসর বি এল পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণ পদক লাভ করিলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস ডি, এল (Doctor of Law) উপাধি প্রাপ্ত হন। গুরুদাস কলেজের একজন অতি উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন; একদিকে তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে যেমন সকলে প্রীত হইত, তেমনি অন্যদিকে তাঁহার প্রতিভায় সকলে মুগ্ধ হইত। প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্য্যন্ত গুরুদাস সমান প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এম, এ. পাশ হওয়ার পরেই গুরুদাস প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন; কিন্তু বেশী দিন এ কার্য্য করেন নাই। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বহরমপুর কলেজে আইন শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন এবং ছয় বৎসর কাল এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এইস্থানে ওকালতিতেও তাঁহার বিশেষ পসার ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। প্রতি মাসে হাজার, বারশত টাকা উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু মাতার ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হইল। সেই উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"জননীর বিশেষ অনুরোধেই কলিকাতায় আসিতে হইল, আমার ইচ্ছা ছিল না। তথায় বেশী অর্থ লাভের প্রত্যাশা ছিল। এখন দেখিতেছি, তাঁর কথায় মঙ্গল হইয়াছে। তাঁহার শিক্ষার গুণে অর্থ উপার্জ্জনের লালসাও আমার কমিয়া গিয়াছে।"

মাতার শিক্ষায় তাঁহার কি প্রকার শ্রদ্ধা ও আপনাকে তাহাতে কিপ্রকার লাভবান মনে করিতেন, তাহা ইহাতে বেশ বুঝা যায়।

কলিকাতায় আসিয়া গুরুদাস হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিলেন। এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হন। হাইকোর্টে ওকালতিতে তাঁহার বিশেষ পসার প্রতিপত্তি হইল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ছোটলাটের আইন সভার সভ্য মনোনীত করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সম্মানিত করেন। এবং পরিশেষে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ, হাইকোর্টের জজের পদ প্রদান করিয়া, গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুদাসকে ভাইস্‌চান্সেলার মনোনীত করেন, এপর্য্যন্ত এদেশীয় আর কেহই ঐ সম্মানের পদে মনোনীত হন নাই।

গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও গুরুদাস দেশহিতকর সকল কার্য্যেই অতিশয় উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত যোগ দিয়া থাকেন; এবং এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনেকেরই অনুকরণ যোগ্য। এপ্রকার উচ্চ পদস্থ হইয়াও সকল প্রকার সৎকার্য্যে এমন উৎসাহ ও সহানুভূতি অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়; এ বিষয়ে গুরুদাস আমাদের দেশে আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেশমধ্যে শিক্ষা প্রচার, বালকদিগের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতি, স্ত্রীশিক্ষা, অনাথ আতুরদের আশ্রয় দান, মূক ও বধিরদের শিক্ষা,—যে কোন সদনুষ্ঠান হউক, গুরুদাস অর্থ, সহানুভূতি, উপদেশ ও উৎসাহ দ্বারা অকাতরে সাহায্য করিয়া থাকেন; তিনি কাহাকেও বিমুখ করেন না।

নিষ্ঠা তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব, এমন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি এখনকার দিনে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। নিষ্ঠা, বিনয়, সরলতা, শিষ্টাচার, সাধুতা প্রভৃতি সদগুণে গুরুদাস দেশের লোকের ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন এবং একটি উৎকৃষ্ট অনুকরণ যোগ্য আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন।

সাধুতার পুরস্কার।

প্রায় পাঁচটা। সমস্ত স্কুল কলেজের ছুটি হইয়াছে। রাস্তার দুইধার দিয়া স্কুলের ছেলেরা হাসি গল্প করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছে। আফিষের বাবুরাও দিনান্তে আফিষের কার্য্যভার হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাড়ী ফিরিতেছেন।

বহুবাজারের এক ময়রা দোকানের কাছে বড়ই ভিড়। অনেকে বাড়ী ফিরিবার সময় সেই দোকান হইতে খাবার কিনিয়া লইয়া যায়। অতি পরিপাটী খাবার তৈয়ারী করে বলিয়া দোকানটির বিলক্ষণ পসার।

ভূতনাথ (ভূতি) চট্টোপাধ্যায় স্কুলের ছুটির পর সেই ময়রাদোকানের সম্মুখ দিয়া বাড়ী যাইতেছিল। দোকানে কত ভালভাল খাবার তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে। মালপোয়া, রসগোল্লা, সন্দেশ, লুচি, কচুরি, মোহনভোগ সব পরিষ্কার ধব ধব করিতেছে। সেই সমস্ত জিনিস ও দোকানের সম্মুখের লোকের ভিড়ের দিকে ভূতির চক্ষু পড়াতে কৌতূহল বশতঃ সে তথায় একটু দাঁড়াইল। সমস্ত দিনের পর ক্ষুধায় ভূতির পেট জ্বলিতেছিল। দোকানে সেই সমস্ত খাবার সাজান রহিয়াছে এবং তাহা হইতে যাহার যাহা ইচ্ছা কিনিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া সে ভাবিল,—"আচ্ছা, এরা ত কত পয়সা খরচ করিয়া যাহার যাহা খুসি কিনিয়া লইয়া যাইতেছে; কাহার ও কোনরূপ আটকাইতেছেনা; আর কত লোক—আমাদের মত গরীব দুঃখী কত লোক,—পেট ভরিয়া দু'টি ভাত ও পায়না! এরূপ কেন হয়?"

ভূতিদের অবস্থা পূর্ব্বে যাহাই থাক, তাহার পিতা লোকনাথ বাবুর মৃত্যুর পর তাহারা এখন বড়ই গরীব হইয়া পড়িয়াছে। লোকনাথ বাবু এক সওদাগর আফিষে কর্ম্ম করিতেন। মৃত্যুর সময় তিনি যৎসামান্য যাহাকিছু রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে অতিকষ্টে ভূতনাথদের সংসার চলে। সংসারে কেবল মাতা ও তাহারা, দুই ভাইভগ্নী; গৃহে মাতা ভিন্ন আর কোন অভিভাবক নাই। ভূতির বয়স তখনও নয় বৎসর পার হয় নাই। তাহার ভগ্নী সুধার বয়স সাত বৎসর। সেই সজ্জীকৃত সন্দেশ রসোগোল্লা ইত্যাদির দিকে ভূতিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে দেখিয়া, দোকানের যে লোকটি খরিদ্দারকে জিনিস পত্র দিতেছিল সে অত্যন্ত কর্কশ ভাবে বলিল,—"ওগো ছেলে, তুমি হাঁ ক'রে কি দেখ্‌ছ? কেন ওখানে দাঁড়িয়ে ভিড় কচ্ছ, ঘরে যাওনা? বাড়ী কাজ কর্ম্ম নেই কি?"

সেই ধমক খাইয়া ভূতি চমকিয়া উঠিয়া দুই তিন হাত সরিয়া পড়িল। মনে করিল—"কেন এ লোকটি আমায় এরূপ কর্কশ কথা বলিতেছে? আমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছি তাহাতে উহার কি ক্ষতি হইতেছে।" তখন সেই দোকানী ভূতিকে লক্ষ্য করিয়া আরও অধিক কর্কশ ভাবে বলিল—"তবুও ওখানে দাঁড়িয়ে আছ? এ কোথাকার ছেলে গা! তুমি কেন ওখানে

দাঁড়িয়ে ভিড় কচ্ছ ? কেন খদ্দেরের যাতায়াতের অসুবিধে কচ্ছ ? ওখানে ও রকম হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলে সন্দেশ রসগোল্লা কি মুখের মধ্যে লাফিয়ে পড়বে ? কোথাকার উৎপাত গা ?"

সেই কটূক্তি গুলি শুনিয়া ভূতনাথ লজ্জায় ও কষ্টে মনের মধ্যে মরিয়া গেল। দোকানের কাছে আর তিলার্দ্ধ দেরী না করিয়া রাস্তার অপর ফুট্‌পাথে চলিয়া গেল। অপমানের ত কথাই নাই ; তাহা ছাড়া অনুতাপে তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। কেন সে ঐ দোকানের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর কেনই বা এরূপ অপমান ভোগ করিল ? কেন ঐ সাজান রাশীকৃত খাবারের দিকে বারংবার তাহার দৃষ্টি যাইতেছিল ? সে গরীবের ছেলে, কোন মতে শাকান্ন খাইয়া দিন পাত করে ; সন্দেশ রসগোল্লার আকাঙ্ক্ষা তাহার কেন হইবে ? ক্ষুধায় তাহার পেট জ্বলিতেছিল বলিয়া যাহা কিনিবার তাহার শক্তি নাই, তাহাতে তাহার কেন লোভ যাইবে ? ভূতি মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিল। আবার তখনই পূর্ব্বস্মৃতি তাহার মনে উদয় হইল। তাহার পিতা লোকনাথ বাবু থাকিতে কত সন্দেশ রসগোল্লা তাহারা খাইতে পাইয়াছে। আফিষ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার পিতা খাবার আনাইয়াছেন, কত যত্ন ও আদর করিয়া ভূতিকে ও সুধাকে খাওয়াইয়াছেন। কত ভাল কথা বলিয়া তাহাদের দুই ভাই বোনকে উপদেশ দিয়াছেন। সেই সব উপদেশ ভূতির মনে এখন বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। লোকনাথ বাবু সর্ব্বদাই বলিতেন—"ঈশ্বর যখন যাহাকে যে অবস্থায় রাখেন, সে যেন সেই ভাবেই থাকে। বাবা, কখনও তোমরা দুরাকাঙ্ক্ষা করিয়া পাপ কিনিও না। দুরাকাঙ্ক্ষাই অসুখের মূল, একথাটি যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।"

পিতার সেই সদুপদেশের মর্ম্ম ভূতি আজ জীবনে প্রথম অনুভব করিতে পারিল। তাহার দুইচক্ষু হইতে দুধারে জল বহিতে লাগিল। এই সময় হঠাৎ সে দেখিতে পাইল যে, একটি বাবু খাবার হাতে করিয়া সেই দোকান হইতে রাস্তার অপর পার্শ্বে তাহারই দিকে আসিতেছেন। বাবুটি তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন—"কেন বাবা কাঁদ্‌ছ ? দোকানী শক্ত কথা বলেছে সেই জন্য ? ওদের ও কথা ধরতে নাই। তুমি ধর দেখি, এই খাবার নেও, বাড়ীতে গিয়া খাও। তোমার আর কে আছে ?"

ভূতি দেখিল একটি ঠোঙ্গায় করিয়া কয়েকটি সন্দেশ, খানিকটা মোহনভোগ ও কয়েক খানি লুচি আনিয়া সেই বাবুটি তাহাকে দিতেছেন। সে একটু বিস্মিত হইল। কেন সেই বাবুটি ওরূপ অযাচিত ভাবে তাহাকে খাবার দিতেছেন ! ভূতি অত্যন্ত জড়সড় বোধ করিতে লাগিল ; কিছুতেই ঠোঙ্গাটি সেই বাবুর হাত হইতে নিতে সাহস পাইলনা। তখন সেই ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন—"কেন বাবা, অমন কুণ্ঠিত হচ্ছ ? আমি তোমাকে ভাল বেসে দিচ্ছি। তুমি যদি এ না নাও ত আমি বড় দুঃখিত হব।"

বাবুটির সেই করুণাপূর্ণ মিষ্ট কথা গুলি শুনিয়া ভূতির দুই চক্ষের রুদ্ধ অশ্রু আবার বহিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তাঁহার সেই মিষ্ট কথায়, ও বারংবার অনুরোধে তাঁহার হস্ত হইতে

সেই মিষ্টান্নের ঠোঙ্গাটি ভূতির লইতে হইল। বাবুটি তখন খুসি হইয়া চলিয়া গেলেন। ভূতি ও একপা দুইপা করিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। পথে সুধাকে মনে পড়িল। কত দিন সে বলিয়াছে—"দাদা, স্কুল থেকে আস্‌বার সময় খাবার নিয়ে এস না কেন? কত দিন আমরা খাবার খাইনে। মার কাছে চাইলে মা কাঁদে, তাই মার কাছে আমি আর চাই নে। তুমি কেন আননা?" আজ সুধার সেই সাধ মিটাইতে পারিবে মনে করিয়া ভূতনাথ কত সুখ বোধ করিতে লাগিল।

ভূতি সেই খাবারের ঠোঙ্গা হাতে করিয়া যেমন বাড়ী উপস্থিত হইল, সুধা দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"কি এনেছ দাদা! আমায় দেখাও না?" তখন সুধার হাতে খাবারের ঠোঙ্গাটি দিয়া ভূতি স্কুলের পুস্তকাদি রাখিতে গেল। সেই খাবার দেখিয়া সুধা নাচিতে নাচিতে ঠোঙ্গাটি নিয়া মায়ের কাছে রাখিয়া বলিল—"দেখ মা, দাদা আজ খাবার এনেছে; কেমন ভাল খাবার।" ভূতির মা উহা দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া ভূতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি বাবা, এ খাবার কোথায় পেলে, কারুর কাছ থেকে চেয়ে আননি ত?" পাছে ভূতি কাহারও নিকট হইতে ঐ খাবার ভিক্ষা করিয়া আনিয়া থাকে এই ভাবিয়া ভূতির মা প্রথমত একটু উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন ভূতি মাতার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিল। শুনিয়া ভূতির মার চক্ষে জল আসিল। সুধা দোকানীর সেই কর্কশ ও কটু কথা শুনিয়া রাগ করিয়া বলিল—"কেন দাদা, দোকানী তোমাকে ওরূপ কড়া কথা বলিল? তোমার রস্তায় দাঁড়ানতে তার কি হয়েছিল! তারা বড় খারাপ লোক ত! কিন্তু সেই বাবুটি কি ভাল লোক! কেন সব লোক অমন হয় না?"

ভূতির মা বলিলেন—"মা, আর কেহ নয়, ঈশ্বর দিয়েছেন মনেকরেই এখন এই খাবার দুই ভাইবোনে খাও। তিনি না দিলে আর কেহ দিতে পারে না।"

ভূতি ও সুধা তখন মহা আহ্লাদে খাবার খাইতে লাগিল। কিন্তু খানিকটা খাইয়াই সুধা হঠাৎ একটা বিষম খাইয়া চক্ষু স্থির করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং খক্ খক্ করিয়া কাসিতে লাগিল। ভূতির মা বুঝিলেন সুধার গলার মধ্যে খাবার বাধিয়াছে। তিনি সুধার বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন, মাথায় ফু দিতে লাগিলেন; কিন্তু সুধার সেই কাসি কোন মতে থামিল না এবং গলায় যাহা বাধিয়াছিল তাহাও নামিল না। তাহার চক্ষু মুখ লাল হইয়া উঠিল। ভূতির মা অত্যন্ত ভীতা হইলেন। ভূতিরও ভয়ে মুখ শুকাইয়া গেল। এই সময় খক্ করিয়া আর একবার কাসিতে শাদা একটা কি জিনিস সুধার গলা হইতে বাহির হইল। ভূতি ও ভূতির মা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন একটি আধুলী। ভূতির মা বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ, এখনই ত আমার মেয়ে যাইতেছিল। আর একটু থাকিলেই ত দম আটকাইয়া সুধা মারা পড়িত।" ভূতি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"মা, কেন এ খাবার আমি এনেছিলাম। সুধাকে ত আজ আমি মারতে বসেছিলাম।" ভূতির মা বলিলেন—"বাবা, তোমার কি দোষ? পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেও যে সুধা রক্ষা পাইয়াছে।"

সুধা তখন মায়ের বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া

হাঁপাইতেছিল। ব্যাপারটা এই—ময়রা দোকানে অসাবধানতা বশতঃ মোহনভোগ তৈয়ারী করার সময় একটি আধুলী কি প্রকারে সেই মোহনভোগের খোলার মধ্যে পড়িয়া যায়; উহা সেই মোহনভোগের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছিল। সুধা যেমন খানিকটা মোহনভোগ মুখে দিয়া গিলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন তাহার সঙ্গে সেই আধুলীটি তাহার গলায় আটকাইয়া গিয়াছিল।

ভূতিকে তাহার মা বলিলেন—"বাবা, আধুলীটি তুলিয়া রাখ, কাল স্কুল হইতে আসার সময় উহা সেই ময়রাদের দিয়ে এসো।" সুধা তখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"কেন তাদের ফিরিয়ে দেবে? আমাকে ত আজ তারা মেরে ফেলছিল? আর দাদাকে মিছেমিছি আজ তারা কত কটু কথা বলেছে। কখনই ফিরিয়ে দেবনা।" ভূতি সুধার দিকে চাহিয়া রাগত ভাবে বলিল—"সুধো!"

সুধা বলিল—"কেন, আমি অন্যায় কথা কি বলেছি? তোমায় মিছেমিছি আজ তারা অপমান করে নি?"

ভূতি—"তারা অন্যায় ব্যবহার করেছে ব'লে কি আমরাও অন্যায় ব্যবহার ক'রে মন্দ হব? তাদের কাছে লুকিয়ে এই আধুলীটি রাখব? তাহলে ত আমাদের পক্ষে এ চুরি করা হলো। ছি সুধো, অমন কথা বলতে আছে? ওতে পাপ হয়। বাবা বলতেন যারা সৎপথে থাকে, যাদের ইচ্ছা সাধু, ঈশ্বর তাদের সহায় হন।"

ভূতির তিরস্কারে সুধা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল। মাতা তখন সুধার মুখ টানিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন—"ছি মা, অমন কথা মুখেও আনতে নাই। অন্য লোক মন্দ বলে তোমরা মন্দ হবে কেন। তোমার দাদা ঠিক বলেছে। সৎপথে থাকলে দেবতা সহায় হন।"

পরদিন স্কুলের পর ভূতি বাড়ী ফিরিতেছে। প্রতিদিনের ন্যায় সে দিনও সেই ময়রা দোকানে কত লোক জমিয়াছে। এক পা দু' পা করিয়া ভূতি আস্তে আস্তে দোকানের কাছে উপস্থিত হইল। যে লোকটা খরিদ্দারদের খাবার দিতেছিল, সে ভূতিকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কর্কশস্বরে বলিল—"ঐ গো, আবার সেই ছেলেটা এসেছে। কেন তুমি আবার আজ এখানে দাঁড়িয়ে ভিড় কচ্ছ? তুমি কাদের ছেলে গা?" ভূতি কোন উত্তর না দিয়া সেই আধুলীটি তাহার সম্মুখে ধরিল। দোকানী বলিল—"ও দিয়ে কি করতে হবে? কি চাই?"

ভূতি—"কিছু চাই না, এটি তোমাদের তাই দিতে এসেছি।"

দোকানী একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কি রকম!"

তখন ভূতনাথ আগাগোড়া সমস্ত কথা বলিল। বলিল যে, যে বাবুটি তাহাদের কুব্যবহার দেখিয়া মনে কষ্ট পাইয়া ভূতিকে সেই খাবার দিয়াছিলেন, তাঁহাকে সে কোন দিন দেখে নাই, চেনেও না। কিন্তু তিনি যে ঐ দোকান থেকে খাবার নিয়েছিলেন তাহাতে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তখন দোকানের আর একটি লোক বলিয়া উঠিল—"হাঁগো ঠিক হয়েছে। কাল আমাদের যে আট আনার হিসাব মিলছিল না সে এরই জন্য। আধুলীটি কোন প্রকারে বোধকরি মোহনভোগের খোলায় পড়ে গিয়েছিল।" একটি বাবু তখন সেই দোকানে বসে ছিলেন। তিনি ভূতিকে

বলিলেন—"আচ্ছা বাবা, তুমি এ ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন? এরা ত কিছু জান্‌তেও পারত না? এরা তোমাকে অমন অপমান কল্লে, আর তুমি এদের ভুলের টাকা অমন করে ফিরিয়ে দিচ্ছ?"

ভূতি—"মহাশয়, আমরা গরীব বটে, কিন্তু এ আধুলীটি ঠকিয়ে নিয়ে আমরা বড় মানুষ হব না। আমরা পিতামাতার কাছে কোন দিন এমন শিক্ষা পাই নাই।" বাবুটির চক্ষে জল আসিল। ভূতির সাধু ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"বাবা, এ দোকান আমার। লোকজন রেখে এ দোকান আমি চালাচ্ছি এবং এতে আমার বেশ আয়ও আছে। এরা তোমার সঙ্গে এমন মন্দ ব্যবহার করেছে শুনে আমি বড় দুঃখিত হলেম। এ আধুলীটি তুমি নাও, উহা আমি চাই না। আমার যথেষ্ট টাকা আছে। আর স্কুল হ'তে যাবার সময় রোজ তোমার ও তোমার বোনের খাবার এখান থেকে নিয়ে যাবে। তার দাম দিতে হবে না। এতে তুমি কুণ্ঠিত হইও না। তোমার মা যদি কোন আপত্তি করেন, তাঁকে ব'লো যে, এটি তাঁর কাছে আমার দানের পুণ্যলাভের ভিক্ষা।" ভূতি তখন মনে মনে বেশ বুঝিল যে এ সমস্তই ঈশ্বর প্রদত্ত পুরস্কার। মনে মনে পরমেশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিতে দিতে খাবার নিয়া গৃহে চলিল।

ইহার পর প্রতিদিনই স্কুলের ছুটির পর সেই দোকানের লোকেরা পথের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ভূতিকে ডাকিয়া মহা যত্নে তাহার হাতে একটি ঠোঙ্গা খাবার গুজিয়া দিত। প্রথম প্রথম উহা গ্রহণ করিতে ভূতি বড় লজ্জিত হইত এবং এক এক দিন লইতে চাহিত না। কিন্তু দোকানীদের আগ্রহ, যত্ন এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তাহাকে অবশেষে উহা লইতেই হইত।

বাদুড়।

সন্ধ্যার সময়ে বা রাত্রে চাঁদের আলোকে আকাশে অনেক বাদুড় উড়িয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা কেহ কেহ হয়ত বাদুড়কে পাখী মনে কর, কারণ ইহারাও পাখীর ন্যায় উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু বাদুড় পাখী নহে। পাখীদের সঙ্গে বাদুড়ের অনেক প্রভেদ দেখা যায়। পাখীদের গায়ে পালক থাকে, বাদুড়ের গায়ে পালক নাই। পাখীদের মুখে ঠোঁট বা চঞ্চু থাকে, তাহারা ডিম পাড়ে, তাহাদের মুখে দাঁত নাই। বাদুড়ের দাঁত আছে, বাদুড় ডিম পাড়ে না। ইহাদের শাবক মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় ও মাতার স্তন পান করে।

ইহাদের হাতের আঙ্গুলগুলি খুব লম্বা। ইহাদের শরীর যত লম্বা, হাতের এক একটা আঙ্গুল তত লম্বা। এই আঙ্গুলগুলি হাতের কব্জা হইতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কাগজের

মত পাতলা চামড়া দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। ছাতার শিকগুলির সহিত ছাতার কাপড় যেমন সংযুক্ত থাকে, ইহাদের ডানা অনেকটা সেই কৌশলে গঠিত।

ইহারা ডানা বিস্তৃত করিয়া পাখীদের মত অক্লেশে উড়িয়া বেড়াইতে পারে। ইহাদের ডানার চামড়া স্কন্ধ, পার্শ্বদেশ, পা ও লেজের সহিত সংযুক্ত থাকে। ইহারা অক্লেশে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু মাটির উপর দিয়া সহজে হাঁটিয়া যাইতে পারে না। যদি কখন মাটির উপর পড়িয়া যায়, তবে অতি কষ্টে কোনও প্রকারে গুড়ি মাড়িয়া কোন একটু উচ্চস্থানে উঠিয়া তথা হইতে ডানা প্রসারিত করিয়া বাতাসে ভর দিয়া উড়িয়া চলিয়া যায়।

ইহারা যখন বিশ্রাম করে বা নিদ্রা যায় তখন কোন উচ্চ স্থানে সুবিধা মত ধরিবার কোন অবলম্বন পাইলে, পশ্চাতের পায়ের নখ দ্বারা তাহা ধরিয়া, ডানা গুটাইয়া শরীরটা ঢাকিয়া, মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলিতে থাকে। ইহারা অন্যান্য জন্তুর মত বসিতে

বা শুইতে পারে না, মাথা নীচু করিয়া ঝুলিলেই বসা শোয়ার কাজ হয়। এরূপ ভাবে ঝুলিয়া থাকা আমাদের নিকট বড় কষ্টকর বোধ হয়, কিন্তু ইহাদের নিকট তাহা বড়ই আরাম জনক। দিনের বেলা সমস্ত ক্ষণ অন্ধকার নির্জ্জন স্থানে, বৃক্ষের ডালে বা কোটরে, ঘরের ছাদে বা চালে এইরূপ ঝুলিয়া থাকে, পরে সন্ধ্যার সময়ে আহারের অন্বেষণে বাহির হইয়া উড়িয়া বেড়ায়।

বাদুড় বা চামচিকা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। শীত প্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অধিক সংখ্যক এবং খুব বড় বড় বাদুড় দেখিতে পাওয়া যায়। বাদুড়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর বাদুড় কেবল ফল ভক্ষণ করে, দ্বিতীয় শ্রেণীর বাদুড় কীট পতঙ্গ ধরিয়া আহার করে, তৃতীয় শ্রেণীর বাদুড় কীট পতঙ্গ খায় এবং তাহা ছাড়া অন্যান্য জীব জন্তুর রক্ত চুষিয়া খায়।

ফলাহারী বাদুড়েরা এসিয়া খণ্ডের উষ্ণ দেশ সমূহে বাস করে। রক্তপায়ী বাদুড়েরা সাধারণতঃ আমেরিকা দেশে বাস করে। এবং কীট পতঙ্গ-ভুক্ সাধারণ বাদুড়েরা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই বাস করে।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, পৃথিবীতে প্রায় চারিশত পঞ্চাশ প্রকারের বাদুড় আছে! এত গুলি জাতির বিবরণ দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং আমরা কয়েকটির বিষয় বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

সাধারণ ফলাহারী বাদুড় খুব বড় বড় হয়। ইহাদের মুখের আকার শৃগালের মুখের মত, গা লোমে আবৃত। ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, সিংহল, মালয়, মাদাগাস্কার, জাপান, প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপে ও অষ্ট্রেলিয়া দেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এই সকল বৃহৎ বাদুড়কে সন্ধ্যার সময়ে দলে দলে উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহারা ধীরে ধীরে পাখা নাড়িতে নাড়িতে সোজা উড়িয়া যায়। ইহারা আপন নির্জ্জন আশ্রয় স্থান হইতে বাহির হইয়া, দূরবর্ত্তী যে সকল ক্ষেত্রে ফলপূর্ণ বৃক্ষ থাকে, তথায় দলে দলে যাইয়া ফল খাইয়া ও নষ্ট করিয়া সেই বাগানের বড় অনিষ্ট করে। আহার সমাপ্ত হইলে প্রত্যূষে আপন আবাস বৃক্ষে আসিয়া বৃক্ষের ডালে মাথা নীচু করিয়া ঝুলিতে থাকে। এক এক ডালে কুড়ি পঁচিশটা ঝুলিয়া থাকে। যখন সকলে মিলিয়া এক ডালে আশ্রয় লয়, তখন পরস্পর ভারি মারামারি ঠেলা ঠেলি আরম্ভ হয়, একে অপরকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে। পরে অনেক ঝগড়া বিবাদের পর সকলে স্থির হইয়া ঝুলিতে থাকে।

ভারতবর্ষে ফলাহারী বাদুড় অনেক প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় ফলাহারী বাদুড় আছে তাহাদের মুখ লম্বা নহে, গোল। ইহারা গাছে বিশেষতঃ তালগাছে, পাহাড়ের কাটালে ও পরিত্যক্ত গৃহে বাস করে। ইহারা গৃহস্থের বড় ক্ষতি করে। ইহাদের জন্য বাগানে কলা, আম ও পেয়ারা থাকিবার যো নাই। খাইবার সময়ে বাদুড় গাছের ডালে এক পা বাধাইয়া ঝুলিতে থাকে, অপর পায়ে ফলটি ধরিয়া খাইতে থাকে। আর এক প্রকার ফলাহারী বাদুড় আছে তাহারা খুব ছোট হয়।

পতঙ্গভুক্ বাদুড় বা চামচিকা আকারে ফলাহারী বাদুড় অপেক্ষা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র হয়।

আমরা ঘরের চালে, অন্ধকার ঘরের দেয়ালে বা ছাদে, যে সকল চামচিকা ঝুলিয়া থাকিতে দেখি, অথবা সন্ধ্যার সময়ে বা রাত্রে যে সকল চামচিকাকে ঘরের ভিতর আসিয়া ক্রমাগত এদিক্ ওদিক্ উড়িয়া বেড়াইতে দেখি, তাহারা প্রায় সকলেই পতঙ্গভুক্। আকাশে বা ঘরের ভিতর যে সকল মশা, মাছি বা অন্য কীট পতঙ্গ আমরা উড়িতে দেখি, ইহারা তাহাই ধরিয়া খায়। বাদুড় যে রকম করিয়া উড়িয়া থাকে, এদিক্ ওদিক্ করিয়া নানা বক্রগতিতে খুব দ্রুত উড়িতে থাকে। বাদুড় অনেকটা চাতক বা তালচঞ্চু পাখীর ন্যায় উড়িয়া থাকে।

এক এক জাতীয় পতঙ্গভুক্ বাদুড়ের চেহারা বড় কিম্ভূত কিমাকার। নাকের উপ-রের গঠন কতকটা গাছের পাতার মত হয়। মুখখানা ঘোড়ার মুখের মত।

অনেক পতঙ্গভুক্ বাদুড় ছোট ছোট পাখী, ও ভেক প্রভৃতি খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু ধরিয়াও

চামচিকা সে প্রকার করিয়া ওড়ে না। বাদুড় ধীরে ধীরে সোজা উড়িয়া যায়। চামচিকা খায়। প্রাচীন দেব মন্দির, পুরাতন পরিত্যক্ত গৃহ, অন্ধকার গুদামঘর বা গোলাঘর প্রভৃতি

চামচিকার প্রিয় বাসস্থান। বাদুড় ও চামচিকা গ্রীষ্মকালে যত বাহিরে আইসে, শীতকালে তত নহে। শীতের সময়ে ইহারা দেওয়ালের ফাটালে বা অন্য কোন নিভৃত নিরাপদ স্থানে থাকিয়া নিদ্রা যাইতে থাকে।

বাদুড় ও চামচিকা নানা বর্ণের হয়, কোন কোন জাতীয় বাদুড় রৌপ্য বর্ণের হয়; কোন কোন জাতীয় বাদুড়ের রং কমলা নেবুর রঙ্গের মত, কোন কোনটা আবার ঘোর কৃষ্ণ বর্ণেরও হয়। ইহাদের সাধারণ রং কিন্তু ধূসর।

রক্তপায়ী বাদুড় প্রায় সমুদয়ই আমেরিকা প্রদেশে বাস করে। ইহারা আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের কোন কোন জাতি পতঙ্গভুক্. তবে সন্দেশ রসগোল্লা বা চাট্‌নি প্রভৃতির দ্বারা আমরা যেমন রসনার তৃপ্তি সাধন করি ইহারাও তেমনি মধ্যে মধ্যে রক্ত পান করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া লয়। আবার কোন কোন জাতি কেবল ঘোড়া, গোরু, মানুষ প্রভৃতি অন্যান্য বৃহৎ প্রাণীর রক্ত পান করিয়াই জীবন ধারণ করে।

মানুষ যখন অনাবৃত স্থানে গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে, ইহারা সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া তাহার রক্ত চুষিয়া খায়। রক্ত চোষা শুনিলে ভয় হয়! মনে হয়, যাহার রক্ত ইহারা চুষিয়া খায় তাহার কতই না যন্ত্রণা হয়। কিন্তু তাহা নয়। ইহারা খুরের মত ধারাল তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র দন্ত দ্বারা, পায়ের আঙ্গুলের, হাতের বা অন্য কোন স্থানের অল্প একটু চামড়া কাটিয়া লয় ও সেই কাটা স্থানে মুখ দিয়া রক্ত চুষিয়া খায়, খাইয়া তৃপ্তি হইলে তবে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। নিদ্রিত ব্যক্তি সে সময়ে ইহার কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারে না। প্রাতঃকালে উঠিয়া কেবল মাত্র রক্ত হানি বশতঃ শরীর দুর্ব্বল বোধ করে, এবং ক্ষতস্থানে সামান্য বেদনা অনুভব করে, আর বিশেষ কোন জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করে না। ইহারা গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশ হইতে রক্ত চুষিয়া খায়। ঘোড়ার পিঠে এই জন্য মাঝে মাঝে ঘা হয় ও ফুলিয়া উঠে।

রক্তপায়ী বাদুড় বড় হয় না। ইহারা আমাদের চামচিকার মত ক্ষুদ্র জীব, ইহাদের শরীর তিন বা চারি ইঞ্চির অধিক বড় হয় না।

সুন্দর বনে সাত বৎসর।

মাঘ মাসে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে সাগর দ্বীপে প্রতিবৎসরই একটি খুব বড় রকমের মেলা বসিয়া থাকে। মকর সংক্রান্তিতে, গঙ্গা সাগর স্নান উপলক্ষে, এই স্থানে নানা দেশীয় লোকের সমাগম হয়। এই স্থানে সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলন হইয়াছে, এইজন্য ইহা একটি তীর্থ স্থান। প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র লোক বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যা, এবং নেপাল ও পাঞ্জাব প্রভৃতি দূর দেশ হইতেও এই খানে এই যোগ উপলক্ষে আসিয়া থাকে। বহু সাধু সন্ন্যাসীরও সমাগম হয় এবং মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে ব্যবসায়ী লোক আসিয়া উপস্থিত হয়।

সমুদ্র তীরে বিস্তীর্ণ বালুকা রাশীর উপর এই বৃহৎ মেলাটি বসিয়া থাকে। তীর্থের কাজে তিন দিনের বেশী আবশ্যক হয় না, কিন্তু

মেলাটি ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয়। যাত্রীগণ প্রাতঃকালে সাগরে স্নান করিয়া পঞ্চরত্ন দ্বারা সাগরের পূজা করিয়া থাকে; তার পর কপিলমুনির মন্দিরে গিয়া মুনির প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করে এবং সেখানেও পূজা করে। মন্দিরের বাহিরে একটি বটগাছ আছে, তাহার তলায় রাম এবং হনুমানের মুর্ত্তি এবং কপিল মুনির একটি মুর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের পিছনে একটি কুণ্ড আছে, তাহার নাম সীতাকুণ্ড। যাত্রীরা পাণ্ডাদিগকে কিঞ্চিৎ দিয়া এই কুণ্ডের দুই এক বিন্দু জল প্রত্যেকেই পান করিয়া থাকে; কপিল মুনির মন্দিরের ভিতরে যাইতেও প্রত্যেক যাত্রীকে চারি আনা করিয়া দিতে হয়। পূর্ব্বে এই গঙ্গা সাগরে কতলোকে ছেলে ভাসাইয়া দিত, কিন্তু ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এখন সে প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমুদ্রতীরে বিস্তীর্ণ বালুকারাশীর উপর এই মেলাটি বসিয়া থাকে। মেলার জন্য যে সমস্ত কুঁড়ে তোলা হয়, তা ছাড়া অন্য কোন ঘর বাড়ী এখানে নাই, অন্ততঃ আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে দেখি নাই। সুতরাং যাত্রী দিগের নৌকা ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয় স্থান ছিল না। তখন ষ্টীমার ছিল না, যাত্রীদিগকে, নৌকা করিয়া গঙ্গাসাগর যাইতে হইত। কিন্তু সেই তীর্থ স্থানে নৌকায় বাস করা অপেক্ষা, সেই অনাবৃত বালুকারাশীর উপর শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করা বেশী পুণ্যকার্য্য বিশ্বাস থাকায়, অনেকে তাহাই করিত।

তীর্থ স্থানে অনেকে যেমন পুণ্য সঞ্চয় করিতে যায়, তেমনি অনেকে আবার কু অভিপ্রায়েও গিয়া থাকে। একদিকে যেমন সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়, অন্য দিকে তেমনি চোর ডাকাতেরও অভাব থাকে না। এখন রাজার শাসনে দেশের অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে; কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময় দেশে চোর ডাকাতের অতিশয় উপদ্রব ছিল।

তখন আমার বয়স বড় বেশী নয়। আমি দাদা মহাশয়ের সহিত গঙ্গা সাগর গিয়াছিলাম। দাদা মহাশয় সাগরে স্নানে গিয়াছিলেন, আমি মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ীর কাহারও ইচ্ছা ছিল না যে আমি যাই এবং দাদা মহাশয়ও আমাকে প্রথমতঃ সঙ্গে লইতে অস্বীকার করেন; কিন্তু আমি জোর করিয়া বসিলাম, যাইবই। আমি জানিতাম আমার আব্‌দার কখনই অপূর্ণ থাকে না; যখনই যে আবদার করিতাম, তাহা যতই কেন অন্যায় হউক না, যতই কেন অসম্ভব হউক না, তাহা অপূর্ণ থাকিত না। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে ন্যায্য আবদার ছাড়িয়া ক্রমে আমি নানা প্রকার অন্যায় আবদার করিতে সাহসী হইয়াছিলাম। যদি প্রথম হইতেই আমার জেদ্‌ বজায় না থাকিত, যদি প্রথম হইতেই একটু শাসন হইত, তাহা হইলে আমি অত আবদারে হইতাম না। কিন্তু যখন দেখিলাম, আমি যখনই যে জেদ্‌ করি, তাহাই বজায় থাকে; যে আব্‌দার করি তাহাই পূর্ণ হয়, তখন আমার সাহস বাড়িয়া গেল। সে যাহা হউক, আমি ত জেদ্‌ করিয়া বসিলাম, যাইবই। হইলও তাহাই, দাদা মহাশয় আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না।

যথা সময়ে গঙ্গা সাগরে আমাদের বজরা পৌঁছিল। সাগর যাত্রীদের নৌকা গুলি

যেখানে সারি সারি বাঁধা ছিল, আমাদের বজ্‌রাও সেইখানে বাঁধা হইল। ছোট বড় অনেক গুলি নৌকা সেখানে ছিল বটে, কিন্তু বজ্‌রা আর একখানিও ছিল না। তাই আমাদের বজ্‌রা লাগিবামাত্র দলে দলে লোক আসিয়া আমাদের বজ্‌রা দেখিতে লাগিল। যাহাদের কাজ কর্ম্ম আছে, তাহারা একটু দেখিয়াই চলিয়া গেল, আর যাহারা নিষ্কর্ম্মা, তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে বসিল। বসিয়া বসিয়া বজ্‌রার আকৃতি প্রকৃতি সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা করিল; বজ্‌রার স্বামী যে একজন খুব বড় লোক, সে সম্বন্ধে সকলেরই একমত হইল এবং এক জন যে খুব বড় লোক সাগর স্নানে আসিয়াছেন, অল্পক্ষণ মধ্যেই সে সংবাদটা প্রচার হইয়া গেল।

আমরা বজ্‌রা হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, বহু নিষ্কর্ম্মা লোক এবং ভিক্ষুক বজ্‌রার কাছে জড় হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমরা তীরে উঠিলাম। দাদা মহাশয় একজন বিশ্বস্ত লোকের হাতে আমার ভার দিয়া নিজে তীর্থ কার্য্য করিতে গেলেন; আমি সেই লোকটির সঙ্গে মেলায় বেড়াইতে গেলাম।

দাদা মহাশয় সমস্ত দিন তাঁহার নিজের কাজ লইয়া থাকিতেন, আমি কি করিতাম না করিতাম তাহা দেখিবার তাঁহার অবসর ছিল না। আমি সমস্ত দিন মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম এবং খাওয়ার সময় চারিটি খাইতাম, এই ছিল আমার সে তিন দিনের কাজ। মেলায় যে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতাম তাহা নয়; দাদা মহাশয়ের হুকুম ছিল, আমি যখন যাহা চাহিব, তখনই তাহা দিতে হইবে।

সুতরাং সেই তিনদিনের মধ্যে মেলায় যে সমস্ত জিনিষ আসিয়াছিল, এটা ওটা করিয়া তাহারা প্রায় সমস্ত জিনিষের অন্ততঃ এক একটি করিয়া আমি সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

আমার চলা ফেরা এবং ভাব গতিক দেখিয়া সকল লোকেই আমাকে লক্ষ্য করিত এবং অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত। আমরা যেদিন সেখানে পৌছিয়াছিলাম, তার পরদিন হইতে দেখিলাম, মগের মত চেহারা একটা লোক, প্রায় সমস্ত দিনই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিল। কিন্তু সে লোকটা অন্যান্য লোকের ন্যায়, আমাদের বড় কাছে কাছে থাকে নাই এবং কোন কথাও আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে নাই, দূরে দূরে থাকিয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিল। পর দিন আমরা মেলায় গিয়া আর সে লোকটাকে দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু একটি মগ বালক সেদিন আমার সঙ্গ লইল। সে আমার সমবয়সী ছিল, সুতরাং অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার সহিত আমার বেশ ভাব হইয়া গেল। মেলায় বেড়াইতে বেড়াইতে সে সেই স্থানের অনেক বিবরণ আমাকে দিল, অনেক গল্প করিল এবং আমাদের বাড়ী ঘরের কথাও জিজ্ঞাসা করিল। সে যাহা হউক ছেলেটিকে আমি মেলা হইতে কএকটি জিনিষ কিনিয়া দিলাম এবং সন্ধ্যার সময় বজরায় ফিরিলাম। ছেলেটি আমার সঙ্গে সঙ্গে বজরা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, আমি বজরায় উঠিলে সে ফিরিয়া গেল। মগ বালকটির উপর আমার কেমন একটু মায়া হইয়াছিল; আমি বজ্‌রার ভিতরে যাইয়া, সে চলিয়া গিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য, তীরের দিকে চাহিলাম। চাহিয়া দেখি সেই বালকটি তীরের কিছু দূরে, পূর্ব্বদিনের সেই লোকটার সঙ্গে দাঁড়াইয়া কি

কথা কহিতেছে। মগ বালকটির উপর সেদিন আমার যেমন একটু মায়া জন্মিয়াছিল, সেই লোকটার প্রতিও পূর্ব্বদিন আমার কেমন একটা বিরক্তি জন্মিয়াছিল; তাই সেই বালককে সেই লোকটার সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়া আমার কেমন ভাল লাগিল না।

যাহা হউক, পর দিন প্রাতঃকালে আমাদের বাড়ী যাইবার কথা, সুতরাং তাহার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। দাদা মহাশয় সন্ধ্যার সময় আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, তিনি সমস্ত রাত্রি কপিলমুনির মন্দিরে বসিয়া যপ তপ করিবেন, ভোরে বজ্‌রায় ফিরিয়া আসিবেন এবং তখনই বজরা খোলা হইবে। সন্ধ্যার পরেই আমাদের খাওয়া শেষ হইল এবং সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর অল্পকাল মধ্যেই আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ কি একটা শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য আমি বজরার একধারের জান্‌লা তুলিয়া তীরের দিকে চাহিলাম। কিন্তু তীর কোথায়! চাহিয়া দেখিলাম যতদুর দৃষ্টি যায়, কেবল জল! একটু বিস্মিত হইয়া অন্য দিকের জান্‌লা খুলিলাম, দেখিলাম সেদিকেও তাহাই; চারি দিকে জল, কুল কিনারা নাই। আমার কেমন ভয় হইল, আমার যিনি অভিভাবক ছিলেন, তাঁহাকে ডাকিলাম, এবং তিনি উঠিলে তাঁহাকে সমস্ত বলিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া বাহিরে গেলেন, গিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই বজ্‌রা আর তীরের কাছে বাঁধা নাই—অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছে! তিনি তৎক্ষণাৎ মাঝিদিগকে ডাকিয়া তুলিলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন যে বুঝি কোন প্রকারে বজ্‌রার বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে এবং তাই বজ্‌রা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। মাঝিরা তাড়াতাড়ি উঠিল এবং উঠিয়া যাহা দেখিল তাহাতে একটু ভীত হইল। একজন তাড়াতাড়ি হালের দিকে যাইবে এমন সময় হালের নিকট হইতে কে অতি কর্কশ কণ্ঠে কহিল, "খবরদার, কেহ এক পা নড়েছ কি মরেছ।" সে লোকটি চাহিয়া দেখিল হালের কাছে তিন জন লোক তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া আছে। ওদিকে বজরার সম্মুখের দিকে ছয় সাত জন লোক নিঃশব্দে বসিয়াছিল, তাহারাও এই কথায় উঠিয়া দাঁড়াইল; রাত্রির ক্ষীণ আলোকে আমি নৌকার ভিতর হইতে দেখিলাম, তাহাদের প্রত্যেকের হাতেই তলোয়ার রহিয়াছে! আমার অভিভাবক তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমরা আরাকান দস্যুদের হাতে পড়েছি।" ডাকাতের হাতে পড়িয়াছি শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ হীম হইয়া গেল, আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। বজ্‌রায় আমাদের সঙ্গে দুইজন বরকন্দাজ ছিল, তাহারাও ঘুমাইতেছিল। গোলযোগে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে, "কোন্ হ্যায়রে, কোন্ হ্যায়রে" বলিতে বলিতে তাহারাও উঠিল। উঠিয়া যাহা দেখিল তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্য তাহারাও একটু থতমত খাইয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র; পর মুহূর্ত্তেই তাহারা তলোয়ার খুলিয়া বজ্‌রার দরজা চাপিয়া দুজনে দাঁড়াইয়া বলিল, "খবরদার এদিকে এসোনা, যতক্ষণ হাতে তলোয়ার আছে, ততক্ষণ কারও সাধ্য নাই যে মনিবের চুল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে।" নৌকায় ছয় জন মাঝি, দুজন বরকন্দাজ, দুজন চাকর, আমার অভিভাবক ও আমি। এদিকে "ডাকা-

একজনকার সাজা হলো
গাধার টুপি শিরে,
আর একজনার মলে দিলেন
কানটি আচ্ছা করে।

(১৯ পৃষ্ঠা দেখ)

তেরো প্রায় ৭।৮ জন। বরকন্দাজদের কথা শুনিয়া একজন ডাকাত একটা বিকট হাস্য করিল; অকূল সমুদ্রে, রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে, সেই বিকট হাসি আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল; সে হাসিতে আমাদের বুকের রক্ত যেন শুকাইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই অস্ত্রের ঝন্ ঝনা আমার কানে গেল, চাহিয়া দেখি উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে বরকন্দাজদের তলোয়ারের আঘাতে দুইজন দস্যু সমুদ্র জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আমাদের একজন বরকন্দাজও দস্যুদের হাতে প্রাণ হারাইল। আমি ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিলাম। তার পর আবার এই ভয়ানক দৃশ্য চক্ষের উপর দেখিয়া, আমার চক্ষু আপনি মুদ্রিত হইয়া আসিল, ক্রমে যেন চেতনা হারাইলাম। তার পর কি হইল তাহা আর কিছুই জানিতে পারিলাম না।

সহর ভ্রমণ।

বন থেকে এক বন মানুষ
এলো সহরে;
ঘুরে ঘুরে সহর দেখে
বেড়ায় সে ফিরে।
আজব সহর কতই কল
কতই কারখানা;
দেখে দেখে বনের উপর
জন্মালো ঘৃণা
ডালের উপর বসে বসে
ভাবছে একদিন,
বনে বনে বাস করেইত
হয়েছি বুদ্ধি হীন!
মানুষও যে আমরাও সে
তফাৎ কিসে আছে?
লেখা পড়া শিখ্‌লে পরে
ফেল্‌বো তাদের পাছে।

এই না ভেবে দিন দুই সে
পটলডাঙ্গার ইস্কুলে,
বিদ্যালাভের আশায় গিয়ে,
বসে থাকেন দেয়ালে।
দুচার দিনেই হলো তাঁর
অগাধ বিদ্যে উপার্জ্জন,
ভাব্‌লেন তখন ইস্কুল খুলে
ক'রবেন সবায় বিতরণ।

বিদ্যে যত করবে দান
ততই যাবে বেড়ে,
বনমানুষ তাই স্কুল খুলে
বেড়ান ন্যাজটি নেড়ে।
জামা জোড়া দিয়ে গায়ে
চস্‌মা চোখে এঁটে,
কানে কলম হাতে বেত
বসেন সেথা সেঁটে।
সদাই দাঁত খিচি মিচি
বড্‌ড শাসন কড়া,
বেয়াদবি দেখ্‌লে পরে
মেরে করেন সারা।
কুকুর গুলো বড্‌ড পড়ে
ভারি অঙ্ক কসে,
সেলেট বই হাতে রোজ
পাঠশালেতে আসে।
একদিন দুই কুকুরেতে
অঙ্ক কসা ফেলে,
চুপি চুপি ক্লাস পালিয়ে
যাচ্ছে দুজন চ'লে।
এই না দেখে গুরুমশায়
ওঠেন বড় রেগে,
করেন বড় তিরস্কার
বেতটি নেড়ে বেগে।
একজনকার সাজা হলো
গাধার টুপি শিরে,
আর একজনার মলে দিলেন
কানটি আচ্ছা করে।
অপমানে কুকুর গুলো
বড্‌ড গিয়ে রেগে,
ভো ভো ভো রবে তারা
ফেল্লে ঘিরে তাঁকে।
তখন—গুরু মশায় বুঝলেন আর
শাসন করা ভার—
তাই—এক লম্ফে বনের মানুষ
বনে হলেন পার।

চ্যাং।

চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানীদের জয় হইয়াছে বটে কিন্তু চ্যাং এর ন্যায় জনকয়েক বীর পুরুষ থাকিলে জাপানের বড় জয়ের ভরসা ছিল না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে চীন বীর চ্যাং প্রথম ইংলণ্ডে যান, তখন ইঁহার বয়স উনিশ বৎসর মাত্র। চ্যাং এর শরীরের দৈর্ঘ্য এই সময়ে পৌনে পাঁচ হাত! তোমরা বোধ হয় জান যে, সাধারণতঃ মানুষের শরীরের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাতের বেশী প্রায় দেখা যায় না। এই সময়ে চ্যাং ইংলণ্ডের রাজপুত্র এবং রাজ পুত্র বধূর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, একটি ঘরের দেয়ালে চীন ভাষায় নিজের নাম 'চ্যাং-ঔ গৌ' লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন, মেজে হইতে সে স্থানটি প্রায় সাত হাত উচ্চ! চ্যাং এর ভগ্নীটি আবার চ্যাং অপেক্ষাও প্রায় আদ হাত বড়। চ্যাং প্রায় দুই বৎসর বিলাতে ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে সেই পৌনে পাঁচ হাতের উপরে আরও কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে চ্যাং নিজ জন্মভূমি পিকিনে ফিরিয়া যান; কিন্তু অল্পদিন পরেই আবার প্যারিস প্রদর্শনীতে তাঁহাকে যাইতে হয়। এই সময়ে চ্যাংএর শরীরের দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় হাত হইয়াছিল। তিনি যে কেবল দৈর্ঘ্যে বাড়িয়াছিলেন তাহা নয়, লম্বায় চওড়ায় শরীরটি তাঁর বেশ মানানসই ছিল। প্যারিস হইতে ভিয়েনা, বার্লিন, সেণ্টপিটার্শবর্গ এবং ইউরোপের অন্যান্য প্রধান প্রধান স্থান বেড়াইয়া চ্যাং১৮৮০ সনে পুনরায় লণ্ডনে যান।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে পিকিন নগরে চ্যাং এর জন্ম হয়। গত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে এই চীন বীরের মৃত্যু হইয়াছে। প্রায়ই দেখা যায়, যাহাদের শরীর এ প্রকার অস্বাভাবিক রকমে বৃদ্ধি পায়, তাহাদের বুদ্ধি তেমন তীক্ষ্ণ হয় না, এবং অনেক সময় নিতান্ত নির্বোধই হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের চ্যাং তাহা ছিলেন না। তিনি অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী লোক ছিলেন, ইংরাজি, ফরাসী, জার্ম্মান, স্প্যানিস্ ও জাপানী ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বার্ত্তা বলিতে পারিতেন। চ্যাং এর অসাধারণ স্মরণ শক্তি ছিল। তিনি প্রথমবার বিলাতে গিয়া যাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার ষোলবৎসর পরে গিয়াও, তাহাদের অনেককে চিনিতে পারিয়াছিলেন। লণ্ডনে চ্যাং ইংরাজদের ন্যায় পোষাক পরিতেন। চিত্রে দেখ চ্যাং রাস্তায় দাঁড়াইয়া কয়েকটি

লোকের সহিত কথা বার্ত্তা বলিতেছেন। পাশে একখানা গাড়ী রহিয়াছে, তোমরা মনে করিয়োনা যে ঐ গাড়ী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে গাড়ীর মধ্যে চ্যাং এর দেহের স্থান কোথায়? অষ্ট্রেলিয়া দেশে চ্যাং এর বিবাহ হয়। তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, পুত্রটিরও পিতার ন্যায় শরীরের আকৃতি হইবে, শৈশবেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। পুত্রটির সংবাদ আমরা আপাততঃ বিশেষ কিছুই পাই নাই, পাইলে তোমাদিগকে জানাইব।

২য় ভাগ | জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ | ২য় সংখ্যা

পথহারা।

সায়াহ্নের ছায়াময় আকাশের গায়,
রবির কিরণ রেখা ধীরে ডুবে যায় ;
স্তরে স্তরে সাজে মেঘ আকাশের কোলে,
আঁধার ঘনায়ে যেন ওঠে প্রতি পলে,
মুহূর্ত্তের তরে স্তব্ধ হল দশদিশি,
ধরিল ভীষণ মূর্ত্তি ঘনঘোরা নিশি ;
নিমেষে বহিল বায়ু ভয়ঙ্কর বেগে,
দিগন্ত ঝলসি ঘন বিজলি চমকে ;
তরাসে চাহিছে বালা আকাশের পানে,
পথহারা একাকিনী সে নিবিড় বনে ;
সে আঁধারে প্রতি পদে বাজিতেছে ব্যথা,
আতঙ্কে কাঁপিছে বালা মুখে নাহি কথা ;
নীরবে ভাসিছে বুক নয়নের জলে,
ত্রাসে মুদে আসে আঁখি চরণ না চলে ;
আকুল পরাণে বালা চারিদিকে চায়,
'পথহারা' বালিকারে কে দিবে আশ্রয় ?

প্রসন্ন কুমার ঠাকুর।

গত সংখ্যায়, শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর আইনের অধ্যাপক হইয়াছিলেন, এই কথা লেখা হইয়াছিল। ঠাকুর আইনের অধ্যাপক কি, তাহা সকলে নাও জানিতে পার। আইন শাস্ত্রে বক্তৃতা দিবার জন্য মহাত্মা প্রসন্ন কুমার ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে তিন লক্ষ টাকা দান করেন। কলেজে আইনের যে সাধারণ বক্তৃতা হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বক্তৃতা হয় এবং সেই সকল বক্তৃতা বিশিষ্ট আইন অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা দেওয়া হয়। এই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট হলে তাঁহার একটি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিতে দিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

প্রসন্ন কুমার ধনে মানে বিদ্যায় তাঁহার সময়ে দেশের একজন অগ্রণী ছিলেন, আজ তাঁহার কথা তোমাদিগকে বলিব।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে প্রসন্ন কুমারের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম গোপী মোহন ঠাকুর। ইনি একজন প্রধান জমিদার এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। গোপী মোহনের ছয় পুত্রের মধ্যে প্রসন্ন কুমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ।

এখন কলিকাতায় যেমন প্রতি গলিতেই স্কুল, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে কেবল মাত্র একটি ইংরাজি স্কুল ছিল। সারবোরন্ নামে একব্যক্তি প্রথম কলিকাতা সহরে ইংরাজি স্কুল স্থাপন করেন। সারবোরন্ সাহেবের স্কুলে প্রসন্ন কুমারের ইংরাজির প্রথম শিক্ষা হয় এবং হিন্দু-কলেজ স্থাপিত হইলে তথায় শিক্ষা লাভ করেন।

প্রসন্নকুমারের বাল্যকালের বিশেষ কোন বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, তাঁহাকে বিষয় কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইতে হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শিক্ষা এবং স্বভাব গুণে তিনি একার্য্যের বিশেষ উপযুক্তই ছিলেন।

শিক্ষাদ্বারা প্রসন্ন কুমারের যেমন মানসিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁহার হৃদয়ও তেমনি উদার ও প্রশস্ত হইয়াছিল। আমাদের দেশে ধনীর সন্তানগণ সকল লোকের সহিত মেশা বা কোন প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করাকে নিতান্ত অপমান জনক মনে করেন। কিন্তু শিক্ষা গুণে এই সকল ভাব প্রসন্নকুমারের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি দেশের মধ্যে একজন প্রধান জমিদারের পুত্র হইয়াও, নীলের কুঠি, তেলের কল প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং ওকালতি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের উকীল হইবার জন্য তিনি কয়েক বৎসর অতিশয় মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সহিত আইন পড়িতেছিলেন। প্রসন্ন কুমার জমীদারের পুত্র হইয়া ওকালতি করিবেন, ইহা বড়ই অপমান জনক, এই বলিয়া তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে একদিন একটু তিরস্কার করিলেন। তাহাতে প্রসন্ন কুমার বলিলেন, "দেখ উৎকৃষ্ট গৃহিণী যেমন ভাঁড়ারের সমস্ত জিনিষই কোন না কোন কাজে লাগাইয়া থাকেন, তেমনি আমাদের মধ্যে যে সকল শক্তি আছে, আমাদের কর্ত্তব্য তাহার সদ্ব্যবহার করি।"

প্রসন্ন কুমারের উকীল হইবার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার স্থাপিত নীল কুঠি এবং তেলের কল লইয়া কয়েকটি মামলা মকৰ্দ্দমা হয়। সেই সকল মকৰ্দ্দমা যোগ্যতার সহিত পরিচালিত না হওয়ায়, তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হয়। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইলে তাঁহারই জয় হইবে, কিন্তু যখন তাহার বিপরীত হইল, তখন তিনি ভবিষ্যতে আর অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেই নিজের মকৰ্দ্দমা চালাইবেন স্থির করিলেন। যথা সময়ে তিনি হাইকোর্টের উকীল হইলেন এবং অল্প কাল মধ্যেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আইনের অভিজ্ঞতা ও প্রতিভাবলে আশাতিরিক্ত ফল ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। ওকালতিতে প্রসন্নকুমার যে এত যশস্বী হইবেন, তাহা কেহই মনে করেন নাই, অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, ধনীর সন্তানদের যেমন পাঁচ রকম সখ্ হয় ইহাও সেই রকম একটি সখ্মাত্র। কিন্তু ক্রমে যখন হাইকোর্টে তাঁহারই প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল এবং বেলি সাহেবের পরে যখন প্রসন্নকুমার গভর্ণমেণ্ট উকীলের পদে মনোনীত হইলেন, তখন লোকে প্রসন্নকুমারের প্রকৃত পরিচয় পাইল। ওকালতিতে প্রসন্ন কুমারের বৎসরে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা আয় ছিল। পৈত্রিক জমিদারী এই আয়ের দ্বারা তিনি অনেক বাড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে জমিদারী যে কেবল বাড়িয়াছিল তাহা নহে, তাঁহারসুশাসনে ও সুবন্দোবস্তে জমিদারীর অবস্থাও অতিশয় উন্নত হইয়াছিল। জমিদার শ্রেণীর মধ্যে প্রসন্ন কুমারই প্রথম ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং দেশে তিনিই এ বিষয়ে প্রথম পথ প্রদর্শক।

প্রসন্ন কুমার নিজে উচ্চশিক্ষা পাইয়াছিলেন,—শিক্ষার উপকারিতা তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাই দেশমধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার অতিশয় উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল। পুরাতন হিন্দু-কলেজের পরিচালকদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ছিলেন। দেশমধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যেমন উদ্যোগী ছিলেন, নিজ গৃহেও সে বিষয়ে তেমনি উদ্যোগী ছিলেন। তিনি

কন্যাদিগকেও গৃহে উপযুক্ত রূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রসন্ন কুমার 'অনুবাদক' নামক একখানি বাঙ্গলা পত্রিকা এবং 'রিফরমার' (সংস্কারক) নামক একখানি ইংরাজি পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। এই উভয় পত্রিকাতেই ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা হইত এবং এই সকল বিষয়ে দেশ যাহাতে উন্নত হয়, সেই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সাহিত্য এবং আইন শাস্ত্রে যে তাঁহার বিশেষ অনুরক্তি ছিল, তাঁহার উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীটি দেখিলে, তাহা বেশ বুঝা যায়। আইন শাস্ত্রের এ প্রকার দুষ্প্রাপ্য বহুমূল্য এবং নানাবিধ পুস্তক তাঁহার লাইব্রেরীতে ছিল, যে হাইকোর্টের জজ্‌দের অনেক সময় তাহার সাহায্য লইতে হইত।

দেশ হিতকর সকল বিষয়েই তিনি মনোযোগী ছিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা দেশ হইতে যখন উঠিয়া যায়, তখন এদেশের কতগুলি ব্যক্তি যাহাতে এ প্রথা রহিত না হয়, তাহার জন্য বিলাতে এক প্রার্থনাপত্র পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রার্থনা পত্র ইংরাজ রাজ নামঞ্জুর করেন। এইজন্য রাজাকে ধন্যবাদ দিবার উদ্দেশ্য এক সভা হয়, প্রসন্ন কুমার এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

প্রসন্ন কুমার একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে যান। সেই সময়ে কাশ্মীরের মহারাজা গোলাপ সিংহ তাঁহাকে কাশ্মীরে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রসন্নকুমার মহারাজের অনুরোধে কাশ্মীরে গিয়াছিলেন। মহারাজা গোলাপ সিংহ প্রসন্নকুমারকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার যে কয়েক দিন কাশ্মীরে ছিলেন, প্রতি দিনই মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং রাজনীতি ও রাজ্য শাসন সম্বন্ধে মহারাজকে অনেক উপদেশ দিতেন। কাশ্মীর হইতে বিদায় কালে প্রসন্নকুমার একটি দুরবীক্ষণ লইয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, 'মহারাজ, আমার এমন কিছুই নাই যাহা আপনি গ্রহণ করিতে পারেন। তবে এই একটি জিনিস আনিয়াছি, ইহাতে দূরের বস্তুকে নিকটে লইয়া আসে; মহারাজ এই সামান্য উপহারটি গ্রহণ করুন, আমি মহারাজের নিকট হইতে দূরে যাইতেছি, হয়ত ইহাতে সময় সময় আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে।" প্রসন্নকুমারের এই উপহার এবং তাঁহার এই কথায় মহারাজা গোলাপ সিংহ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এদেশে যখন প্রথম ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হয়, সেই সময় লর্ড ডালহাউসি প্রসন্নকুমারকে সেই সভার সহকারী কার্য্যকারকের পদে মনোনীত করেন। এই পদে থাকিয়া প্রসন্নকুমার ফৌজদারী আইন গঠন সম্বন্ধে, স্যার বার্ণস্ পিকক প্রভৃতি যাঁহাদের উপর এই কার্য্যের ভার ছিল, তাঁহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তখনকার গভর্ণর জেনারেল প্রসন্নকুমারকে তাঁহার আইন সভার সভ্যপদে মনোনীত করিয়া, তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে প্রসন্নকুমারই সর্ব্ব প্রথম এই পদে মনোনীত হন।

আইন শাস্ত্রে তাঁহার এত গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল যে, অনেক বাঙ্গালী এবং ইংরাজ পর্য্যন্তও তাঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতেন; এবং তিনিও অকাতরে অনেককে যথাসাধ্য পরা-

মর্ম দ্বারা সাহায্য করিতেন। যে ক্ষুদ্র সেও বঞ্চিত হইত না।

তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীর প্রজাগণের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রায়ই জমিদারী পরিদর্শন করিতেন, এবং প্রজাদের অভাব অনুযোগ, সুখ দুঃখের কথা নিজেই শুনিতেন এবং যাহাতে তাহাদের দুঃখ অভাব দূর হয় তাহার উপায় করিতেন। অতি ক্ষুদ্র ও দরিদ্র প্রজাও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার কথা জানাইতে পারিত। তিনি জমিদারীর মধ্যে দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়া প্রজাদিগের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অভাবের সময় প্রজাগণকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেন এবং কাহাকেও অসমর্থ দেখিলে তাহার খাজনা মাপ করিতেন।

প্রসন্ন কুমার সৎকার্য্যে অনেক দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীতে প্রতিদিন শতাধিক দরিদ্র লোক এবং স্কুলের ছাত্র আহার পাইত। যাঁহাদের অবস্থা বেশ পূর্ব্বে ভাল ছিল, অথচ ঘটনা ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, প্রসন্ন কুমার এমন অনেক পরিবারের সাহায্যের জন্য বাৎসরিক বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিক্ষাগুণে প্রসন্ন কুমারের মন যেমন উন্নত হইয়াছিল, হৃদয়ও তেমনি উদার হইয়াছিল। তিনি উচ্চ বংশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া কখনও অহঙ্কারী বা গর্ব্বিত হন নাই। যাঁহারা উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করেন, ধন সম্পত্তিতে যাঁহারা দেশের মধ্যে প্রধান, তাঁহারা আপনাদের সমশ্রেণীর লোক ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত বড় সম্পর্ক রাখেন না; সাধারণ লোকের সহিত মিশিলে মর্য্যাদার হানি হইবে মনে করেন। কিন্তু প্রসন্নকুমারের প্রকৃতি ঠিক ইহার বিপরীত ছিল। তিনি ধনীর সন্তানদের ন্যায় একাকী বা সমকক্ষ কয়েকটি লোক লইয়াই থাকিতেন না; সকলের সহিতই তিনি সহৃদয়তা দেখাইতেন। কোন প্রকার গর্ব্ব বা অহঙ্কার তাঁহার ছিল না। একবার প্রসন্ন কুমার রঙ্গপুর জেলার জমিদারী পরিদর্শন করিতে যান। সেখানকার প্রধান প্রজাগণ তাঁহার নিকট একদিন উপস্থিত হইয়া বলেন, 'আপনি যে প্রকার ব্যক্তি, তাহাতে কাঠের পাল্কীতে আপনার চলা ফেরা করা ভাল দেখায় না। রূপার পাল্কী হইলেই আপনার পদ ঐশ্বর্য্যের উপযুক্ত হয়।' তাহাতে প্রসন্ন কুমার হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রূপার পাল্কী তৈয়ার করিতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই।" সেই ব্যক্তিরা তাঁহার মনের ভাব ঠিক বুঝিতে পারেন নাই; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ একখানা রূপার পাল্কী তৈয়ার করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রসন্ন কুমার এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া এ কাজে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন এবং যে চাঁদা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাও ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে, রূপার পাল্কীতে বেড়াইতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক এবং অনেক বুঝাইয়া তবে তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমারের মৃত্যু হয়। তিনি যে বংশে জন্মিয়াছিলেন, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও সৎকার্য্যের দ্বারা সে বংশের গৌরব উজ্জ্বলতর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ সকলের অনুকরণীয়।

মাকড়সার জাল।

বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি; সিপাহীগণ সেই সময় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় দিল্লীর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের একটা কোঠা ঘরের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র ঘরে, তিন জন স্ত্রীলোক সন্ধ্যার পর বসিয়া গল্প করিতেছিল। এই তিন জন স্ত্রী লোকের মধ্যে একজন বৃদ্ধা, একজন প্রৌঢ়া বিধবা এবং আর একজন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা। বালিকা এই বৃদ্ধার আশ্রয়ে বাস করিত। সে বাড়ীতে পুরুষ মানুষের মধ্যে ছিল কেবল সেই 'বৃদ্ধার স্বামী; সেও সে রাত্রে কোন বিশেষ কাজ উপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিল। যে দিনকার কথা বলিতেছি, সেই দিন প্রাতঃকালে একদল সিপাহী আসিয়া সেই কোঠা ঘরের অপর পার্শ্বের একটি বড় ঘরে আশ্রয় লয়। তাহারা সমস্ত দিন খুব আমোদ প্রমোদ করিয়া সন্ধ্যাবেলায়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একে বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেহই ছিলনা, তাহাতে আবার সেই বাড়ীর একটা ঘরে বিদ্রোহী সিপাহীরা আসিয়া স্থান লইয়াছিল, তাই সেই অসহায়া স্ত্রীলোকেরা সিপাহীদের ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়াছিল। এ দিকে বাহিরেও খুব ঝড় বহিতেছিল।

তিন জনে নানাপ্রকার গল্পে মগ্ন হইয়া আছে, এমন সময় তাহাদের দরজায় কে আঘাত করিল। শব্দ শুনিয়া তাহাদের বড়ই ভয় হইল, কাহারও দ্বার খুলিতে সাহস হইল না, তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। ক্রমে দরজায় জোরে আঘাত হইতে লাগিল। সকলকেই দরজা খুলিয়া দিতে নারাজ দেখিয়া, সেই বালিকাই আস্তে আস্তে আসিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া দিল। দরজা খুলিয়াই দেখিল একদল ইংরেজ বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। এতগুলি অপরিচিত বিদেশী লোক দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিতে গেল। এমন সময় তাহাদের মধ্যে একজন লোক অতি কাতর স্বরে বলিল, "আমাদের দয়া করে এই রাত্রের জন্য তোমাদের বাড়ীতে একটু স্থান দেও, আমরা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আর চলতে পাচ্ছিনে।" বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে? কোথা থেকে আসছ?" তাহারা উত্তর দিল "আমরা বিদ্রোহী সিপাহীদিগের ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি, চারিদিকে সিপাহীরা আমাদের খোঁজে ফির্‌ছে' আমাদের পেলেই মেরে ফেলবে।"

যে সময়কার কথা বলিতেছি, সে সময়ে এদেশে সিপাহী বিদ্রোহের ভয়ানক গোলযোগ! এই সময় সিপাহীরা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। ইহারা যে সে সময় কত নির্দ্দোষী ও অসহায় সাহেব মেম ও তাহাদের পুত্র কন্যাদিগকে বধ করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। বালিকার নিকট যাহারা আশ্রয় চাহিতেছিল তাহারাও কয়েকজন অসহায় ইংরেজ।

ইংরেজদের কথা শুনিয়া সেই বালিকা ভারি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তোমরা যে ভয়ে এখানে আশ্রয় নিতে এসেছ, এখানে সেই বিপদেই তোমাদিগকে পড়তে হবে, এখান থেকে এখনি পালাও, এবাড়ীর ওধারের ঘরে একদল সিপাহী এসে আড্ডা নিয়েছে। এখানে থাক্‌লে তোমাদের রক্ষা নাই।"

এই কথা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একজন যুবক তাহার বন্ধু দিগকে অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বলিল—"ভাই আমি আর কোন মতে চল্‌তে পাচ্ছিনে; তোমরা আমাকে এখানে ফেলে চলে যাও, আমার জন্য সকলে কেন প্রাণে মরবে?" কিন্তু তাহারা সেই যুবককে কিছুতেই ফেলিয়া যাইতে চাহিল না। পুনরায় বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে এই কোঠা ঘর ছাড়া নিকটে কি আর কোন স্থান নাই, যেখানে আমরা এই রাতটুকু কাটাতে পারি?" সে কহিল "না, এই ঘরটুকু ছাড়া এখানে আর স্থান নাই। আর ঐ সৈনিকেরা সর্ব্বদা এই পাশের দরজা দিয়ে যাওয়া আসা করবে, তারা যদি কোন মতে টের পায়, তা হ'লে তোমাদের আর রক্ষা থাক্‌বেনা।" এই কথা শুনিয়া তাহাদের ম্লান মুখ যেন আরও শুকাইয়া গেল। তাহারা যুবককে ধরাধরি করিয়া লইয়া আবার ধীরে ধীরে চলিবার আয়োজন করিল। কিন্তু তাহাদের ক্লান্ত দেহ, বিষণ্ণ মুখ এবং অসহায় অবস্থা দেখিয়া বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইল। সে মনে মনে ভাবিল, ইহাদিগকে বিদায় দিয়া আমরা তিন জনে প্রাণে বাঁচিব বটে, কিন্তু এই নিরাশ্রয় লোক কটির কি দশা হইবে? সিপাহীরা ইহাদিগকে পাইলে ত এখনি বধ করিবে, এই কথা ভাবিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ একটা উপায় আছে, কিন্তু কাজটা ভারি শক্ত, করিতে পারিবে কি?" ঘোর নিরাশার মধ্যে একটু আশার কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই অতিশয় ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি? কি উপায়?"

অপর দুইজন স্ত্রীলোক এতক্ষণ চুপ করিয়া সকল কথা শুনিতেছিল, তাহারা বালিকার এই কথায় অতি বিস্মিত এবং বিশেষ অসন্তুষ্টও হইল। বৃদ্ধা তাহার উপর ভারি চটিয়া গেল, ভাবিল অনর্থক বিপদ ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি?

বালিকা বলিল "এই বাড়ীটার অপরদিকে শস্য রাখিবার একটা ছোট কুঠরী আছে, সেখানে আশ্রয় নিতে পারলে তোমরা কতক নিরাপদ হতে পার। কিন্তু সে ঘরে যেতে হলে তোমাদের সেই ঘুমন্ত সৈনিকদের ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। সে ঘরে যাবার অন্য পথ নাই। দেশে চোর ডাকাতের ভয় বলে, সে ঘরে যাবার জন্য কোন সিঁড়ি রাখা হয় নাই। কেবল ঘরের দেয়ালের গায়ে লম্বালম্বি বরাবর একটা খুব উঁচু আল্‌সের মত আছে; তার উপর দিয়ে একজন লোক অতি কষ্টে দেয়াল ধরে ধরে হেঁটে যেতে পারে। তোমাদেরও তারি উপর দিয়ে খুব সাবধানে সারি সারি চলে যেতে হবে; কিন্তু সৈনিকেরা কেউ যদি জেগে ওঠে, তা হলে কি দশা হবে?" সেই বিপদগ্রস্ত লোকেরা এই অসমসাহসিক কাজ করিতেও রাজি হইল। বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল "পথ দেখাইবে কে?" নির্ভীক বালিকা কহিল, "আমিই দেখাইব।" সেই হতভাগ্য নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণ আশ্বাসিত হইয়া, দুই হাত তুলিয়া

বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। বালিকার সঙ্গিনীদ্বয় স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বৃদ্ধা তাহার কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল এবং তাহাকে পাগল বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল।

কিন্তু বালিকা তাঁহাদের তিরস্কার বা ভয় প্রদর্শনে নিরস্ত হইল না, সে সেই অসহায় কয়েকটি ইংরাজকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সেই চারিটি লোক আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই দুই জন স্ত্রীলোককে বাহিরের দুয়ার আগলাইতে বলিয়া, বালিকা সেই লোক দিগকে সঙ্গে লইয়া চলিল। সেই কোঠা ঘরের একটা ছোট ঘরের ভিতর তাহাদিগকে আনিয়া, একটা কাঠের সিঁড়ি দেখাইয়া বলিল—"দেখ ঐ যে দেয়ালের গায়ে একটা বড় ফাঁক দেখ্‌ছ, এই সিঁড়ি দিয়ে ওর উপর ওঠা যাবে; ওখান থেকে সেই আল্‌সে দিয়ে বরাবর যাওয়া যাবে! তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি উপরে উঠে দেখি, সৈনিকেরা কি কর্‌ছে; সুবিধা দেখ্‌লেই ইসারা কর্‌ব, তোমরা তখন আমার পেছনে সারি সারি এস।" সে উঠিয়া দেখিল সৈনিকেরা পাশে বন্দুক রাখিয়া মাটিতে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে। সুবিধা বুঝিয়া সেই লোকদিগকে সে ইসারা করিল, তাহারাও ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বালিকার পেছনে পেছনে চলিল। সে যখন সেই ছোট দেয়ালের উপর দিয়া চলিতে ছিল, তখন যে তাহার প্রাণে কি ভয় হইতেছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। আর সেই হতভাগ্য লোকেরাও মনে করিতেছিল, যদি কেহ পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায়, যদি একটু সুরকি কিম্বা একটু ধুলা বা কুটা কোন সৈনিকের গায়ে পড়ে, যদি তাহারা কেহ জাগিয়া উঠে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ হইবে! তাহারা ভয়ে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া চলিতে লাগিল।

অনেক কষ্টে তাহারা নিরাপদে সেই কুঠরীর দ্বারে গিয়া পৌঁছিল। সেই কুঠরীর ভারি দরজাটা অনেক দিন বন্ধ ছিল এবং সর্ব্বদা বড় একটা খোলাও হইত না, সেই জন্য দরজার কব্‌জায় মরিচা ধরিয়া গিয়াছিল তাই দরজা ধরিয়া টানিবা মাত্র, সেই রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। বালিকার শরীর ভয়ে একেবারে হীম হইয়া গেল, এবং সেই নিরাশ্রয় ইংরাজেরাও ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। সেই ভয়ানক শব্দ শুনিয়া একজন সৈনিক "কে ও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বালিকা ও তাহার অনুগামী ব্যক্তিগণ আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহারা বুঝিল আর রক্ষা নাই। বাহিরে তখন খুব শোঁ শোঁ শব্দে ঝড় বহিতেছিল। "আরে ও বাতাসের শব্দ রে গাধা, ও কিছু নয়, চুপ করে ঘুমো না" এই বলিয়া আর একজন সৈনিক সেই ব্যক্তিকে তাড়া দিয়া উঠিল। বাতাসেরই শব্দ স্থির করিয়া তাহারা আবার ঘুমাইতে লাগিল। বালিকা দেখিল কুঠরীর দরজা সবটা খোলে নাই, কতকটা ফাঁক হইয়াছে মাত্র। যাহা হউক অতি কষ্টে সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া সেই চার জন লোক কুঠ্‌রীতে প্রবেশ করিল। তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল এবং দুই হাত তুলিয়া বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। সে তাহাদিগকে বিচালির উপর সেই রাত্রির মত বিশ্রাম করিতে বলিল এবং সৈনিকেরা চলিয়া গেলে, সে আসিয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিবে এই

আশ্বাস দিল। দরজা বন্ধ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও পাছে আবার শব্দ হয়, সেই ভয়ে দরজা খোলা রাখিয়াই বালিকা সেই আলসের উপর দিয়া আবার ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নিজ ঘরে প্রস্থান করিল।

সে ফিরিয়া গেলে বৃদ্ধা তাহাকে খুব ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কিন্তু সেই বিধবা স্ত্রীলোকটি তাহার সাধুকার্য্যের প্রশংসা করিল। ধরা পড়িলে তাহাদিগকেও ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইবে, সেই কথা বুড়ী বার বার বলিতে লাগিল। অবশেষে সে গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইবার প্রস্তাবও করিল। কিন্তু সে প্রস্তাবে তাহারা কেহই সম্মত হইল না।

রাত্রিও যখন ক্রমে শেষ হইয়া আসিল, তাহাদের ভয়ও যেন ক্রমে একটু একটু করিয়া কমিতে লাগিল; রাত্রি প্রভাতেই সৈনিকেরা চলিয়া যাইবে। কিন্তু ভোর হইবা মাত্র তাহারা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল। শব্দ শুনিয়াই তাহারা কিঞ্চিত ভীত হইল। বোধ হইল যেন ঘোড়াগুলা তাহাদের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; ক্রমে মানুষের কণ্ঠস্বরও শোনা গেল। দ্বারের কাছে শব্দ শুনিয়া সেই বালিকা ধীরে ধীরে দরজার কাছে গিয়া দরজা খুলিল। দরজা খুলিয়া দেখিল একজন সর্দ্দার ও কয়েকজন সিপাহী বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। বালিকাকে দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রিতে বা তাহার পূর্ব্বদিন কয়েকজন লোক সেখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে কি না? বালিকা সেই নিদ্রিত সৈন্যগণকে দেখাইয়া দিল। সর্দ্দারকে দেখিবা মাত্র সৈনিকেরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সহিত অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করিয়া সেই সর্দ্দার, স্ত্রীলোক দিগকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, —"এই সিপাহীরা ছাড়া আর কেহ এবাড়ীতে আছে কি না? আমরা গ্রামের লোকদের কাছে শুনে এসেছি, কয়েকজন গোরা এখানে আশ্রয় নিয়েছে, একথা সত্য কিনা শীঘ্র বল, নতুবা তোমাদেরকেও প্রাণে মর্‌তে হবে।" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা বড়ই ভয় পাইল; সে পাছে বলিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় সেই বালিকা তাড়াতাড়ি বলিল, "তোমাদের তেমন সন্দেহ হয়, তোমরা খুঁজে দেখ, আমি তোমাদিগকে সব জায়গা দেখিয়ে দিতে রাজি আছি।" বালিকা মনে করিয়াছিল, এ কথার উপর তাহারা কেহই আর অনুসন্ধান করিতে চাহিবে না। কিন্তু সেই রাত্রের সেই বিকট শব্দ শুনিয়া যে ব্যক্তি চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, সে তখনি, সেই শস্যের কুঠরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "যদি কোন জায়গা খুঁজে দেখ্‌তে হয়, তবে ঐটি আগে খুঁজে দেখা উচিত।" কথাটা শুনিয়া বালিকার বুকের রক্ত যেন শুকাইয়া গেল। সে ভাবিল, "কেন ঘর খুঁজিবার কথা বলিলাম; এখন ঐ হতভাগ্য দিগকেও প্রাণে বাঁচাইতে পারিব না এবং আমরা তিনজনেও মরিব।" সেই সর্দ্দার আর বিলম্ব না করিয়া, বালিকাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে কহিল। ভয়ে বালিকার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, সে আর কোন কথা না বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। সে ব্যক্তি ৪।৫ জন সৈনিককে তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে কহিল, সর্দ্দারটি কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ব্যক্তি ছিলেন। সেই সরু আলসে দেখিয়া তাঁহার বড় বেশী অগ্রসর হইবার সাহস হইল না। তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই বালিকার পিছনে অতি কষ্টে ভয়ে ভয়ে চলিতে

লাগিলেন। অর্দ্ধেক পথ গিয়াই বেশ দেখা গেল যে, সেই কুঠ্‌রীর দরজা কতকটা খোলা রহিয়াছে। বালিকা কলের পুতুলের মত চলিতেছে, কিন্তু ভয়ে তাহার শরীর আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাহার পা আর উঠিতেছে না। সে মনে মনে বলিল, "হা ভগবান! এতগুলি লোকের আজ কি দশা হইবে।" একবার ভাবিল এখান হইতে যদি এখন পড়িয়া মরি সেও বুঝি ভাল। সর্দ্দার খুব স্থূলাকায় বলিয়া তাহার চলিতে বড়ই কষ্ট হইতেছিল। সে সেই আলসের মাঝখানে দাঁড়াইয়াই কুঠ্‌রীর দিকে লক্ষ্য করিতে লগিল এবং তাহার অনুচর দিগকে ডাকিয়া কহিল, "দরজার মুখে একটা প্রকাণ্ড মাকড়সার জাল দেখা যাচ্ছে না?" বাস্তবিক সেই রাত্রে যখন সেই লোকেরা ঘরের ভিতর প্রবেশ করে, তখন দরজার উপরে একটা মাকড়সার জাল ছিল, কিন্তু প্রবেশ করিবার সময় তাহা ছিড়িয়া যায়। মাকড়সা রাতারাতি তাহার সেই ছিন্ন জাল আবার বুনিয়া লইয়াছিল। একটা প্রকাণ্ড মাকড়সার জালে দরজার ফাঁকটুকু ঢাকিয়া রহিয়াছে দেখিয়া, সর্দ্দার বলিল "আর কেন, মাকড়সার জাল দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, দরজাটা শীঘ্র খোলা হয় নাই। অন্ততঃ একমাসের মধ্যেও কোন লোক এই কুঠ্‌রীতে প্রবেশ করে নাই।" সর্দ্দারের কথা সৈনিকেরাও যুক্তি সঙ্গত মনে করিল, এবং নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। বালিকা যেন আকাশ হাতে পাইল, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল। তারপর সিপাহীরা সকলে চলিয়া গেল। বালিকা তখন ফিরিয়া আসিয়া সেই নিরাশ্রয় ইংরাজ দিগকে সেই সংবাদ দিল। তাহারা সকলে সেই বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এবং তাহার দয়া ও পরোপকারের শত শত প্রশংসা করিয়া সেই স্থান হইতে বিদায় লইল।

বাতাস কেন বহে?

জ্যৈষ্ঠ মাস। দুপুর বেলায় রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে; বাতাস যেন একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়িতেছে না; গ্রীষ্মে প্রাণ যেন একেবারে বাহির হইয়া যাইতেছে; শরীর এমনি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া আছি, হাত পা নাড়িবারও যেন শক্তি নাই।

হঠাৎ একটা ঝাপ্‌টা বাতাস আসিয়া জান্‌লাটা খুলিয়া গেল এবং একটা শোঁ শোঁ শব্দ আমার কানে গেল। আমি অলসভাবে চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম, চাহিয়া দেখি বেশ প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছে; একটু দূরে দুইটা সুপারী গাছ ছিল, দেখিলাম সে গাছ দুটি বাতাসের বেগে খুব দুলিতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ ছিল, গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়িতেছিল না, হঠাৎ এত প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছে কেন? আমি উঠিয়া জান্‌লার কাছে গেলাম, সেখানে গিয়া দাঁড়াইতেই

একটা গোলযোগ শুনিতে পাইলাম। তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলাম, গিয়া দেখি আমাদের বাড়ীর কিছু দূরে, রাস্তার অপর পার্শ্বে একটা বাড়ীতে আগুণ লাগিয়াছে। বাড়ী খানি খড়ের, জ্যৈষ্ঠমাসের দারুণ রৌদ্রে খড় প্রভৃতি শুকাইয়া ঝর্ ঝরে হইয়াছিল, আগুণ লাগিবা মাত্র একেবারে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এদিকে কিছু পূর্ব্বে গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়িতেছিল না, কিন্তু এখন একেবারে ঝড়ের মত বাতাস বহিতে লাগিল, সেই বাতাসে আগুণের বেগ আরও বাড়িয়া গেল। আগুন নিভাইবার জন্য অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, দেখিতে দেখিতে পাশাপাশি তিন চারি খানি বাড়ীতে আগুন ছড়াইয়া পড়িয়া এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল।

কিন্তু সে যাহাই হউক, আগুন লাগিবা মাত্র এই যে ঝড়ের মত বাতাস বহিতেছিল, ইহা কোথা হইতে আসিল? গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়িতেছিল না, হঠাৎ এমন প্রবল বেগে বায়ু বহিল কেন? ঘটনাটি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং ব্যাপারটা বুঝিয়া রাখা মন্দ নহে।

একটা কাঁচের গেলাস বা সেই রকম কোন একটা পাত্র অর্দ্ধেকটা জলে পূর্ণ করিয়া, সেই জলের মধ্যে যদি কোন একটা ভারি জিনিস ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই ভারি জিনিসটা গেলাসের তলায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর সেই জিনিসটা জলের মধ্যে ছাড়িয়া দিবার আগে জল যেখানে ছিল, তাহার অনেক উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চিত্রটির দিকে চাহিয়া দেখ তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। ড চিহ্নিত ভারি
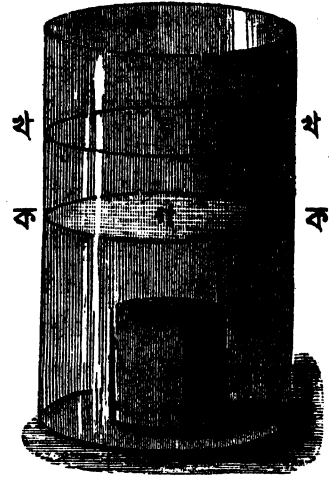
জিনিসটা জলের মধ্যে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে জল ক চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু পরে সেই জল খ চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, একই স্থানে দুটি পদার্থ একই সময় থাকিতে পারে না। ড চিহ্নিত ভারি জিনিসটি সীসার; তাহা জলে ছাড়িয়া দেওয়াতে গেলাসের নীচে গিয়া স্থান লইল, কাজেই সে যে স্থানটুকু অধিকার করিল, সেই স্থানের জল অন্য স্থানে যাইয়া আশ্রয় লইল। তোমরা যেমন নিজের চেয়ে যে দুর্ব্বল তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানটুকু অধিকার করিয়া লও, সে বেচারী অন্যত্র একটু আশ্রয় খুঁজিয়া লয়, এখানেও তাহাই হইল। জল হাল্কা, কাজেই ভারি জিনিসকে যায়গা ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইল।

সীসার জিনিসটা জলে ছাড়িয়া দিবামাত্র জল যে উপরের দিকে উঠিয়া গেল, ইহার আর একটি কারণ আছে, তাহা তোমরা সর্ব্বদা মনে করিয়া রাখিও।

পৃথিবী প্রত্যেক জিনিসকেই দিবারাত্রি

আপনার দিকে টানিতেছে। যে সকল জিনিসকে আমরা ভূপৃষ্ঠে পড়িতে দেখি, তাহা সমস্তই এই আকর্ষণের বলে পড়িয়া থাকে। গেলাসের জলে যে সীসার জিনিসটি ডুবিয়া গেল এবং জল উপরে উঠিয়া গেল, ইহাও সেই আকর্ষণের বলে। পৃথিবীর আকর্ষণে জল উপরের দিকে উঠিয়া গেল,—কথাটা কিছু অদ্ভুত রকমের শুনাইতেছে; কিন্তু কথাটা ঠিক। পৃথিবী প্রত্যেক জিনিসকেই আকর্ষণ করিতেছে; কিন্তু যে জিনিসের গুরুত্ব বেশী, তাহার উপর এই আকর্ষণ যত প্রবল হয়, হাল্‌কা জিনিসের উপর তত হয় না। জল অপেক্ষা সীসা এগারো গুণ অধিক ভারি, এইজন্য সীসার জিনিসটি জলে ছাড়িয়া দিবামাত্র ইহাকে পৃথিবী এগারো গুণ জোরে আকর্ষণ করিয়া লইল; পৃথিবী ঐ এক সময়েই জল এবং সীসার জিনিসটিকে আকর্ষণ করিতেছিল, কিন্তু জল হাল্‌কা বলিয়া, সীসার জিনিসটি অধিক বেগে আকর্ষিত হইয়া নীচের দিকে চলিয়া গেল এবং দুইটি বস্তুর একই সময়ে একটি স্থান অধিকার করিয়া থাকা অসম্ভব বলিয়া, আপন স্থান হইতে তাড়িত হইয়া জলকে অন্যত্র গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। সীসার মত কোন ভারি জিনিসের পরিবর্ত্তে যদি তত বড়ই একখণ্ড কাঠ ঐ পাত্রের জলে দেওয়া যায়, তাহা হইলে কিন্তু সে কাঠ খণ্ড জলের উপরেই ভাসিতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, যদিও জল এবং কাষ্ঠ খণ্ড—উভয়কেই পৃথিবী আকর্ষণ করিতেছে, তথাপি কাঠ জল অপেক্ষা হাল্‌কা বলিয়া, উহা জলের উপরেই ভাসিতে থাকে।

বায়ু আমরা চখে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু বায়ু সর্ব্বস্থানেই আছে, তাহা তোমার জান। প্রথম খণ্ড সাথীতে জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যায় তাহা বুঝানও হইয়াছে, সুতরাং সে বিষয় পুনরায় লেখা নিষ্প্রয়োজন। এই বায়ু অতিশয় হাল্‌কা বলিয়াই বোধ হয়; ইহার যে একটা ভারিত্ব আছে, তাহা আমরা সাধারণতঃ অনুভব করিনা বটে কিন্তু তাই বলিয়া বায়ু সম্পূর্ণ ভার শূন্য নহে। সুতরাং জল অথবা সীসার ন্যায়, বায়ুকেও পৃথিবী আকর্ষণ করিয়া থাকে। একটা শূন্য বোতল হাতে করিয়া আমরা মনে করি বোতলটার মধ্যে কিছুই নাই। বাস্তবিক তাহা নয়, একটা পাঁইট বোতলের মধ্যে এগারো গ্রেন্ অথবা প্রায় সাড়ে পাঁচ রতি বায়ু আছে। এই বোতলের মধ্যে যদি জল ঢালিয়া দেওয়া যায়, তবে জল বায়ু অপেক্ষা ভারি বলিয়া, অধিকতর বেগে আকর্ষিত হইয়া বোতল পূর্ণ করিয়া ফেলে, বায়ু হালকা বলিয়া বাহির হইয়া যায়। এই জল ওজন করিলে তাহা ৯০০০ গ্রেনের কিছু বেশী হয়, সুতরাং বায়ু অপেক্ষা জল ৮৪০ গুণ ভারি, এবং পৃথিবী যখন জল ও বায়ুকে আকর্ষণ করে, তখন বায়ু অপেক্ষা জলকে ৮৪০ গুণ বেগে আকর্ষণ করিতে থাকে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে বাতাস কেন বহে, তাহাও অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে।

বায়ু যে এত হাল্‌কা তাহার কারণ কি জান? যে সকল অণুতে বায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে, সে গুলি অতিশয় ক্ষুদ্র, এত ক্ষুদ্র যে এপর্য্যন্ত যে সমস্ত উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতেও বায়ুর অণু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ও অতি সূক্ষ্ম অণুসকল

একত্রে যদিও ভয়ঙ্কর ঝড়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তথাপি এই অণুসকল একটি আর একটির সহিত সংলগ্ন হয় না—একটি আর একটির কাছে ঘেঁসে না। কোন একটা পাত্রের মধ্যে খানিকটা বায়ু আবদ্ধ করিয়া, ক্রমে তাহাকে সংকুচিত করিয়া এই অণুগুলিকে কতকটা কাছাকাছি আনা যায় বটে,কিন্তু তাহাদিগকে একত্র সংলগ্ন করা মানুষের অসাধ্য। ইহারা আপন মনে পৃথক পৃথক থাকিয়া. উচ্চে নীচে, দক্ষিণে বামে, চতুর্দ্দিকে অবিশ্রান্ত কেবল নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়, কেহ কাহারও কাছে যায় না।

এই বায়ুর অনুগুলি কখনও পরস্পরের নিকট হইতে খুব দূরে চলিয়া যায়, আবার কখনও বা খুব কাছাকাছি হইয়া থাকে। একটা পাঁইট বোতলে এগারো গ্রেন বায়ু ধরে; যদি সেই বোতলটি খানিকটা বরফের মধ্যে বসাইয়া রাখা যায় এবং বোতলের মুখ খোলা রাখা যায়, তাহা হইলে কিছু কাল পরে দেখা যাইবে যে, বোতলের মধ্যে এগারো গ্রেণের অনেক অধিক বায়ু প্রবেশ করিয়াছে। ইহার কারণ এই যে ঠাণ্ডা লাগিলে বায়ুর অণু গুলি খুব কাছা কাছিহইয়া যায়.সুতরাং বায়ুর আয়তন ও ক্রমে সংকুচিত হয়। বোতলে ঠাণ্ডা লাগায় বায়ু সংকুচিত হইয়া পড়াতে কতকটা স্থান খালি হইয়া গেল।
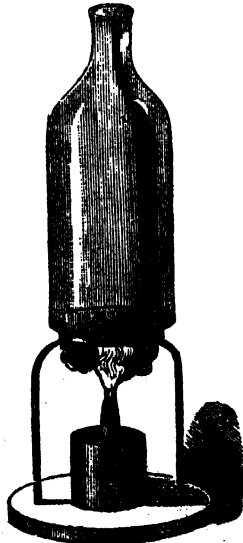
অন্য বায়ু অমনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। আবার যদি ঐ বোতলটি একটি দীপশিখার উপর ধরা যায়, তাহা হইলে উত্তাপ লাগিয়া অণুগুলি আবার বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে এবং পরস্পরের নিকট হইতে খুব দূরে চলিয়া যায় এবং খুব বেশী উত্তপ্ত হইলে উহারা আর বোতলের মধ্যে থাকিতে না পারিয়া একেবারে বাহির হইয়া পড়ে।

বায়ুর অণুগুলির গরম বড় সহ্য হয় না। ঠাণ্ডার সময় বরং মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু গরম হইলেই ইহাদের মাথা যেন খারাপ হইয়া যায়. ইহারা পাগলের ন্যায় চারি-দিকে ছুটিতে থাকে। এই কথাটা মনে রাখিও।

একটি খুব পাতলা চামড়ার থলের মধ্যে খানিকটা খুব গরম বাতাস পুরিয়া ঘরের মেজেতে রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে যে, বাতাস পূর্ণ থলেটি মেজে থেকে ক্রমে উপরের দিকে উঠিতেছে। কলিকাতার রাস্তায় লাল নীল প্রভৃতি নানারঙ্গের খেল্না বেলুন তোমরা অনেকে বেচিতে দেখিয়া থাকিবে, এগুলিও যে কারণে বাতাসে উড়িতে থাকে, গরম বাতাস পূর্ণ থলেটিও সেই কারণে মেজে থেকে উপরের দিকে উঠিয়াছে। বায়ুর অণুগুলি উত্তপ্ত হইলে বায়ু হালকা হইয়া যায় তাহা তোমরা দেখিয়াছ; থলেটি গরম বাতাস দ্বারা পূর্ণ হওয়াতে ইহাও আশ পাশের বায়ু হইতে হাল্কা হইয়াছে।

পৃথিবী এ উভয় বায়ুকেই আকর্ষণ করিতেছে। থলের বায়ু উত্তপ্ত হওয়াতে হালকা হইয়াছে সুতরাং পৃথিবী সেই থলের হাল্কা বায়ু অপেক্ষা আশপাশের শীতল ও গুরুভারযুক্ত

বায়ুকে বেশী জোরে আকর্ষণ করিতেছে; এবং যে কারণে গেলাসের জলে সীসার জিনিসটি তলায় ডুবিয়া গিয়াছিল এবং জল উপরে উঠিয়াছিল, বায়ু পূর্ণ থলেও সেই কারণে
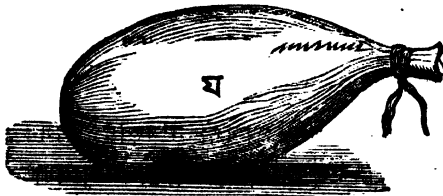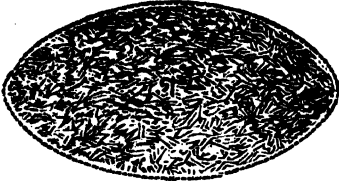
মেজে থেকে উপরের দিকে চলিয়া গেল এবং শীতল ও গুরুভারযুক্ত বায়ু তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইল। (গওঘ চিহ্নিত চিত্র দেখ)

যে কারণে গেলাসের জলে সীসার জিনিসটি ছাড়িয়া দিবা মাত্র তাহার গতি নীচের দিকে হয় এবং জলের গতি উপরের দিকে হয়, থলের মধ্যে গরম বায়ু পূর্ণ করিয়া দিলে, তাহাও সেই কারণে উপরের দিকে উঠিতে থাকে। তোমরা অনেকে বেলুন উড়িতে দেখিয়া থাকিবে, তাহারও এই একই কারণ। বেলুনে হাইড্রোজেন নামক বাষ্প পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়, হাইড্রোজেন বায়ু অপেক্ষা হাল্কা এইজন্য বেলুনে হাইড্রোজেন পুরিয়া ছাড়িয়া দিলে, উপরে উঠিয়া যায়। বেলুনের উপরের দিকে গতি, গরম বায়ু পূর্ণ থলের উপরের দিকে গতি, বা গেলাসের জলে সীসার জিনিসটি ছাড়িয়া দিলে জলের যে উপরের দিকে গতি তোমরা দেখিলে, এ সমস্তেরই কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ। পৃথিবীর আকর্ষণে নীচের দিকে গতি না হইয়া ইহাদের উপরের দিকে গতি কেন হইল তাহা বোধ হয় মনে আছে? যে জিনিসের গুরুত্ব বেশী, তাহাই পৃথিবী অধিক বেগে আকর্ষণ করিয়া থাকে। গরম বায়ু অপেক্ষা শীতল বায়ু অধিক ভারি, হাইড্রোজেন অপেক্ষা সাধারণ বায়ু অধিক ভারি, জল অপেক্ষা সীসা অধিক ভারি, এই জন্য শীতল বায়ু, সাধারণ বায়ু এবং সীসাকে পৃথিবী অধিক বেগে আকর্ষণ করে, কাজেই সে গুলির নীচের দিকে গতি হয় এবং গরম বায়ু, হাইড্রোজেন ও জলের উপরের দিকে গতি হয়। এইটি যদি বেশ বুঝিয়া থাক, তবে বায়ু কেন বহে এবং আগুন লাগিলে বায়ু কেন প্রবল বেগে বহিতে থাকে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। যখন কোন স্থানে আগুন লাগে, তখন সেই আগুনের উত্তাপে সেই স্থানের বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উঠে, এবং বায়ুর অণুগুলি উত্তাপের গুণে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে দূরে দূরে সরিয়া যায়, ইহাতে সেই বায়ু ক্রমে হাল্কা হইতে থাকে। কিন্তু এদিকে পৃথিবীর আকর্ষণ ভারি জিনিসের উপর অধিক বলিয়া, সেই উত্তপ্ত বায়ু রাশীর চারিদিকের শীতল বায়ু অধিক বেগে পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত হইতে থাকে, কাজেই উত্তপ্ত হাল্কা বায়ু সেই গুরুভারযুক্ত বায়ুকে স্থান দিয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়, এবং এই জন্য প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকে। পৃথিবীর সকল স্থানে সূর্য্যের উত্তাপ সমান নহে, কোন স্থানে বেশী, কোন স্থানে কম। সূর্য্যের

উত্তাপেও বায়ু উত্তপ্ত হয়, এবং উত্তপ্ত হইলেই তাহা হাল্কা হইয়া যায়, কাজেই অন্যস্থানের শীতল ও গুরুভারযুক্ত বায়ু পৃথিবীর আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া তাহার স্থান অধিকার করিতে আসে, হাল্কা বায়ুও তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। বায়ু যে সর্ব্বদা বহিতেছে, ইহাই তাহার কারণ। এবং সময় সময় যে বসন্তের মৃদু মধুর সমীরণ ভয়ঙ্কর ঝড়ের আকার ধারণ করে, তাহারও কারণ এই।

সুন্দর বনে সাত বৎসর।

আমি কতক্ষণ চেতনাশূন্য হইয়া পড়িয়া ছিলাম জানিনা। তার পর যখন চেতনা হইল, তখন ধীরে ধীরে চাহিলাম। চাহিয়া দেখিলাম, আমাদের সে বজ্‌রাও নাই, সঙ্গের লোকজনও নাই; একখানি অনাবৃত নৌকার উপর আমি শয়ান রহিয়াছি। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। আমি ধীরে ধীরে নৌকার উপর উঠিয়া বসিলাম। উঠিয়া দেখি একটি খালের মধ্য দিয়া নৌকা খানি যাইতেছে, আট দশ জন লোক খুব জোরে নৌকাখানি বাহিয়া লইয়া চলিয়াছে; সে খানি ছিপ নৌকা ছিল, এদিকেও আট দশজন খুব বলিষ্ঠকায় লোক বাহিতেছিল, কাজেই ছিপ্ খানি তীর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই খালের দুই কূলে এত ঘন নিবিষ্ট জঙ্গলে পরিপূর্ণ যে, সূর্য্যের প্রখর কিরণও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আমি সেই অস্ফুট আলোকে যাহা দেখিলাম, তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, ইহারা পতরাজের সেই আরাকান দস্যুদল, আমাদের বজ্‌রা লুটপাট করিয়া আমাকে ইহারা ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি উঠিয়া বসিবামাত্র পশ্চাৎ দিক হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল "কিগো বাবু ঘুম ভাঙ্গ্‌লো?" আমি সেই কথায় ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, যে লোকটি মেলায় আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল, এ সেই! তখন আমি সব বুঝিতে পারিলাম। মেলায় আমার চলা ফেরা, ভাব গতিক দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিল যে, আমরা খুব সঙ্গতিপন্ন লোক হইব। এলোকটিও তাহাই মনে করিয়া আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল; এবং দূরে দূরে থাকিয়া খোঁজ খবর লইতেছিল। পরদিন যে মগ বালকটি আমার সঙ্গে ফিরিতেছিল এবং যাহাকে শেষে আমি ইহার সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়াছিলাম, সেও বোধ হয় ইহাদেরই লোক এবং বোধ হয় ঐ উদ্দেশ্যেই আমার সঙ্গে সঙ্গে সমস্তদিন ফিরিতেছিল।

সে লোকটির কথায় কোন উত্তর না করিয়া, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদের বজ্‌রা কোথায়, আমাদের লোকজন কোথায়, তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না, তোমরা আমায় তাদের কাছে দিয়ে এসো।" এই কথা শুনিয়া ছিপের

লোকগুলি সকলেই বিকট রবে হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে আমি চম্‌কিয়া উঠিলাম। তোমরা হয়ত মনে করিতেছ হাসির রবে আবার চম্‌কায় কে? কিন্তু তোমরা হয়ত তেমন বিকট হাসি শোন নাই, তাই ও কথা মনে করিতেছ। আমি ত বালক, একটা হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত সে হাসির রবে ভয় পাইয়াছিল। হঠাৎ সেই সময় তীরের দিকে দৃষ্টি পড়ায় আমি দেখিলাম, তীরের কাছে জঙ্গলের মধ্যে একটা নেকড়ে বাঘ ঘুমাইতেছিল, হঠাৎ সেই বিকট হাসির রবে ভয় পাইয়া সে গভীর জঙ্গলের দিকে দৌড়াইয়া গেল।

সে যাহাই হউক, সেই লোকটি আমাকে বলিল, "তোমাদের বজ্‌রা এবং লোকজন এতক্ষণ সমুদ্রের গর্ভে গিয়া বিশ্রাম কচ্ছে, সে খানে যাওয়ার চেয়ে বোধ হয় আমাদের সঙ্গে যাওয়া মন্দ নয়, আর কেইবা তোমাকে সেখানে দিয়ে আস্‌তে যাবে?" আমি বুঝিলাম ডাকাতেরা আমাদের সঙ্গের লোকজনকে হত্যা করিয়া বজ্‌রা সমেত সমুদ্রজলে ডুবাইয়া দিয়াছে। প্রথম প্রথম আমার মনে খুব ভয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু যখন শুনিলাম যে, ডাকাতেরা আমাদের বজরা ডুবাইয়া দিয়াছে এবং লোকজন দিগকেও হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে, এবং যখন দেখিলাম যে, আমি সম্পূর্ণ রূপে ইহাদের হাতেই পড়িয়াছি, তখন আমার ভয় একেবারে চলিয়া গেল। বিপদে পড়িবার আশঙ্কারই লোকের ভয় হয়, কিন্তু বিপদের মধ্যে পড়িলে, তখন আর সে ভয় থাকে না। আমারও তাহাই হইল। আমি নির্ভীক অন্তরে তাহাদিগকে বলিলাম, 'জলে ডুবে মরতে হয় সেও ভাল, তবু আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না, চোর ডাকাতের সঙ্গে একত্রে থাকা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। তোমরা আমাকে এই খানেই নামিয়ে দাও।" সে লোকটি বলিল, 'এখানে কোথায় নাম্‌বে? এ যে সুন্দর বন! এখানে নাম্‌লে মুহূর্ত্তের মধ্যে তোমাকে প্রাণ হারাতে হবে, এখানে 'ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর' সে কথা কি জাননা? ঐ দেখ কুলের দিকে চেয়ে দেখ," এই বলিয়া সে কুলের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, একটা বাঘ খালের তীরে আসিয়া জল পান করিতেছে। তখন ভাবিলাম কথা ত মিথ্যা নয়; আমাকে ডাকাতেরা সুন্দর বনের মধ্যে লইয়া আসিয়াছে, এখানে এই ভয়ঙ্কর স্থানে কোথায় গিয়া আমি দাঁড়াইব? বুঝিলাম

ইহাদের সঙ্গে জোর করিয়া কোন লাভ নাই, বাধ্য হইয়াই আমাকে ইহাদিগের সঙ্গে যাইতে হইবে। আমি আর কোন কথা কহিলাম না। নীরবে বসিয়া নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেই ছিপের উপর বসিয়া বসিয়া বাড়ীর কথা, মাতা পিতার কথা, ভাই ভগ্নীর কথা, দাদা মহাশয়ের কথা, সমস্ত একে একে মনে উঠিতে লাগিল। তখন একবার মনে হইয়াছিল, কেন সকলের অবাধ্য হইয়া গঙ্গা সাগরে আসিয়াছিলাম? এই ঘটনার মুলই আমি। আমার জন্যই এতগুলি লোক ডাকাতের হাতে প্রাণ হারাইল। আমার চলা ফেরা, ভাব গতিক দেখিয়াই ত ডাকাতেরা ঠাহর পাইয়াছিল; আমি না আসিলে তাঁহারা কোন সন্ধানই পাইত না। দাদা মহাশয় সমস্ত রাত্রি কপিল মুনির মন্দিরে ছিলেন, প্রাতঃকালে নদীতীরে আসিয়া বজ্‌রা দেখিতে না পাইয়া তিনিই বা কি করিতেছেন? ডাকাতেরা সকলকে হত্যা করিল, আমাকে কেন হত্যা করিল না এবং কেনইবা আমাকে তাহারা লইয়া

আসিল? এই সকল নানা কথায় আমি একেবারে ডুবিয়া গেলাম। সেই সময় হঠাৎ একটা বিকট রবে আমি চমকিয়া উঠিলাম। সেই লোকটি বলিল, "ঐ শুন্‌ছো এখানে নাম্‌বে? ঐ চেয়ে দেখ।" আমি কুলের দিকে চাহিয়া দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড বাঘ দাড়াইয়া রহি-

য়াছে; বুঝিলাম সে বিকট রব আর কিছু নয়, এই বাঘেরই ডাক।

সে যাহা হউক, সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে সেই খাল দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া ছিপ্‌খানি একস্থানে গিয়া লাগিল। আমরা সেখানে উপস্থিত হইবা মাত্র, পূর্ব্ব দিনের সেই বালকটি কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিল এবং চির পরিচিতের ন্যায় আমাকে আসিয়া বলিল, "ভাই এসেছ! এই আমাদের বাড়ী।" আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন আমি কেআস্‌বো তা তুমি কি জান্‌তে?" সে বলিল "বাবা বলেছিল যে আমি যদি তার কথা মত কাজ করি, তবে আমার খেল্‌বার সাথী করবার জন্যে তোমাকে এনে দেবে।"

সে যাহাই হউক, নৌকায় বসিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে, ইহারা যেখানে গিয়া নৌকা রাখিবে, আমি সেইখানে হইতেই চলিয়া যাইব; কিন্তু পরে দেখিলাম, এই অচেনা অজানা স্থানে, এই ভয়ঙ্কর সুন্দর বনের মধ্যে ইহারাই আমার আশ্রয়। ইহাদিগের নিকট হইতে পলাইতে

চেষ্টা করা বৃথা এবং পলাইয়া যাইবই বা কোথায়? চারিদিকে হিংস্র জন্তুর ভয়। সেই দিন বিকালেই একটি ঘটনায় আমি প্রাণ হারাইতে-ছিলাম। বৈকালে আমি ও সেই মগ বালকটি বেড়াইতে গিয়া ছিলাম। একস্থানে দেখিলাম এক রকম বনফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। আমার তাহারই একটি ফুল লইবার বড় ইচ্ছা হইল এবং সেই জন্য আমি ধীরে ধীরে জলের কাছে গেলাম। একটি ফুল ধরিবার জন্য যেমন হাত গিয়া ভাসিয়া উঠিলাম; কিন্তু উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার হাত পা একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। আমার সেই অবস্থা দেখিয়া আমার সঙ্গী দৌড়াইয়া আমার কাছে আসিয়া তাড়াতাড়ি তাহার কাপড়ের কোচাটা খুলিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিল, আমি তাহা ধরিলাম এবং সে আমাকে টানিয়া তীরে তুলিল।

আমি যখন সেই ফুলের প্রত্যাশায় জলের কাছে যাইতেছিলাম, তখন জঙ্গলের ভিতর

বাড়াইয়াছি অমনি সেই মগ বালকটি একটা চিৎকার করিয়া উঠিল, আমি সেই চিৎকারে চমকিত হইয়া পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া গেলাম। জলের স্রোতে খানিকটা দূরে হইতে এক প্রকাণ্ড বাঘ এবং জলের ভিতর হইতে এক প্রকাণ্ড কুমীর একই সময় আমাকে লক্ষ্য করিতেছিল। বাঘ যখন আমাকে ধরিবার জন্য লাফ দেয়, তখন আমার সঙ্গী বালক তাহা

দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠে, এবং আমি ঠিক সেই সময়েই জলের মধ্যে পড়িয়া যাই। এদিকে ঠিক যে সময়ে বাঘ লাফ দেয়, কুমীরও সেই সময় আমাকে ধরিতে আসে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া আমি উভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাই, এবং বাঘটা লম্ফ দিয়া কোথায় আমাকে ধরিবে না কুমীরের মুখের মধ্যে পড়িয়া যায়।

দুষ্টামির পরিণাম।

বিকাল বেলা ঠেঙ্গা হাতে
নন্দ বেড়ায় পথে পথে,
দেখ্‌তে পেলে শিক্‌লি বাঁধা
টেপি শুয়ে আছে;
দুষ্ট বুদ্ধি চাপ্‌লো ঘাড়ে
হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে,
তফাৎ থেকে মারলে খোঁচা
লাগ্‌লো টেপির গায়ে।

খোঁচা খেয়ে টেপি কল্লে
ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ,
নন্দ তারে ভেংচি কাটে
কেউ, কেউ, কেউ।
রেগে টেপি তেড়ে যায়
খেয়ে দু পা তুলে,
হাতটি তুলে নন্দ নাচে
হেসে হেলে দুলে।

খানিক পরে পটাৎ করে
শিক্‌লি গেলো কেটে,
নৃত্য ফেলে নন্দ তখন
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে।
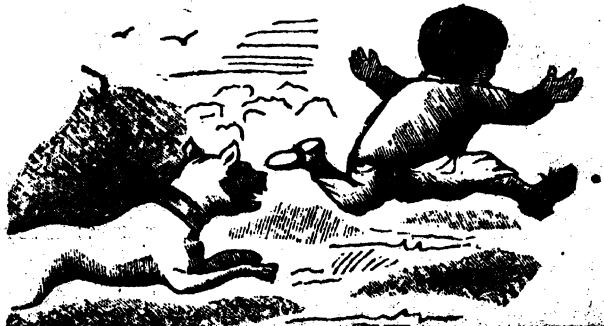
প্রাণের দায়ে ছোটে নন্দ
টেপি—ধরে ধরে,
পথের মাঝে পাত্‌কো ছিল
গেলো তাতে প'ড়ে।

বাবা গো বাবা! গেলুম্ গেলুম্!
হাবুর ডুবুর আঁ!
ধর গো আমায় ধর ধর
ঝপর ঝপর ছ্যাঁ!

এমন তর শব্দ শুনে
কুয়োর ভিতর থেকে,
কাছে একটা মালী ছিল
ছুটলো তারি দিকে।
কুয়োর ভিতর মানুষ দেখে
দড়ি দিলে ফেলে,
নন্দ তখন কেঁপে কেঁপে
দড়ি গাছা ধর্‌লে চেপে;
মালি তখন কল ঘুরিয়ে
টেনে টেনে তোলে;
পাতাল থেকে নন্দ দুলাল
ওঠেন ধরা তলে।

কাপড় জামা জলে ভিজে
জুতোর ভিতর জল,
পেটের ভিতর জলে ভরা
করে কল্ কল্।
মুখখানি সে ছোট্ট করে
যখন গেল সরে,
টেপি তখন চলে গেল
লেজটি নেড়ে নেড়ে।

দ্বাদশ বর্ষ | আষাঢ় ১৩০২ | ৩য় সংখ্যা

ফিরে চাবে না ?

আমি বড় যে আশা ক'রে
এসেছি তোমা দ্বারে
কঠিন কথা ক'য়ে
ফিরায়ো না;
তুমি একটি কথা কও
হাসিয়া ফিরে চাও
অমন ভ্রূকুটি ক'রে
চেও না।
আমি ক'য়েছি কটু কথা
দিয়েছি প্রাণে ব্যথা
তাই কি আর কথা
কবে না ?
আজ হৃদয়ে স্নেহ ভ'রে
এনেছি তোমা তরে
আর কি আমায় ফিরে
চাবে না ?

স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন।

কলুটোলার সেনবংশ আর একটি রত্ন হারাইল। বৃদ্ধা মাতার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া এবং স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু ও অসংখ্য ছাত্রমণ্ডলীর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দুরন্ত কাল অকালে কৃষ্ণবিহারীকে ইহজগৎ হইতে কাড়িয়া নিয়াছে। দুঃখিনী ভারত মাতা তাঁহার আর একটি সুসন্তান হারাইলেন। সখা ও সাথীর পাঠক পাঠিকার মধ্যে অনেকেই বোধ হয় স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারীর নাম শুনেন নাই। না শুনিবারই কথা; কারণ, তিনি আমাদের দেশের একটি বড় লোক হইয়াও নামের প্রয়াসী ছিলেন না। দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি অনেক চিন্তা করিতেন এবং অনেক হিতকর কাজ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু যখনই যাহা করিয়াছেন অন্যের প্রশংসা লাভের জন্য তাহার কিছু করেন নাই। দেশের মঙ্গল হইবে এই বিশ্বাসেই নীরবে সে সব কাজ করিয়াছেন। তাঁহাতে আড়ম্বর কিছুমাত্র ছিল না; অহঙ্কার বলিয়া একটা জিনিস কেহ তাঁহাতে দেখে নাই; এবং রাগ তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারিত না। বিনয়, সরলতা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি, সেই হাসিমাখা সৌম্য মুখ খানি এখনও যেন আমাদের চক্ষের উপর ভাসিতেছে।

কৃষ্ণবিহারীর অসাধারণ পড়াশুনা ছিল। তিনি কোন বিষয় উপরে উপরে একটু জানিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন না। যাহা ধরিতেন তাহা তলাইয়া না বুঝিয়া ছাড়িতেন না; এবং কোন বিষয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব না করিয়া তাহার সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতেন না। সত্যের উপর তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল, এবং অসত্য ও মিথ্যা ভান ইত্যাদি তিনি হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই তাঁহাকে জানিত, এবং একবার জানিলে তাঁহাকে কেহ ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। বহুকাল পর্য্যন্ত তিনি "মিরার" ও "লিবারেল" পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। অসত্যের ও অন্যায়ের প্রতি সর্ব্বদাই তাঁহার তীব্র কটাক্ষ ছিল। কিন্তু অযথা কোন কটু কথা বলিয়া কখনও কাহারও মনে কষ্ট দিতেন না। ২০ বৎসর পর্য্যন্ত

তিনি এলবার্ট কলেজের রেক্টর (Rector) ছিলেন। তাঁহার কাছে যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে, বিনয়নম্র ব্যবহারে এবং সুন্দর শিক্ষাপদ্ধতিতে তাঁহারা সকলেই মোহিত হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাতেই কৃষ্ণবিহারী উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে পাশ হইয়া তিনি কম্পিটিসন্ স্কলারসিপ পান, এবং এম, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে সকলের উপরে হন।

স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন কৃষ্ণবিহারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। কেশবচন্দ্রের উপর কৃষ্ণবিহারীর অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। কৃষ্ণবিহারীর লেখার মাধুর্য্যে সকলে মোহিত হইতেন। কেশব চন্দ্র যে এমন অদ্বিতীয় বক্তা-ছিলেন, তিনিও কনিষ্ঠ ভ্রাতার লেখার ও চিন্তা-শীলতার শ্রেষ্ঠতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন।

কৃষ্ণবিহারী যে নাম কিম্বা উচ্চপদের প্রার্থী ছিলেন না, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইচ্ছা থাকিলে এবং একটু চেষ্টা করিলে তিনি কলিকাতায় অনেক উচ্চ পদের অধিকারী হইতে পারিতেন; কিন্তু অজ্ঞাতভাবে কাজ করিতেই তিনি ভালবাসিতেন। যাহা কিছু সম্মান তিনি পাইয়াছিলেন তাহা অযাচিত ভাবে আসিয়াছে। ইংরাজীতে ত তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল; তাহা ছাড়া, ফরাসী ও জর্ম্মাণ ভাষাও তিনি জানিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনার জন্য ইদানিং পালি ভাষা তিনি সুন্দররূপ শিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণবিহারী বাঙ্গলাও অতি সুন্দর লিখিতেন।

১৮৪৭ সালের ৩০শে নভেম্বর কৃষ্ণবিহারীর জন্ম হয়। অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, গত ২৯ শে মে ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শোকার্ত্তের বন্ধু পরমেশ্বর তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের মধ্যে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন বি, এ।

গরীব বামুনের পিঠারোগ।

দক্ষিণ দেশের কোন এক গ্রামে এক গরিব ব্রাহ্মণ বাস করিত। সারা দিন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সে যে চাউল পাইত, সন্ধ্যার সময় তাহাতে তাহার এবং তাহার স্ত্রীর কোন ক্রমে উদর পূরণ হইত। এইরূপে অতি দুঃখে তাহাদিগের দিন কাটিত!

একদিন এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে ঐ ব্রাহ্মণ ও তাহার স্ত্রীর ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হইল। দক্ষিণ দেশে ব্রাহ্মণ ভোজনে পিঠা খাওয়ান একটা বাঁধা নিয়ম। সুতরাং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী পেট ভরিয়া সে দিন পিঠা খাইতে পাইল। পিঠা খাইয়া তাহাদিগের এত ভাল লাগিল যে, বাড়ীতে পিঠা তৈয়ার করিয়া খাইবার জন্য ব্রাহ্মণীর বড় সাধ হইল। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ভিক্ষা করিয়া যে চাউল আনিত, ব্রাহ্মণী রোজ তাহা হইতে কিছু কিছু রাখিয়া দিতে লাগিল। ৪।৫ দিনে কতকটা চাউল জমিয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণী এক পাড়াপড়সীর বাড়ী হইতে কিছু কড়াইর ডাল চাহিয়া আনিল; অন্য এক বাড়ী হইতে কিছু গুড় আনিল। এই রূপে পিঠা প্রস্তুত করিবার সমস্ত আয়োজন হইলে, জীবনে দ্বিতীয়বার পিঠা ভোগ হইবে, এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর আর আনন্দ ধরে না।

ব্রাহ্মণী দেখিতে দেখিতে চাউল ও কড়াই বাঁটিয়া তাহাতে লবণ, লঙ্কা, ধনে বাঁটা ও দই মিশাইয়া পাঁচ খানা পিঠা তৈয়ার করিল এবং ভাজিবার জন্য তপ্ত খোলায় চড়াইয়া দিল।

পিঠা ভাজিবার সময়ে ব্রাহ্মণীর মুখে কিন্তু জল আসিয়াছিল। শেষ পিঠা খানি ভাজা হইতে না হইতেই ব্রাহ্মণও ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ঘরে ফিরিল। পিঠার সুগন্ধে গৃহ আমোদিত দেখিয়া তাহারও প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণী একখানা থালায় করিয়া পিঠা

কয়খানি তাহার স্বামীর সম্মুখে রাখিল। ব্রাহ্মণ দুখানি পিঠা নিজের জন্য রাখিয়া আর দুখানি তাহার স্ত্রীকে দিল। কিন্তু বাকী পিঠাখানি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায়!—এমন সাধের পিঠা ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা করিতে ব্রাহ্মণের প্রাণ চাহিল না। অথবা পিঠা খানিকে দুভাগ করিলেই যে ভাগে মিলিবে, তাঁহার বুদ্ধিতে তাও আসিলনা। যাহাই হউক, বাকী পিঠা খানি লইয়া ব্রাহ্মণ মহা ফাঁফরে পড়িল। অবশেষে ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া কহিল—"ওগো এই বাকী পিঠাখানি হয় তুমি খাও, নয় আমিই খাই। কে খাবে বল?"

একটা আস্ত পিঠা কার ভোগে লাগিবে, স্বামীর না স্ত্রীর?—এই কঠিন সমস্যা লইয়া ব্রাহ্মণীরও মাথা ঘুরিয়া গেল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্রাহ্মণ এই প্রস্তাব করিল যে, পিঠা গুলি যেমন আছে তেমনি থাক। তাহারা স্বামী স্ত্রীতে রান্না ঘরের দাওয়ায় যাইয়া চোখ বুঁজিয়া শুইয়া থাকিবে। যে আগে চোখ খুলিবে কিম্বা কথা কহিবে, তাহাকে দুখানা পিঠা খাইতে হইবে। ব্রাহ্মণীও তাহাতে সম্মত হইল—পিঠা কখানি বাটি চাপা পড়িল। তার পর ভিতর দিক্ হইতে দরজা বন্ধ করিয়া স্বামী পূব্ দিকের দাওয়ায় ও স্ত্রী পশ্চিম দিকের দাওয়ায় যাইয়া শুইল।

সারাদিন চলিয়া গেল। দুই দিন, ক্রমে তিন দিন গেল। দুই জনের কেহই চক্ষুও খুলিল না, কথাও কহিল না।

তিন দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের দরজা বন্ধ দেখিয়া গ্রামের লোকদের মনে নানা সন্দেহ হইতে লাগিল। কেহ ভাবিল ব্রাহ্মণ ও তাহার স্ত্রী ডাকাতের হাতে মারা পড়িয়া থাকিবে। শেষে সকলে স্থির, করিল যে, তাহাদের দোর ভাঙ্গিয়া দেখা আবশ্যক। গ্রামের দুইজন চৌকীদারের উপর এই কাজের ভার দেওয়া হইল। চৌকীদারেরা দোর খুলিয়া দিলে গ্রামের সমস্ত লোক ব্রাহ্মণের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহারা দেখিল যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী রান্নাঘরের দুই পাশে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সকলেই তাহাদের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল। তাহারা কিন্তু গ্রামবাসিদের সকল কথাই শুনিল, কিন্তু পিঠার লোভে কোন কথা বলিল না, চোখ বুঁজিয়া মড়ার মত পড়িয়া রহিল।

গ্রামের লোকেরা চাঁদা তুলিয়া তাহাদের দাহ করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। সমস্ত জোগাড় হইলে, তাহাদিগকে শ্মশান ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। পথে সকলে বল-বলি করিতে লাগিল—"আহা দুজনে কি ভাল বাসা ছিল, নইলে কি এমন ক'রে একসঙ্গে মরে!"—খাটিয়ার উপরে শুইয়া দুজনেই এ সকল কথা শুনিল, কিন্তু পিঠার লোভ কারো মুখে কথা নাই!

অবশেষে শ্মশান ঘাটে চিতা তৈয়ার হইল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে চিতায় চড়াইয়া দিয়া পুরোহিত মন্ত্র আওড়াইল। তার পর চিতাতে আগুন ধরান হইল। আগুন ধূধূ করিয়া জলিয়া উঠিল, তখনও পিঠার লোভে কেহ কথা কহিল না। আগুনের তাপে যখন ব্রাহ্মণের শরীর ঝলসিয়া যায়, তখন আর সে না থাকিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, "অগত্যা আমিই দুখানা পিঠে খাব।"—অমনি পাশের চিতা হইতে শব্দ হইল—"তবে আমারই জিৎ হ'ল, আমি তিন খানা পাব।"

সকলে ত অবাক্। চিতায় চড়ান মড়াকে পিঠার কথা কহিতে শুনিয়া সকলেই মনে করিল যে মৃত দেহ ভূতে পাইয়াছে। অমনি সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী তখন চিতা হইতে নামিয়া ঘরে আসিয়া পিঠা ভাগ করিয়া খাইল। কিন্তু চিরদিনের মত তাদের একটি দুর্নাম রহিয়া গেল; গ্রামের লোকেরা, বিশেষতঃ দুষ্ট ছেলেরা দেখিলেই তাদের 'পিঠেভূত' বলিয়া ত্যক্ত করিত।

শ্রীকালীশঙ্কর সুকুল এম, এ

কাশী।

কলিকাতা হইতে রেলগাড়ি করিয়া পশ্চিম যাইতে দেড় দিন বা দুই দিনের পথের মধ্যে বিশেষ কোন দেখিবার স্থান নাই। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান গুলি বাঙ্গলা দেশ হইতে অনেক দূরে, তবে পশ্চিমের দেখিবারযোগ্য স্থান গুলির মধ্যে সকলের অপেক্ষা নিকটে—কাশী।

কাশী হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থ স্থান। কাশীর আর এক নাম বারাণসী। বারণা বা বরুণা এবং অসী নামে কাশীর দুইদিকে দুইটি ক্ষুদ্র নদী আছে, তাহা হইতেই ইহার নাম বারাণসী হইয়া থাকিবে। অতি প্রাচীন কাল হইতে কাশী বিখ্যাত। তিন চার হাজার বৎসরের পুরাতন পুস্তকে কাশীর উল্লেখ ও বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে কপিল সাংখ্য দর্শন ও গৌতম ন্যায় দর্শন রচনা করেন এই স্থানে বুদ্ধদেব সর্ব্ব প্রথমে আপন মত প্রচার করেন।

কাশী কলিকাতা হইতে রেলপথে ২৩৮ ক্রোশ দূরে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের মোগল সরাই ষ্টেসনে নামিয়া অন্য লাইনে কাশী যাইতে হয়। মোগলসরাইয়ের পর ষ্টেসনেই কাশী। কাশী গঙ্গার উত্তর তীরে। কাশীর নিকট গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বাঁকিয়া গিয়াছে। কিছু দিন হইল গঙ্গার উপর লোহা এবং পাথর দ্বারা খুব বড় এবং অতি সুন্দর একটি সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার উপর দিয়া রেলগাড়ি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি, লোক জন, হাতী ঘোড়া সবই পারাপার করে। এই সেতু নির্ম্মিত হইবার আগে লোকে নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইয়া কাশী যাইত। কাশীর দিকের তীর খুব উঁচু, কিন্তু অন্য পারের তীর, তেমনি নীচু আবার বর্ষাকালে তাহা অনেক দূর পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যায় ও গ্রীষ্মকালে চড়া পড়ে। গঙ্গার মধ্যস্থলে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, একদিকে বালুকাময় বিস্তীর্ণ মরু, অপর দিকে ৬০।৭০ হাত উঁচু তটের উপর মন্দির, খুব বড় বড় বাড়ী, মস্‌জিদ, গম্বুজ, মিনার প্রভৃতি নদীর ধারে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই তটের উপর হইতে দুইশত আড়াইশত হাত প্রশস্ত বড় বড় পাথরের সিঁড়ি জলে নামিয়া গিয়াছে। পাঁচ তলা ছ তলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীর জানালা সকল, চৌকোনা দেয়াল গুলি গঙ্গার দিকে উন্নত হইয়া রহিয়াছে। খুব বড় বড় অষ্ট কোন বিশিষ্ট স্তম্ভ সকল জলের মধ্যে রহিয়াছে। মন্দিরের পর মন্দির, প্রাসাদের পর প্রাসাদ এবং নদীগর্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পাথরের বড় বড় সিঁড়ি দেখিতে বড়ই সুন্দর।

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন কাশীর ঘাট সমূহে জন স্রোতের বিরাম নাই। সকল প্রকার ও সকল শ্রেণীর লোকই স্নান ও পূজা অর্চ্চনার জন্য ঘাটে গতায়াত করিতেছে। কাশীর ঘাটও অনেক। প্রায় ৫০টা প্রধান প্রধান ঘাট আছে। এক একটা ঘাটে দুই শত, তিন শত করিয়া প্রস্তরের ধাপ আছে। দশাশ্বমেধ ঘাট একটি প্রসিদ্ধ ঘাট। প্রবাদ আছে যে, ব্রহ্মা এই স্থানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই ঘাট প্রয়াগের গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের ন্যায় পবিত্র তীর্থ স্থান।

তার পর শ্মশান ও মণিকর্ণিকা ঘাট। শ্মশান ঘাটটি খুব ছোট, তিন চারিটি মৃত দেহের অধিক এক সময়ে দাহ করা যায় না। এই শ্মশানে পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র রাজা শব আগলাইতেন ও শূকর চরাইতেন। মণিকর্ণিকাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও পবিত্র তীর্থ স্থান। এই রূপ গল্প প্রচলিত আছে যে, ব্রহ্মা আপন চক্রের দ্বারা এই খানে একটি ছোট পুকুর কাটেন ও আপন শরীরের ঘর্ম্মে তাহা পূর্ণ করিয়া দেন। এবং তাহার পর পাঁচ হাজার বৎসর শিবের তপস্যা করেন। শিব [illegible] তাঁহাকে বর দিতে চাহেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া [illegible]র ইচ্ছা শিব তাঁহার সহিত বলেন, তাঁহা[illegible] চিরকাল ঐ খানে[illegible]ন বাস করেন। এই কথায় শিবের এত আনন্দ [illegible] হইল যে, তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠি[illegible] এবং তাহাতেই তাঁহার কানের মাকড়ি ঐখানে খ[illegible]ল। এই জন্য ইহার নাম মণিকর্ণিকা হইয়াছে।

ইহার অপর নাম মুক্তিক্ষেত্র, এই ঘাট কাশীর ঠিক মাঝখানে। ইহারই নিকটে গোয়ালিয়রের দৌলতরাও সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী এক প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট নির্ম্মাণ করেন। ইহার নাম সিন্ধিয়া ঘাট। তারপর রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট রাজ ঘাট। পূর্ব্বে এই খানে পারাপারের জন্য নৌকা পাশা পাশি রাখিয়া এক নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই সকল ঘাটের উপরে জলের ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাল পাতার ছাতি রহিয়াছে, ছবিতে দেখিতে পাইবে। এই সকল ছাতির তলায় বসিয়া পুরোহিতেরা স্নানকারীদিগকে পূজা অর্চ্চনার মন্ত্র পড়ান এবং সাধু সন্ন্যাসিরা তপস্যা করেন। কাশীতে অগণ্য দেব মন্দির। সমস্ত কাশীটাই যেন দেব মন্দিরের সমষ্টি। কাশীর মন্দির গুলি প্রায় সবই প্রস্তর নির্ম্মিত এবং তাহাতে নানা প্রকার চিত্র খোদিত।

কাশীতে অতি প্রাচীন কাল হইতে বিশ্বেশ্বরের (শিবের) এক অতি বৃহৎ মন্দির ছিল। এখন তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আরঙ্গজেব সেই মন্দির চূর্ণ করিয়া তাহারই উপর এক প্রকাণ্ড মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মস্‌জিদের পশ্চিমদিকের প্রাচীরের অধিকাংশই পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অংশ। ইহারই নিকটে নূতন বিশ্বেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাই নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পরে মহারাজা রণজিৎ সিংহ পীড়িত হইয়া রোগমুক্ত হইবার আশায়, এই মন্দিরের উপরের সমুদয়টা সোনার পাত দিয়া মুড়িয়া দেন। এই মন্দিরের সম্মুখের উঠানটির একটি পাথরের ছাদ আছে। এই ছাদ অনেক গুলি পাথরের থামের উপর স্থাপিত। এই স্থানে একটি শ্বেত পাথরের প্রকাণ্ড এক বৃষ বসিয়া আছে। ইহা নেপালের কোন রাজার প্রদত্ত। এই স্থানে একটি কূপ আছে, তাহাকে জ্ঞানবাপী বলে।

প্রবাদ আছে যে, যখন আরঙ্গজেব বিশ্বেশ্বরের আসল মন্দির চূর্ণ করেন, তখন শিব সেখান হইতে পলাইয়া, এই কূপে আশ্রয় লইয়া যবনের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। বিপদের সময়ে তাঁহার এই উপস্থিত বুদ্ধি যোগাইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম জ্ঞানবাপী হইয়াছে। সাধারণ লোকের এই ব্যাখ্যা। প্রাচীন বিশ্বাসীগণ বলেন যে, গণেশ এই কূপ খনন করিয়া সেই জলে শিবকে স্নান করান।

শিব তাহাতে বড়ই আরাম লাভ করিয়া এই বর দেন যে, এই কূপ পবিত্র হইল, এবং ইহার জলে যে স্নান করিবে, সে দিব্য জ্ঞান লাভ করিবে।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকটেই অন্নপূর্ণার মন্দির। ১৭২১ সনে পুনার পেশওয়া বাজিরাও ইহা নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের মেজে সাদা ও কাল মার্ব্বল পাথরে মণ্ডিত ও ইহার প্রস্তর স্তম্ভগুলি সুন্দর চিত্রিত। অন্নপূর্ণার মূর্ত্তির মুখখানি সোনার ও দেহ খানি প্রস্তরের। শরীর সমুদয়ই মূল্যবান বস্ত্রে আচ্ছাদিত। ইঁহার এক হাতে হাতা, অপর হাতে থালা। এই খানে ভিক্ষুকগণ দলে দলে আসিয়া থাকে ও আহার পাইয়া থাকে। অন্নপূর্ণা কাহাকেও বঞ্চিত করেন না, যে যায় সেই এক মুঠা খাইতে পায়; কাশীতে কেহ অনাহারে থাকে না। মান মন্দিরের ঘাটের নিকট ধর্ম্মেশ্বর বা অনাথ বন্ধুর মন্দির। তৎপরে দুর্গামন্দির, এই মন্দির সহরের দক্ষিণ দিকে গঙ্গা ও অসীর সঙ্গমের নিকট অবস্থিত। ইহা প্রস্তর নির্ম্মিত ও সেই প্রস্তর গুলিতে নানা প্রকার কারুকার্য্য খোদিত, মন্দিরটি দেখিতে বেশ সুন্দর, ইহা নাটোরের রাণী ভবানী নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের সম্মুখের উঠানে ও নিকটস্থ অন্যান্য মন্দিরের ছাদে সর্ব্বদাই অসংখ্য বানর বিচরণ করে। ইহারা দেবতার অংশ বলিয়া ইহাদিগের প্রতি কেহ কোন অনিষ্টাচরণ করে না। বরং যাত্রী ও উপাসকগণ প্রচুর পরিমাণে আহার সামগ্রী দেয়। ইহার পর ভৈরবনাথের মন্দির। ইহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে আধ ক্রোশ দূরে, টাউন্ হলের নিকট। ভৈরবনাথ বা কাল ভৈরব কাশীর কোতোয়াল—ইনি দেবতাদের পুলিস সাহেব। ইঁহার এক প্রকাণ্ড কুকুর প্রহরী আছে। ভৈরবনাথের মন্দিরের নিকট গোপাল মন্দির। ইহা মনি মুক্তা ও বহুমূল্য আসবাবের জন্য বিখ্যাত। ইহাতে কৃষ্ণের সোনার মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরের নিকট "কালকূপ" নামে একটি কূপ আছে। এই কূপের প্রাচীরের উপর একটি ছিদ্র আছে, ঠিক বেলা দুই প্রহরের সময়ে ঐ ছিদ্র দ্বারা সূর্য্য রশ্মি প্রবেশ করিয়া কূপ জলে পড়ে। যে সকল লোক অদৃষ্টের ফলাফল জানিতে ব্যস্ত, তাহারা ঠিক ঐ সময়ে এই কূপ দেখিতে যায়। কাশীতে আরও অনেক দেবালয় আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মন্দিরে মন্দিরে কাশীকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। রাস্তার ধারে, গলি ঘুঁচিতে, প্রত্যেক মোড়ে, সর্ব্বত্রই মন্দির। দেব মূর্ত্তিও অসংখ্য। পথে, ঘাটে, রাস্তায়, গৃহপ্রাঙ্গনে, সর্ব্বত্রই দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বড় মন্দির দু হাজারের উপর হইবে, তা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় অসংখ্য, দেবতাও অনেক। এই সকল হিন্দু দেবালয়ের মধ্যে স্থানে স্থানে মুসলমানদের মস্‌জিদ্‌ও দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু দেবালয় ভাঙ্গিয়া সেই সকল ইট পাথর লইয়া, সেই দেবালয়ের উপরেই মস্‌জিদ্ গঠিত হইয়াছে। আলাউদ্দিন ১৩০০ খৃঃঅব্দে সহস্র হিন্দু মন্দির চূর্ণ করেন। পরে মন্দিরের সংখ্যা আবার বাড়িয়া উঠে এবং আবার আরঙ্গজেব বহু সংখ্যক মন্দির ধ্বংস করেন। এত মন্দিরের মধ্যে মস্‌জিদেরই প্রস্তরমিনার আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে।

ছবিতে যে আকাশভেদী উচ্চ মিনার দেখিতেছ, উহাকে লোকে বেনী মাধবের ধ্বজা বলে। এটি উচ্চে ১৫০ ফুট। পূর্ব্বে আরও ৫০ ফুট অধিক

উচ্চ ছিল। ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয়ে ৫০ ফুট কাটিয়া ছোট করা হইয়াছে। গঙ্গা বক্ষ হইতে এটি প্রায় ৩০০ ফুট উচ্চ হইবে, কলিকাতার মনুমেণ্ট অপেক্ষা অনেকে উঁচু। সংকীর্ণ ঘোরান ঘোরান সিঁড়ি দিয়া এই মিনারের উপর উঠা যায়; সেথান হইতে সমস্ত সহরের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীর কিছু দূরে অতি প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তি—সারনাথের বৌদ্ধ স্তূপ আর একটি দেখিবার জিনিষ। এই স্থানে বুদ্ধদেব শিষ্যদিগের নিকট প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারই স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ কোন বৌদ্ধ রাজা কর্ত্তৃক এই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্তূপের নীচের অর্দ্ধেক প্রায় ২৮ হাত পর্য্যন্ত বড় বড় প্রস্তর খণ্ড দ্বারা গঠিত, উপরের অর্দ্ধেক ইষ্টক নির্ম্মিত। সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪ হাত উঁচু। ইহা প্রায় সাত আট শত বৎসরেরপুরাতন বলিয়া অনুমান করা যায়।
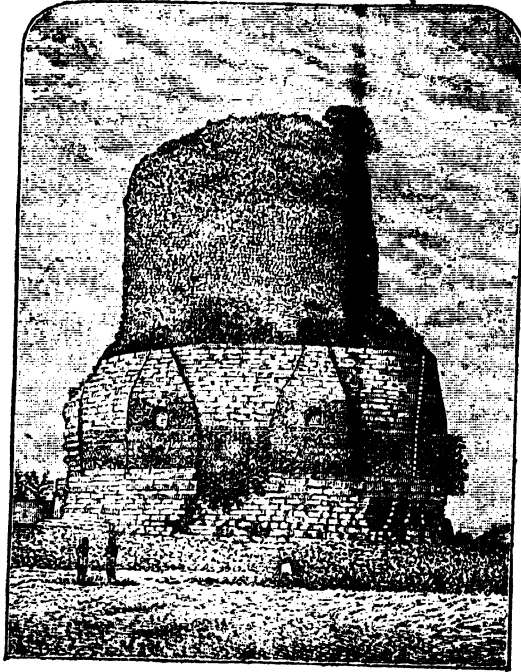
কাশীর মানমন্দির একটি দ্রষ্টব্য স্থান। জ্যোতিষ গণনার জন্য ১৬৮০ খৃঃঅব্দে জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইনি অতি বিদ্বান লোক ছিলেন। সম্রাট মহম্মদ সাদি ইঁহাকে তখনকার পঞ্জিকার ভুল সংশোধন করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। ইনি দিল্লি, জয়পুর, উজ্জয়িনী ও মথুরাতেও এই রূপ মানমন্দির নির্ম্মাণ করেন।

কাশীতে নানা দেশীয় রাজা ও জমিদারদিগের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আছে। দক্ষিণে রাজা চৈৎসিংহের প্রাসাদ আছে। কাশীর পশ্চিমে মধুদাসের বাগান বাটী আছে। চৈৎসিংহকে বন্দী করিবার সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এই গৃহে বাস করেন। পরে ১৭৯৯ খৃঃঅব্দে অযোধ্যার নবাব উজির আলিকে এই স্থানে বাস করিতে দেওয়া হয়। তিনি সেই গৃহে তাঁহার রক্ষক চেরি সাহেবকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিলে, তাঁহাকে ধৃত করিয়া কলিকাতায় রাখা হয়।

কাশীর সংস্কৃত কলেজ বা কুইন্স কলেজ দেখিতে বেশ সুন্দর। ১৮৫৩ সালে গভর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় রাজা ও জমিদারদের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থে, বহু ব্যয়ে এই বিদ্যালয়টি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যস্থলের চূড়া ৭৫ ফুট উচ্চ, চতুর্দ্দিকে সুন্দর বাগান। সম্মুখে একটি ফোয়ারা। ইহার পুস্তকালয়ে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এবং অতি প্রাচীন অনেক প্রস্তর মূর্ত্তি ও স্তম্ভ প্রভৃতিও রক্ষিত আছে।

দু একটি রাস্তা ছাড়া কাশীতে গাড়ি চলি-

বার মত রাস্তা নাই। রাস্তা বা গলি সকল আঁকা বাঁকা ও সংকীর্ণ। রাস্তাগুলি সর্ব্বদাই অতিশয় অপরিস্কার ও দুর্গন্ধময়। এই সকল সংকীর্ণ রাস্তায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ষাঁড় অবাধে বিচরণ করে, এই জন্য অনেক সময় অনেক বিপদ ঘটিয়া থাকে। এখন কাশীতে জলের কল হইয়াছে ও রাস্তায় ড্রেণ তৈয়ারি হইতেছে।

কাশীতে তামা ও পিতলের উপর খোদাই কাজকরা নানা প্রকার দ্রব্য নির্ম্মিত হয়। সোনা, রূপা, পিতল, ও প্রস্তরের নানা প্রকার দেব মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়। নানা প্রকার ছেলেদের খেলনাও প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মিত হয়। কারুকার্য্য খোদিত পিতলের রেকাব, থাল, গেলাস, বাটী, চামচ, দীপদান, ঘটি, কলস, আতরদান, গোলাপদান প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য অসংখ্য দোকান রহিয়াছে।

কাশীর আর একটি প্রসিদ্ধ জিনিষ—বারানসী সাড়ী। কাশী বারানসী সাড়ীর জন্য বিখ্যাত। এই স্থানের কোন কোন বহুমূল্য কিংখাবের প্রতি গজ সাত আট শত টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ বসু।

বীর বালক।

পানের বর্ত্তমান প্রধান সেনাপতি কাউণ্ট জামাগাটার বাল্য জীবনের একটি সুন্দর গল্প আজ তোমাদিগকে বলিব। কাউণ্ট জামাগাটার নামে আজ জাপানের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। এমন সুপুত্র লাভ করিয়া কোন মাতার মুখ উজ্জ্বল না হয়!

আমাদের দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে, "যে গাছের আম বড় হয় তার পাতা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।" ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মুখ হইতেও এই রকম একটা কথা বাহির হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন "Child is the father of man," এই কথাটি অনেকের জীবনেই সফল হইতে দেখা গিয়াছে। কাউণ্ট জামাগাটার জীবনে তাহা অতি আশ্চর্য্য রূপে সফল হইয়াছে। তাঁহার বাল্য জীবনের একটি ঘটনায় তাঁহার সাহস, নির্ভীকতা এবং প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

দশবৎসর বয়সেই জামাগাটার সাহস ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। গ্রীষ্ম কালে একদিন তিনি একটি কাগজের ছাতি হাতে (জাপানী ও চীনেরা এই প্রকার ছাতি যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকে) করিয়া কোন স্থানে যাইতে ছিলেন, তাঁহার অন্য হাতে কয়েক খানি বই ছিল।

পথের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি এক মনে একখানি বই পড়িতে পড়িতে চলিতে ছিলেন; হঠাৎ কয়েকজন স্ত্রীলোক ও কয়েকটি ছোট ছেলের চিৎকার শুনিয়া তিনি মাথা

তুলিলেন, এবং দেখিলেন, একটি ঘোড়া পথের অন্য দিক হইতে একটি সৈনিক পুরুষ পিঠে করিয়া, তাঁহার দিকে বিদ্যুত বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। ঘোড়ার বল্গা ছিঁড়িয়া তাঁহার পায়ের কাছে ঝুলিতেছে, সে ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সেই বল্গা হাতে পাইতেছেন না ঘোড়াকেও থামাইতে পারিতেছেন না, তাই তিনি চিৎকার করিয়া পথিক দিগকে সাবধান করিতেছেন।

ঘোড়াটিকে এইরূপ ভাবে ছুটিতে দেখিয়া সকলেই শশব্যস্তে পথ হইতে সরিয়া পড়িল। কিন্তু সেই ঘোড়ার সওয়ার সভয়ে দেখিলেন, একটি সুন্দর বালক কেবল মধ্য পথে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখে চিন্তা বা ভয়ের চিহ্ন মাত্র নাই, যেন তাহার দুই খানি কোমল হাতে এই উন্মত্ত ঘোড়াটিকে সে বশীভূত করিবে! ঘোড়ার সওয়ার মনে করিলেন, ছেলেটি কি পাগল; ঘোড়ার পায়ের নীচে যে তাহার কোমল দেহ পড়িয়া এখনি চূর্ণ হইয়া যাইবে; তাঁহার বীরনামে কলঙ্ক হইবে। শত শত অবাধ্য ঘোড়াকে তিনি বশে আনিয়াছেন, আর আজ কিনা তাঁহারই চালিত ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়িয়া একটি বালকের প্রাণ যাইতে বসিয়াছে!

কিন্তু আর উপায় নাই। ঘোড়ার সওয়ার প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করিয়া বলিলেন "আবু নাই যো" (পালাও, পালাও)! ঘোড়া তখনো প্রায় এক শত হাত দূরে, তখনও সাবধান হইবার সময় ছিল; কিন্তু বালকের সে চেষ্টা নাই। ঘোড়াটি যখন খুব কাছে আসিয়াছে তখন সেই নির্ভীক বালক ধীরে ধীরে বই গুলি পথের উপর নামাইয়া রাখিল. এবং কাগজের ছাতাটি বন্ধ করিয়া তাহার বাঁটটি বাঁকাইয়া ধরিল।

পর মুহূর্ত্তেই সেই উন্মত্ত ঘোড়া এক লম্ফে তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। বালকও মুহূর্ত্ত মধ্যে ছাতিটি খুলিয়া সেই ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মুখের দিকে ঠেলিয়া দিল।

হঠাৎ এইরূপ বাধা পাওয়াতে ঘোড়াটি থমকিয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইবামাত্র সেই ঘোড়ার সওয়ার তাহার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার বল্গা চাপিয়া ধরিলেন, এবং সেই নির্ভীক বালককে কিছু বলিতে যাইবেন, এমন সময় বালকটি ধীরে ধীরে বলিল, "মহাশয় ঘোড়াটাকে আগে ঠাণ্ডা করুন।"

ঘোড়াটি অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাণ্ডা হইল। ঘোড়ার সোওয়ারও সেই বালকের হাত ধরিয়া তাহাকে প্রায় কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন—"বৎস, একদিন তুমি জাপান রাজ্যের গৌরব স্বরূপ হইবে।"

সেই ভবিষ্যৎ বাণী আজ সফল হইয়াছে। এই সৈনিক পুরুষ আর কেহ নহেন, তিনি জাপানের প্রধান সেনাপতি সোইগো টাকামোরি। এই ঘটনার পর হইতে জামাগাটা সেনা পতির বিশেষ স্নেহ ভাজন হইয়া উঠেন। ক্রমে সেই বালকের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিস্কার হয়। জাপানের বর্ত্তমান অধিপতি যখন সিংহাসন লাভের জন্য অসংখ্য শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তখন জামাগাটা অসামান্য কার্য্যদক্ষতা এবং রণ কৌশলে দ্বিতীয় সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন।

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়।

প্রাকৃতিক গহ্বর।

জলে মাটি গলিয়া যায়। জলে যে পাথরও গলে তা তোমরা হয়ত অনেকে জান না। যাহারা প্রাকৃত ভূগোল পড়িয়াছ, তাহারা জান যে, বৃষ্টির জল যখন পাহাড়ে' জায়গার উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, তখন খানিকটা করিয়া পাথর গলিয়া সেই জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। তাই বলিয়া চিনি বা লবণ যেমন সহজে জলে গলিয়া যায়, মাটি বা পাথর সে রকম সহজে গলে না। বাতাসে অঙ্গারক বাষ্প নামক এক পদার্থ সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, বৃষ্টির সময়ে বায়ু হইতে সেই পদার্থ বৃষ্টির জলে মিশিয়া যায়। আবার সেই বৃষ্টির জল যখন মাটির উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, তখনও তাহাতে অনেক অঙ্গারক বাষ্প মিশিয়া যায়। কারণ মাটিতে সর্ব্বদাই [illegible]পালা বা জীবজন্তুর দেহ পচিয়া গলিয়া মা[illegible] সহিত মিশিয়া থাকে। গাছপালা বা জীবজ[illegible] পচিলে তাহা হইতে অঙ্গারক অম্ল উৎপন্ন হয় ও তাহাও মাটিতে মিশিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ জল, পাথর ক্ষয় করিতে পারে না। কিন্তু বৃষ্টির জলে বাতাস ও মৃত্তিকা হইতে অঙ্গারক অম্ল মিশ্রিত হইলে, সেই জলে পাথর প্রভৃতি কতক কতক গলিয়া যায়। পাথর গলিয়া গেলে জলের সহিত মিশিয়া যায়, জলের রং দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যেমন জলে চুন গুলিয়া পরে সেই জল স্থির ভাবে রাখিয়া দিলে দেখা যায় যে, চুনের উপর স্বচ্ছ পরিষ্কার জল রহিয়াছে, অথচ কিন্তু সেই জলে প্রচুর পরিমানে চুন মিশিয়া রহিয়াছে। যে দেশে চুনময় প্রস্তর (যে পাথর পোড়াইলে চুন হয়) প্রচুর পরিমানে থাকে, সে দেশের জ[illegible]য় স্থানে স্থানে জলে ক্ষয় হইয়া গর্ত্ত, গহ্বর ও ছোট বড় নানা প্রকার সুড়ঙ্গ উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর নানা স্থানে, বিশেষতঃ যে খানে কেবল চুনো পাথর আছে, সেখানে মাটির তলায় এইরূপ জলে পাথর গলিয়া, আপনা আপনি কত সুন্দর সুন্দর গহ্বর প্রস্তুত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার একটি গহ্বরের একটা ছবি দেওয়া গেল। জলে পাথর ক্ষয় হইয়া কত বড় প্রকাণ্ড এক গহ্বর প্রস্তুত হইয়াছে দেখ। এই গহ্বর ট্রীষ্ট নগর হইতে এগার ক্রোশ উত্তরে এডেলসবর্গ নামক স্থানে আছে। কেবল পাথর ক্ষয় হইয়াই যে গহ্বরটি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নহে। এই গহ্বরের ছাদের উপর হইতে যে জল চুয়াইয়া পড়ে, তাহাতে পাথর গলিয়া মিশিয়া থাকে। বাতাস লাগিয়া জল খানিকটা বাষ্প হইয়া গেলে, এবং সেই জল হইতে অঙ্গারক বাষ্প বাহির হইয়া গেলে, সেই গলিত পাথর জমিয়া যায়; যেমন জলে চিনি বা লবণ গোলা থাকিলে জল শুকাইলে আবার চিনি বা লবণ বাহির হইয়া পড়ে। মোমবাতীর গা বাহিয়া মোম গড়াইয়া জমিয়া গেলে যেমন হয়, সেইরূপ এই গহ্বরের ছাদ হইতে জলের সহিত পাথর গলিয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ আবার জমিয়া যায়। এইরূপে গলিত পাথর জমিয়া ঝাড়ের কলমের মত হইয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিয়াছে। উপর হইতে নীচে যেখানে যেখানে আবার জল পড়িয়াছে, সেখানেও পাথর জমিয়া জমিয়া উপর দিকে বাড়িয়া উঠিয়াছে।
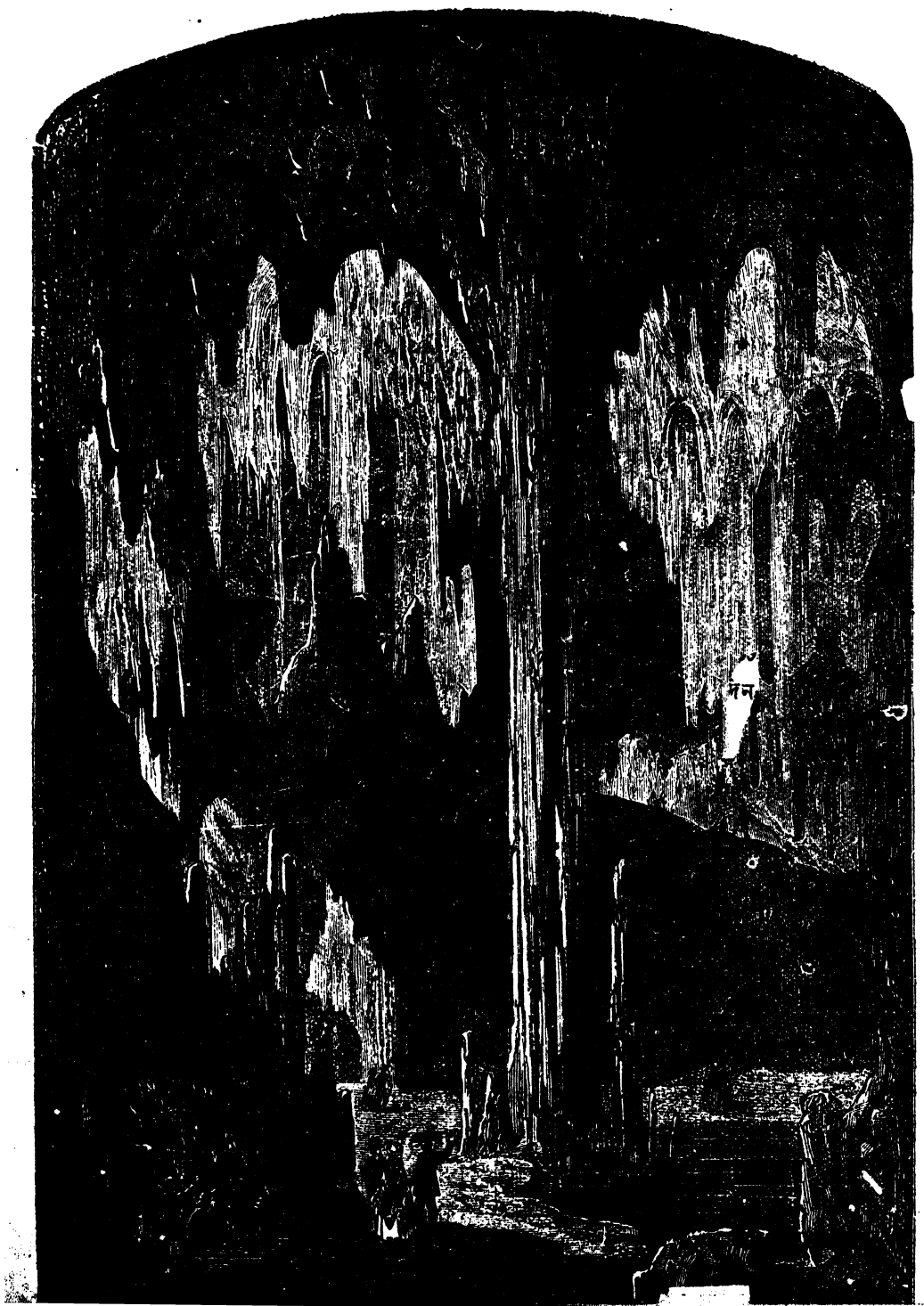
স্থানে স্থানে আবার উপর হইতে পাথর জমিয়া ক্রমে নীচে নামিয়া আসিয়া এবং নীচের পাথর জমিয়া ক্রমে উপরে উঠিয়া, একত্র মিশিয়া প্রকাণ্ড পাথরের থাম তৈয়ার হইয়াছে।

আমেরিকার কেণ্টাকি প্রদেশেও এইরূপ বহুক্রোশ বিস্তৃত প্রকাণ্ড অনেক গহ্বর বা সুড়ঙ্গ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের ভিতর গিয়া দেখিতে বড়ই চমৎকার। ইংলণ্ডের ডিভনসায়ার প্রদেশেও অনেক প্রাকৃতিক গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষে কাটিয়া খুঁড়িয়া এই গহ্বর তৈয়ার করে নাই। প্রকৃতি আপনিই জলের দ্বারা খুদিয়া এইরূপ গহ্বর নির্ম্মাণ করিয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে প্রাকৃতিক গহ্বর বলে। ভারতবর্ষেরও নানা স্থানে পাহাড়ে' যায়গায় প্রাকৃতিক গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেণ্টাকি প্রদেশের ও এডেল্স্বর্গের গহ্বরের মত বড় ও সুন্দর কোনটাই নয়।

এই সকল প্রদেশে প্রস্তর মিশ্রিত জলে কিছু পড়িলে, তাহা প্রস্তর মণ্ডিত হইয়া ঠিক যেন পাথরের জিনিস হইয়া যায়। গাছের ডাল, পাখীর বাসা, ধান, ছোলা, মটর, এই জলে ডুবাইয়া রাখিলে, অনেক দিন পরে দেখিতে পাইবে, সেই সকল দ্রব্য পাথরের হইয়া রহিয়াছে। রাজমহল পাহাড়ের কাছে গঙ্গায় কোন কোন সময়ে পূর্ব্বে নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে, তাহাতে যে শস্য ছিল, তাহা অনেক দিন জলের মধ্যে থাকায়, সে গুলি পাথরের মত হইয়াছে এরূপ দেখা গিয়াছে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ বসু।

মালী ও বানর।

(আরাম দূষক জাতক)

পারবে ত ?

পারব।

দেখ যেন ভুলোনা।

না ভুলবো না।

ব্রহ্মদত্ত তখন বারাণসীর রাজা। সহরে মহোৎসব হইবে রাজা ঘোষণা করিয়া দিলেন। রাজার আজ্ঞা প্রচার হইবামাত্র সহরময় মহা আয়োজন, মহা ধুমধাম পড়িয়া গেল, মহা সমারোহে উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। দেশ বিদেশ হইতে লোকে সেই উৎসব দেখিতে আসিল। কিন্তু সেই সহরের একটি লোকের বুঝি উৎসব দেখা হয় না ; রাজার বাগানের মালী বেচারীর সমস্ত দিনই নিজের কাজ লইয়া থাকিতে হয়,—ফুল তোলা, ফুলের তোড়া বাঁধা, ফুল গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি কাজ সারিয়া, সে যে একটু গিয়া উৎসব দেখিয়া আসিবে, সে সময়টুকু আর সে করিয়া উঠিতে পারিতেছে না ; অথচ তাহার বড় ইচ্ছা যে উৎসব দেখিতে যায়। কত হাতী ঘোড়া, কত লোক জন জমা হইবে, কত আমোদ প্রমোদ হইবে, বেচারী কি না দেখিয়া পারে ?

কাশীতে অনেক বানরের বাস। সেই বাগানেও একদল বানর বাস করিত। মালী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সেই বানরের দলের দলপতিকে গিয়া ধরিবে স্থির করিল।

সুযোগ বুঝিয়া একদিন বৈকালে মালী

বানরপতির নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বানরপতি তখন দলবল লইয়া আহারের চেষ্টায় বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। বাগানের মালীকে আসিতে দেখিয়া তাহা হইতে বিরত হইল এবং অভ্যর্থনা করিয়া মহা সমাদরে তাহাকে কাছে বসাইয়া তাহার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল।

মালী কহিল—"আর ভাই, আমার দুঃখের কথা শুনে কি করবে। এই দেখ না, এত বড় মহোৎসবটা হচ্ছে, কত দেশ বিদেশের লোক দেখ্‌তে যাচ্ছে, আর আমি বেচারী একদিনের জন্য একটু দেখবার ছুটি পেলাম না। কি করবো ভাই, পেটের দায়ে চাকরী করতে হয়, নয় তো তোমাদের মত স্বাধীন হলে আর ভাবনা ছিল কি?

মালীর কথায় বানরপতির ভারি দুঃখ হইল। সে বলিল—"সত্যি ভাই, এমন আমোদ প্রমোদটা তুমি দেখ্‌তে পেলে না, এ বড়ই দুঃখের কথা। তা ভাই, আমাকে দিয়ে যদি কোন সাহায্য হয় তা হলে আমি এখনি করি।"

মালী উত্তর করিল—"তা ভাই, তুমি যদি কর, তা হ'লে আমি একটু দেখ্‌তে যেতে পারি।"

বানরপতি বলিল—"তা বলনা, তুমি যা বলবে আমি এখনি তা কত্তে প্রস্তুত। তখন মালী বলিল—"আমি ভাই, বেশী কিছু চাই না। একটি বেলার জন্য যদি তুমি বাগানের গাছ গুলিতে জল দেবার ভার লও, তা হ'লেই হয়। আর কিছু তোমায় করতে হবে না। কেবল একটু দেখে দেখে গাছ বুঝে বুঝে একটু একটু জল দেওয়া। তোমার দলের বানর দের একবার একটু তুমি বলে দিলেই তারা করবে। আর এতে তাদের পুণ্যও আছে। তোমরা ত ছেলে বেলা থেকে এই বাগানেরই ফল, ফুল, কচি কচি পাতা প্রভৃতি খেয়ে মানুষ। আমি তোমাদের কখন কিছু বলি নাই, তোমরা স্বচ্ছন্দে খেয়ে দিব্বি সুখে আছ।"

বানর পতি বলিল—"এর জন্য আর এত বলতে হবে কেন? আমি এখনি আমার দলের বানর-দের ডেকে বলে দিচ্ছি, তুমি নির্ভাবনায় উৎসব দেখ্‌তে যাও, কোন চিন্তা নাই, আমি সব ঠিক করে দেব।" 'দেখো যেন ভুলো না' বলিয়া মালী খুসী হইয়া উৎসব দেখিতে চলিয়া গেল। প্রথম চারিটি কথা মালীর ও বানর পতির।

মালী চলিয়া গেলে বানরপতি অনুচর-দিগকে ডাকিয়া বলিল,—"আজ তোমাদের এই বাগানের মালীর কাজ করতে হবে। সে বেচারী বড় ভাল লোক। আমরা কত অত্যা-চার করি, বাগানের ভাল ভাল ফল, মূল, ফুল, পাতা সবই আমরা খাইয়া ফেলি, অথচ সে আমাদের কখন কিছু বলে না। রাজার বাগান বটে, কিন্তু বাগানের রাজাই আমরা; কত সুখ স্বচ্ছন্দে এখানে আমরা বাস কচ্ছি। আজ মালী বেচারী সহরে উৎসব দেখ্‌তে গেছে, আজ এ বেলা তোমরা কোন দিকে যেও না, বাগানের সমস্ত গাছে দেখে দেখে বেশ করে জল দিও। যেন কম বেশী না হয়।"

বানরেরা দলপতির হুকুম পাইয়া তখনই কলসি কাঁধে হুকুম তামিল করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সেই সময় এক বৃদ্ধ বানর যোড়হাতে নিবে দন করিল,—"মহারাজ, কোন গাছে কি পরিমাণ জল দিতে হবে হুকুম হয়।"

বানর পতি বলিল,—"গাছ বুঝিয়া জল দিবে; যে গাছটি যেমন, তাহার গোড়ায় সেই পরিমাণ জল দিবে।"

বানরটি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন গাছে কত জল লাগ্‌বে তা কেমন করে বুঝবো?"

তখন অনুচরেরা রাজার আদেশ অনুসারে খুব মনোযোগের সহিত বাগানের সমস্ত গাছের শিকড় তুলিয়া দেখিয়া দেখিয়া জল দিতে লাগিল।

ইহার ফল যাহা হইল, পাঠক পাঠিকা দিগকে তাহা বোধ করি আর বলিয়া দিতে হইবেনা।

বানরপতি বলিল—"আরে এ সোজা কথাটা আর বুঝ্‌লে না? শিকড় খুঁড়ে গাছ গুলি এক একটি করে তুলে দেখ্‌লেই বোঝা যাবে, কোন গাছে কত জল দিতে হবে।"

বানরেরা সকলেই বলিয়া উঠিল,—"তাইত, এ সোজা কথাটা আমরা এতক্ষণ বুঝ্‌তে পারি নাই?"

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে দেখা গেল, বাগানের সমুদয় গাছ শুকাইয়া গিয়াছে, সেই সুন্দর ফলে ফুলে সুশোভিত বাগানটি একদিনে মরুভূমে পরিণত হইল!

বাগানটির অবস্থা দেখিয়া বানরেরাও অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল, কারণ তাহা নষ্ট হয় এ তাহাদের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। তাহারা

ভাল করিতেই গিয়াছিল, খুব যত্নের সঙ্গে গাছ গুলিতে জল দিয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধির দোষে ভাল করিতে গিয়া মন্দ হইল।

বুদ্ধদেবের নাম তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। তিনি এই গল্পটি দ্বারা শিষ্য দিগকে এই কথাটি বুঝাইয়াছিলেন যে, শুভ ইচ্ছা থাকিলেও বুদ্ধির দোষে অনেক সময় লোকে ভাল করিতে মন্দ করিয়া বসে।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ।

পিপীলিকার কথা।

তোমরা চারিদিকে নানা রকম পিপীলিকা দেখিতে পাও। কোন কোন জাতীয় পিপীলিকা খুব ছোট ছোট হয় কোন কোন জাতীয় একটু বড় হয়। কোন কোন জাতীয়ের রং কাল হয়, আবার কোন কোন জাতীয়ের রং লাল হয়। কোন কোন জাতীয় পিপীলিকার হুল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ক্ষুদ্র প্রাণী বটে, তাই বলিয়া ইহাদের বুদ্ধি বড় কম নয়। ইহাদের পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা দেখিলে অনেক কুড়ে ছেলের শিক্ষা হয়। আর ইহাদের গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সুন্দর কৌশল দেখিলে অনেক বড় বড় কারিকরকেও লজ্জা পাইতে হয়। ইহাদের দৈনিক জীবন ও কাজ কর্ম্ম প্রায় মানুষেরেই মত।

এখনে একটা কথা আগেই বলিয়া রাখি। তোমরা হয় ত মনে করিতে পার যে, পিঁপ্‌ড়ের ডিম ফুটিয়া পিঁপ্‌ড়ে হয়, কিন্তু তা নয়।

পিঁপ্‌ড়ের ডিম ফুটিয়া এক রকম শুঁয়ো পোকা হয়; এই শুঁয়ো গুলি পরে আবার গুটি হয়। রেসমের গুটি তোমরা অনেকে দেখিয়া থাকিবে, ইহাও সেই রকমের। এই গুটি হইতেই পিঁপ্‌ড়ের বাচ্চা হয়। পিঁপ্‌ড়েদের দলের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ত আছেই এবং আরও এক রকম আছে, যাহারা স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়। স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপ্‌ড়ের বড় হইয়া বয়সে পাখা হয়, কিন্তু এই

জাতীয় পিঁপ্‌ড়েদের কখনও পাখা হয় না। ইহারাই ঘরের সমুদয় কাজ করে।

এখন এদের বাড়ী ও ঘর কন্নার কথাটা শোন। সকল জাতীয় পিপীলিকাই যে এক উপায়ে বাড়ী তৈয়ারি করে তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পিপীলিকারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও নানা রকমে বাড়ী বানায়। আমরা কেবল দুই এক জাতীয় পিপীলিকার বাড়ীর কথা বলিব। কোন কোন পিপীলিকারা মাটির ভিতরে ২০ হইতে ৪০ তলা পর্য্যন্ত বাড়ী তৈয়ারি করে। মাটির উপরে গর্ত্তের যে মুখটা থাকে, তাহার উপরে বেশ সুন্দর গম্বুজের মত বানায়। এই রকম করাতে সহজে বৃষ্টির

জল ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাদের বাড়ীর মধ্যে কত ঘর, কত বারাণ্ডা, কত দরজা থাকে, তাহার আর ঠিকানা নাই। যেন এক একটা রাজবাড়ী আর কি। থাকিবার লোক ও ত কম নয়, কত হাজার হাজার পিঁপড়ে এক একটা বাড়ীতে থাকে। এই সব বাড়ীর এক একটা ঘরে, তাহারা ডিম, গুটি ও ছানা গুলি খুব যত্ন করিয়া রাখে। কোন কোন ঘরে খাবারজিনিষ আনিয়া সঞ্চয় করে। আমরা পিপীলিকাদের বাড়ীর ভিতরের একটা ছবি দিলাম। ইহাতে ঘরের মধ্যে ডিম, শুঁয়ো ও গুটি গুলি কেমন সুন্দর সাজান আছে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।

আবার কোন কোন জাতীয় পিপীলিকারা গাছের উপর পাতার মধ্যে সুন্দর করিয়া বাড়ী বানায়। তাহাতেও অনেক ছোট ছোট সুন্দর ঘর তৈয়ারি করে। খুব গরমের সময় পিপীলিকারা ডিম ও ছানা গুলিকে একবারে নীচের তলায় খুব ঠাণ্ডা ঘরে লইয়া যায় এবং শীতের সময় উপরের ঘরে লইয়া আসে। অন্য কোন শত্রু আসিয়া যদি তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে ও তাহাদের খাবার চুরি করে, কিম্বা ছানা খাইয়া ফেলে, এই ভয়ে পিপ্‌ড়েরা তাহাদের বাড়ীর ফটক বন্ধ করিয়া দেয়। (৫৮ পৃষ্ঠা দেখ) এইফটক বেশ মজবুৎ করিয়া বানায়, শত্রুরা যেন সহজে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে না পারে।
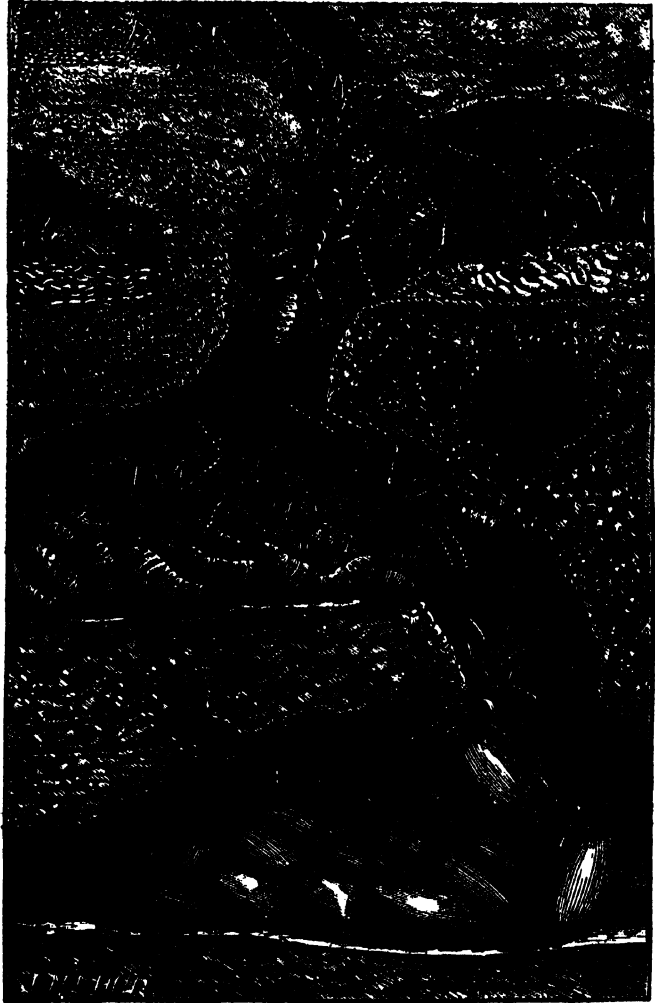
এখন পিপ্‌ড়েদের আর একটি মজার কথা শোন। একজাতীয় পিপীলিকা আছে, তাহারা চাকর খুঁজিয়া বেড়ায়। এই পিপ্‌ড়েরা অন্য

কোন জাতীয় দুর্ব্বল পিঁপ্‌ড়েদের মধ্যে যাইয়া তাহাদের অনেককে ধরিয়া লইয়া আসে এবং আনিয়া তাহাদিগকে চিরদিনের মত চাকর করিয়া রাখে। দুর্ব্বলেরা নিরুপায় হইয়া ইহাদেরই চাকুরী করিতে আরম্ভ করে। ইহাকে ঠিক চাকুরী বলা যায় না, কারণ এরা ত আর মাহিনা পায় না, কেবল খাইতে ও থাকিতে পায়। এই দাসদের প্রভুরা কিন্তু ভারি নিষ্কর্ম্মা। চাকরেরাই বাড়ীর কাজ কর্ম্ম সব করে, এমনকি মনিবদের খাওয়াইয়া ও দেয়। মনিবেরা বসিয়া বসিয়া বাবুগিরি করেন, নিজের খাবারটাও খুঁজিয়া আনিতে পারেন না। এই জাতীয় পিঁপ্‌ড়েদের যদি চাকর না থাকে, তাহলে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে। একবার এই বাবু পিঁপ্‌ড়েদের বাসা ভাঙ্গিয়া, খানিকটা অংশ অনেক গুলি পিঁপ্‌ড়ে শুদ্ধ একটা বোতলে রাখা হইয়াছিল। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল যে, বাবুরা একেবারে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। তার পরে যখন একটা চাকর পিঁপ্‌ড়েকে ভিতরে দেওয়া হইল, অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।
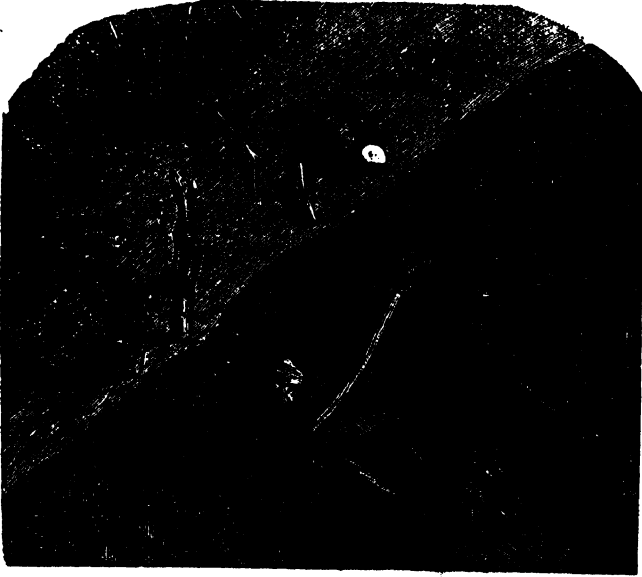
এই চাকরটা বাবুদের খাওয়াইয়া দিল, সেবা সুশ্রূষা করিল, এবং বাড়ীর সেই ভগ্নাংশটিকে নুতন করিয়া বানাইতে আরম্ভ করিল। এই চাকর পিঁপ্‌ড়েরা যে বাবু পিঁপ্‌ড়েদের সঙ্গে ইচ্ছা করিয়া চলিয়া আসে তাহা নহে। বাবু পিপীলিকারা যখন ইহাদিগকে ধরিতে যায়, তখন এই দুই দলে তুমুল যুদ্ধ হয়। চাকর পিপীলিকারা ছোট বলিয়া ইহাদের সহিত যুদ্ধে সহজেই হারিয়া যায় এবং ইহারাও তখন তাহাদিগকে অনায়াসে ধরিয়া লইয়া আসে। ইহারা একবার পরাস্ত হইয়া প্রভুদের হস্তগত হইলে, নির্ব্বিবাদে তাহাদের গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং পরে নুতন চাকর পিপীলিকাদের ধরিয়া আনিবারও সুবিধা করিয়া দেয়। পিপীলিকারা যে কেবল চাকর অন্বেষণ করিবার জন্যই যুদ্ধ করে তাহা নহে। অনেক সময় খাবার সামগ্রী লইয়াও দুই দলে তুমুল যুদ্ধ হয়। দুই দলের পিপীলিকারা সৈনিকের ন্যায় সার বাঁধিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ইহারা যুদ্ধ বিদ্যায় মানুষের চেয়ে বড় কম নয়। কখন কখনও চারি পাঁচ দিন ধরিয়া ভয়ানক যুদ্ধ হয়। রাত্রে ইহারা যুদ্ধ বন্ধ রাখে এবং দিনের বেলায় আবার নূতন

করিয়া আরম্ভ করে। দুটী বিরোধী দল যদি এক জাতীয়ই হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই সন্ধি হয়; শত্রুরা ভিন্ন জাতীয় হইলে ঝগড়া সহজে মেটে না। যাহারা যুদ্ধে আহত হয়, অন্য পিপীলিকারা তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করে। একজাতীয় পিপীলিকা আছে, তাহারা ভয়ানক যোদ্ধা, তাহারা যেন সর্ব্বদাই রণে উন্মত্ত হইয়া আছে।

মেক্সিকো দেশে একজাতীয় পিপীলিকা আছে, তাহারা বড় আশ্চর্য্য উপায়ে মধু সঞ্চয় করে। উহারা আপন দলের মধ্যে কতকগুলি পিপীলিকাকে মধু সঞ্চয় করিবার পাত্রে পরিণত করে। ইহারা কি এক আশ্চর্য্য উপায়ে এই পিপীলিকা গুলির পাকযন্ত্রের হজমের শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। অন্য পিপীলিকারা মধু আনিয়া ইহাদিগকে খাইতে দেয়; ক্রমে মধুর

ভারে ইহাদের উদর বড় হইয়া উঠে এবং পরিপূর্ণ হইলে তাহা এক একটা পাকা আঙ্গুরের মত দেখায়। যখন পিপীলিকারা অন্য খাদ্য সহজে পায় না এবং বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়ে তখন এই সকল মধুর ভাণ্ড ছিদ্র করিয়া মধু বাহির করিয়া খায়। এবং এই মধুসঞ্চয়কারী পিপীলিকারাও তাহাদের মধুপূর্ণ উদর চাপিয়া চাপিয়া, অন্য ক্ষুধার্ত্ত পিপীলিকাদের প্রয়োজন মত মধু বাহির করিয়া দেয়। এই জাতীয় পিপীলিকাদের এক একটা বাসায় প্রায় এইরূপ ৬০০ শত মধু ভাণ্ড থাকে। এবং এই সমুদায় মধু জড় করিলে প্রায় আধসের মধু পাওয়া যায়। মেক্সিকো দেশের লোকেরা এই পিপীলিকাদের মধু সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। শত্রু পিপীলিকারা আসিয়া পাছে মধু চুরি করিয়া লইয়া যায়, এই ভয়ে এই পিপীলিকারা অন্যান্য সমুদায় পিপীলিকাদের ন্যায় রাত্রে বাড়ীর ফটক বন্ধ করিয়া রাখে।

এখন পিঁপ্‌ড়েদের গোরু পোষার কথা শোন। আমরা যেমন গোরুর দুধ্ খাইবার জন্য যত্ন করিয়া গোরু পুষি, ইহারাও সেই রকম করিয়া ইহাদের গোরু পোষে। কয়েক রকম ছোট ছোট পোকা আছে, তাহাদের পেট হইতে খুব মিষ্ট এক রকম রস বাহির হয়, পিঁপ্‌ড়েরা সেই রস খাইতে খুব ভাল বাসে। পিঁপ্‌ড়েরা শুঁড় দিয়া এই পোকাদের গায়ে শুড়্‌শুড়ি দেয়, আর এই পোকারাও অমনি সেই মিষ্ট রস বাহির করিয়া দেয়। এই পোকারাই পিপ্‌ড়েদের গোরু।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু বি, এ।

মহারাজা রণজিৎ সিংহ।

তোমাদের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়াছ, তাহারা সকলেই রণজিৎ সিংহের নাম জান। ইনি পঞ্জাব প্রদেশের একজন প্রসিদ্ধ বীর ও যোদ্ধা ছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বে শিখ জাতি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল; এই সকল দলের মধ্যে আবার একতা ছিল না, তাই শিখ জাতি সেই সময় বড়ই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। রণজিৎ আপনার অসাধারণ শক্তিতে এই বিভিন্ন দলকে এক করিয়াছিলেন এবং নিজেই সমস্ত শিখ জাতির নেতা হইতে পারিয়াছিলেন। শিখেরা খুব সাহসী, বীর ও যোদ্ধা, তাই মহারাজা রণজিৎ সিংহের নাম পঞ্জাবের ঘরে ঘরে আদৃত ও পূজিত হয়। কোন গুণে রণজিৎ আজও সমুদায় পাঞ্জাববাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিতেছেন?

যে সকল গুণ থাকিলে মানুষ খুব বড় যোদ্ধা এবং লোকদিগের নেতা হইতে পারে, রণজিৎ সিংহের সে সমুদয় গুণই ছিল; লোকের উপর আধিপত্য করিবার তাঁহার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। যে তাঁহার কাছে যাইত, সে তাঁহার অধীন না হইয়া পারিত না। এই গুণেই তিনি সমুদায় শিখ জাতিকে আমরণ তাঁহার অধীন
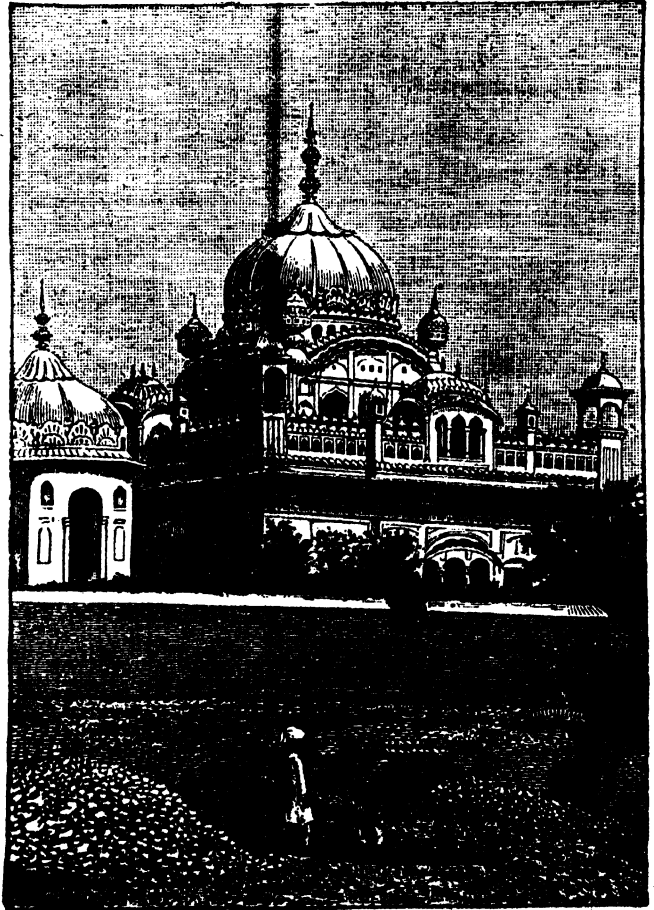
রণজিৎ সিংহের সমাধি মন্দির।

করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার যেমন অসাধারণ সাহস, তেমনি আবার অসাধারণ সহিষ্ণুতাও ছিল; এই জন্য তিনি যে কাজ হাতে লইয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কোন কাজে মানুষ অকৃতকার্য্য হইতে পারে, এ কথা তিনি কখনও বিশ্বাস করিতেন না। তিনি একজন খুব ভাল অশ্বারোহী ছিলেন, সমস্ত দিন ঘোড়ার উপর বসিয়া থাকিয়াও

মহারাজা রণজিৎ সিংহ।

ক্লান্তি বোধ করিতেন না। লোক চিনিবার তাঁহার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কে কোন কাজের উপযুক্ত, তাহা তিনি সহজেই বুঝিতেন; এবং এই রূপে লোক বাছিয়া তাহাদের উপযোগী কাজে নিযুক্ত করিতেন। যাহারা দক্ষতার সহিত কাজ করিত, তাহাদের তিনি সর্ব্বদাই পুরস্কৃত করিতেন। যুদ্ধের সময় অন্য যোদ্ধারা যেমন লুঠ করে, তিনিও তেমনি, লুঠ করিতেন বটে, কিন্তু সেই সকল লুণ্ঠিত দ্রব্য বা টাকা কড়ি, দরিদ্র দিগকে অকাতরে দান করিতেন। রণজিৎ সিংহ নিষ্ঠুর কিম্বা রক্তপিপাসু ছিলেন না। ঘোরতর শত্রুরাও তাঁহার হস্তগত হইলে, তিনি তাহাদিগকে কখনও প্রাণে বধ করিতেন না বরং তাহাদের প্রতি সর্ব্বদাই দয়া প্রদর্শন করিতেন। রণজিৎ সিংহের অন্যান্য অনেক দোষ সত্ত্বেও, সাহসে, সহিষ্ণুতায় ও দয়া দাক্ষিণ্যে তিনি এক জন প্রকৃত বীর ছিলেন। যাঁহারা লাহোর বেড়াইতে গিয়াছেন তাঁহারা হয়ত রণজিৎ সিংহের সুপ্রসিদ্ধ সমাধি মন্দির দেখিয়া থাকিবেন। এই (৬০ পৃষ্ঠা) মন্দির লাহোরের জুম্মা মসজিদের নিকটে। এই মন্দিরের খিলান গুলি সব মার্ব্বেল পাথরের, ছাদের ভিতর দিকে সুন্দর কাজ করা, আর তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর আয়না বসান। এই মন্দিরের মাঝ খানে বেশ সুন্দর মার্ব্বেল পাথরের বেদী আছে ও তাহার উপর বেশ বড় একটা পদ্মফুল খোদাই করা রহিয়াছে। এই ফুলটার মধ্যেই রণজিৎ সিংহের ভস্মাবশেষ আছে। এই বড় ফুলটির চারিদিকে আরও এই রকম কয়েকটি ছোট ছোট ফুল খোদাই করা আছে। রণজিতের সহিত যে সকল রাণীরা সহমরণে গিয়াছিলেন তাঁহাদের ভস্মাবশেষ এ গুলির ভিতর আছে। এই সুপ্রসিদ্ধ সমাধি মন্দিরে শিখেরা আজও এই মহাবীরের পূজা দিতে আসে। শিখেরা বড় বীর, তাই তাহারা যোদ্ধা ও বীরদিগের খুব সম্মান করে।

গাছের উপর বুলি।

ধাঁধা।

বুলি বেড়ালের আজ আর রক্ষা নাই। চারুচন্দ্র আজ বড়ই চটিয়াছেন, বুলিকে পাইলে মারিয়াই ফেলিবেন। চারুর ঝি বামা ও কোমর বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে বাহির হইয়াছে; তাহার হাতে এক গাছা ঝাঁটা, চারুর হাতে একটা বন্দুক। আর এও তো ভারি অন্যায়! বাজারের প্রধান রুই মাছটা আজ বাড়ী আসিল, আর তার মুড়োটি কি না বুলি উদরসাৎ করিয়া বসিল! বুলির এ ভারি অন্যায়। কিন্তু তোমরা অন্যায় মনে করিলেও বুলি একটুও অন্যায় মনে করে নাই। খাবার জিনিষে তোমাদের যেমন অধিকার, সে মনে করে তারও তেমনি অধিকার, তবে যে তোমরা মাছটুকু খাইয়া শুধু কাঁটাগুলি তাহার জন্য রাখ, এ কোন কথা? তোমরা তার ন্যায্য প্রাপ্য তাকে হাতে করিয়া দাওনা, তাই সে আপনার পাওনা অবসর পাইলেই আপনি বুঝিয়া লয়। কিন্তু বুলি কোথায়? চারু ও ঝি বুলিকে তাড়া করিয়া, ঘরের বাহিরে আসিয়া কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া একেবারে বোকা বনিয়া গেল। চারুর সকল আস্ফালন থামিয়া গেল, বেড়ালটা তাহাকে এমন করিয়া ঠকাইল বলিয়া সে ভারি লজ্জা পাইল।

বেড়ালটা কোথায় গেল।

পাঠক পাঠিকা তোমরা কি বুলি বেড়ালকে খুঁজিয়া দিয়া চারুর এই লজ্জা দূর করিবে? বুলি ঐখানেই আছে, (ছবিতে দেখ) খুঁজিলেই পাইবে। দেখিব কে আগে বুলি বেড়ালকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পার।

বালকের রচনা।

অ সতের সহ কাল করোনা যাপন,
আ লস্য অশেষ দোষ দুঃখের কারণ;
ই ন্দ্রিয়কে রাখিও সদা বিবেকের দাস,
ঈ শ্বরের প্রতি রেখো সুদৃঢ় বিশ্বাস;
উ চিত কার্য্যেতে কভু করিওনা হেলা,
ঊ ষার সৌন্দর্য্য দেখো প্রভাতের বেলা;
ঋ ণ দাতা, ঋণী জন কেহ সুখী নহে,
ৠ কার, শিবের নাম, সর্ব্বলোকে কহে;
ঌ কার পৃথিবী মাঝে যে বা শ্রমী হয়,
ৡ কার, কমলা দেবী তার গৃহে রয়;
এ কতায় মিলে মিশে থেকো সর্ব্বক্ষণ,
ঐ শ্বর্য্য-মদেতে মত্ত হয়ো না কখন;
ও ষ্ঠাধরে স্বাধীনতা করোনাকো দান,
ঔ দাস্যেতে কার্য্য নাহি হয় সমাধান।

শ্রীতুলসীন্দ্র নাথ মিত্র, হেয়ার স্কুল।

দ্বাদশ বর্ষ | শ্রাবণ ১৩০২ | ৪র্থ সংখ্যা

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান,"
হঠাৎ কেন মনে এল কোন্ দিনের এ গান?
প্রাণের মাঝে লুকিয়ে কোথা ঘুমিয়ে ছিল তান,
বৃষ্টি পড়ে' টাপুর টুপুর মাতিয়ে দিল প্রাণ।
একলা আছি ঘরে বসে কাজের বোঝা নিয়ে,
চড় চড়িয়ে শীল বৃষ্টি যাচ্ছে উঠান ব'য়ে;
হায় কেনরে পড়লো মনে কোন্ দিনের সে খেলা,
শীল কুড়াতে আস্‌বেনা ত আর সে 'ছেলেবেলা'।
মুষলধারে ঢেলে জল বৃষ্টি থেমে গেল,
পথের মাঝে নূতন গঙ্গা যেন ভেসে এল।
গ্রামের বালক বেরিয়ে এল ক'রে কোলাহল,
কাগজ গড়া নৌকা জলে করে টলমল।
খেলায় তারা সাধের খেলা খোলা, ভোলা মনে,
আমার প্রাণে প'ড়ল ডাক মিলতে তাদের সনে;
ঢেউ খেলিয়ে রঙ্গে কত বেড়ায় শিশুর পাল,
স্বপ্নে যেন ছুটে এল আমার বালক কাল।
"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর পথে এল বান,"
রইল কৈ সে খর স্রোতে আমার অলস প্রাণ?
আমার নাই সে খেলার জুটি, সোণার 'ছেলেবেলা,'
খেলরে তোরা দেখি সুখে তোদের প্রাণের খেলা।
খেলরে তোরা, তোদের সনে খেলুক আমার মন,
এ খেলার সাধ নাহি যেন ফুরায় আজীবন;
টাপুর টুপুর বৃষ্টি এলে, যেন তোদের সনে—
ছেলে বেলার খেলা ধূলা জেগে ওঠে প্রাণে।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র মিত্র বি, এল।

ঈগল্ পাখী।

ঈগল্ পাখী চিল ও বাজপাখীর জাত। এই জাতীয় পাখীরা ছোট ছোট জীবজন্তু মারিয়া খায় বলিয়া, ইহাদিগকে শিকারী পাখী বলে।

ইউরোপ, এসিয়া ও আমেরিকার পাহাড়ে' জায়গায়, ঈগল্পাখীর বাস। ঈগল্ পাখী

নানাপ্রকারের হয়। তাহার মধ্যে গোল্ডেন্ ঈগল্ সকলের অপেক্ষা বড়। ইহাদের শরীরের রং গাঢ় ধূসর বর্ণ, মাথা, গলা ও বুকের রং সোণালী লাল। মাথা ও গলার পালকগুলি রৌদ্রে ঝলমল্ করিতে থাকে বলিয়া ইহাদিগকে ইংরাজিতে গোল্ডেন্ (সোণালী) ঈগল্ বলে। ইহারা দুই হাত লম্বা হয়। ইহাদের ডানা দুই খানি ছড়াইলে ছয় হাত বিস্তৃত হয়। হিমালয় পর্ব্বতের সোণালী ঈগল পাখী গুলি বড় ও দেখিতে সুন্দর। ঈগলপাখী খুব উঁচু পাহাড়ের উপর ছোট ছোট ডাল পালা দিয়া আপন বাসা তৈয়ার করে। যেখানে একবার বাসা নির্ম্মাণ করে, সেখান হইতে শীঘ্র অন্যত্র চলিয়া যায় না, অনেক বৎসর ধরিয়া একই স্থানে বাস করে। ইহারা আকাশে বহু উচ্চে উঠিয়া থাকে। এত দূরে উঠে যে, ভূতল হইতে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরে উঠিবার সময়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে থাকে এবং এক এক পাকে অনেকটা উপরে উঠিয়া যায়। উড়িবার সময়ে ইহারা স্থির ভাবে উড়ে। প্রথমে দুই চার বার ডানা নাড়িয়া লয়, তার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ডানা না নাড়িয়া উড়িতে পারে। তোমরা চিল উড়িতে দেখিয়াছ। চিল যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতে থাকে, এবং উড়িবার সময়ে ডানা নাড়ে না, ঈগল্ পাখীও সেই রূপ করিয়া উড়ে। ইহারা এত বেগে উড়িয়া যাইতে পারে যে, ঘণ্টায় ২৫ ক্রোশ

অতিক্রম করিতে পারে। ইহাদের দৃষ্টি শক্তি খুব তীক্ষ্ণ। আকাশের বহু উচ্চ স্থান হইতেও নীচে কোথায় ইহাদের খাইবার উপযুক্ত কোন্ প্রাণী আছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পায়। এক বার দেখিতে পাইলে সোঁ করিয়া বিদ্যুৎবেগে আসিয়া ছোঁ মারিয়া, তাহাকে নখে করিয়া

লইয়া চলিয়া যায়। অন্যান্য পাখী, ইঁদুর খরগোস, ভেড়া ও ছাগলের ছানা ইহাদের খাদ্য। শিকার পায়ের দ্বারা ধরিয়া আনন্দে শব্দ করিতে করিতে আপন বাসায় উড়িয়া চলিয়া যায়। সেখানে গিয়া ধারাল বাঁকা ও শক্ত ঠোঁট দিয়া তাহা ছিঁড়িয়া আপন ছানাগুলিকে খাবার ভাগ করিয়া দেয় এবং নিজেখায়। ইহাদিগকে কখন কখন বড় বড় ভেড়া ও ছাগল এবং বাছুর ও হরিণ পর্য্যন্ত মারিয়া খাইতে দেখা গিয়াছে।

সুযোগ পাইলে ইহারা ছোট ছোট ছেলে পর্য্যন্ত ধরিয়া লইয়া যায়! একবার স্কটলণ্ড দেশে কোন স্ত্রীলোক আপনার ছেলেটিকে মাটীতে শোয়াইয়া নিকটে ঘাস কাটিতেছিল। একটা ঈগল্পাখী কোথা হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া, বেগে আসিয়া চক্ষের পলকে তাহাকে নখে করিয়া লইয়া উড়িয়া গেল। মাতা চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। চারিদিকে সকলে হৈ চৈ করিতে লাগিল। একজন লোক সেই ঈগলের পিছনে ছুটিল। সেই স্ত্রীলোকটি ছেলের জন্য পাগলের মত হইয়া, এক খানি কাস্তে হাতে পর্ব্বতপানে ঈগলের বাসার দিকে ছুটিল। পাহাড়টা খুব খাড়া ও উঁচু, তাহার উপর উঠা বড় কঠিন। স্ত্রীলোকটি উঠিতে গিয়া কতবার পড়িয়া গেল, কত আঘাত পাইল, তাহার শরীর স্থানে স্থানে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল তথাপি আপন জীবনের মায়া না করিয়া অতি কষ্টে পাহাড়ের উপর গিয়া উঠিল। সেখানে দেখিল ঈগলের বাসায় তাহার শিশুটি পড়িয়া রহিয়াছে। মাঠে যেরূপ ভাবে তাহার শরীর কাপড়ে ঢাকা ছিল, তখনও সেইরূপই রহিয়াছে, এবং তাহার শরীরে কোন আঘাৎ বা আঁচড় লাগে নাই। ঈগল্ পাখী সেই স্ত্রীলোকটির চারিদিকে ঘুরিয়া তাহাকে ডানা দ্বারা আঘাত করিতে ও নখরেরদ্বারা আঁচড়াইতে চেষ্টা করিল। স্ত্রীলোকটিও হাতের কাস্তের দ্বারা ঈগল্কে তাড়াইতে লাগিল। অবশেষে ছেলেটিকে কাপড় দিয়া বুকের সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়া, পাহাড় হইতে নামিতে আরম্ভ করিল। সে অর্দ্ধেক পথ আসিয়া বন্ধুদিগকে দেখিতে পাইল। সকলে মাতার বীরত্বের প্রশংসা করিল এবং ছেলেটির শরীরে কোন আঘাত লাগে নাই দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ফিরিয়া গেল।

হার্পি ঈগল।

আমেরিকায় হার্পি ঈগল্ নামে একপ্রকার খুব বড় শিকারী পাখী আছে। ইহারা গোরু ও মেষপালকের বড়ই ক্ষতি করে। গোরু ও ভেড়ার পালের ভিতর হইতে বাছুর ও ভেড়া ধরিয়া লইয়া যায়। ইহারা বড় বড় হরিণ মারিয়াও খায়। হরিণ ধরিতে হইলে হরিণের মাথার কাছে আসিয়া ডানা দিয়া চোখে মুখে আঘাত করে, নখ দিয়া চোখ আঁচড়াইয়া অন্ধ করিয়া দেয়। হরিণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া এদিক্ ওদিক্ করিতে থাকে, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া হার্পি ঈগলের হাতে প্রাণ হারায়।

খরগোস ধরিবার সময়ে ঈগল্ পাখী একটু চালাকী করে। খরগোস প্রায়ই ঝোপের মাঝে লুকাইয়া থাকে। সেখান হইতে সহজে ধরা যায় না। তাই দুইটা ঈগল এক জোটে খরগোস ধরিতে যায়। একটা ঝোপ হইতে একটু দূরে আড়ালে বসিয়া থাকে। আর একটা ঝোপের নিকট গিয়া শব্দ করে ও উড়িয়া গিয়া সেই ঝোপে ডানার আঘাত করিতে থাকে। খরগোস ভয় পাইয়া যেমন সেখান হইতে বাহির হইয়া অন্যদিকে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করে, অমনি সেই ঈগলটা তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

একবার এক ঈগল্ শিকারের হাতে খুব জব্দ হইয়াছিল। ঈগল একটা বিড়াল ধরিয়া লইয়া যায়। বিড়ালটা আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ঈগল্‌কে অস্থির করিয়া তোলে। ঈগল্ দেখিল বিড়াল ধরিয়া সে মহা বিপদে পড়িয়াছে। এখন তাহাকে ছাড়িতে পারিলে বাঁচে। বিড়ালকে ফেলিয়া দিতে সে কত চেষ্টা করিল; বিড়াল কিন্তু ঈগল্‌কে নখ দিয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল, কোনমতেই ছাড়িল না। সে বুঝিয়াছিল, ঈগল্‌কে ছাড়িলেই, অত উপর হইতে নীচে পড়িয়া সে চূর্ণ হইয়া যাইবে। ঈগল্ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অবশেষে মাটীতে আসিয়া পড়িল। তখন বিড়াল তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া পলাইল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ বসু।

বিভার পরামর্শ।

"সর্ব্বনাশ হয়েছে। সত্যি সত্যিই পাপগুলো এসেছে। হায় হায়! কেন লোকগুলিকে এত শীগ্‌গির ছাড়িয়ে দিলাম। এত কাল এত কষ্ট ক'রে,—গায়ের রক্ত জল ক'রে, যা কিছু পুঁজি করেছিলাম, দুষ্‌মনেরা সব লুটে নিলে। হায় হায়! পথের ফকীর কল্লে গো—পথের ফকীর কল্লে।"

"ওগো, তোমার ধন দৌলত সব যাক্, তোমার টাকার মুখে আগুন লাগুক। এখন বাছাদের রক্ষার উপায় কি! বিভা আমার বয়স্থা মেয়ে, পরের ঘরের বউ, তার ইজ্জৎ রক্ষার উপায় কি? হা ভগবান্, শেষকালে একি কর্‌লে!"

সখা ও সাথীর পাঠক পাঠিকা, বিশ্বনাথ ডাকাতের কথা তোমরা ইহার পূর্ব্বে এই কাগজে পড়িয়াছ। বিশ্বনাথ একজন প্রধান ডাকাতের সর্দ্দার ছিল। এক সময় তাহার নামে সমস্ত দেশ কাঁপিত। তাহার অধীনে ছোট বড় অনেক দল ছিল। তাহাদের উৎপাতে কেহ সুখে নিদ্রা যাইতে পারিত না। অনেক সময়ে চিঠিপত্রে পূর্ব্বে খবর পাঠাইয়া ইহারা ডাকাতি করিত। বিশ্বনাথের ছোট খাট দলে প্রায়

সমস্ত দেশ ছাইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল দল সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়। আজ তোমাদিগকে তাহারই একটি গল্প বলিব। ইহাতে একজন রমণীর বুদ্ধি ও সৎসাহসের কথা শুনিয়া তোমরা অবাক হইবে।

বর্দ্ধমানের নিকটে একটি ভদ্র পল্লীতে গৌরমোহন চৌধুরীর বাড়ী। পিতার কাল হইলে গৌরমোহন কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি পান, এবং ঐ সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিয়া ধীরে ধীরে তিনি দেশের দশজনের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়ান। এক মাত্র কন্যা বিভাময়ী—তাহাকেও তিনি বেশ ভাল ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিভা বিবাহের পরেও অনেক সময়ে বাপের বাড়ী ক্রমান্বয়ে তিন চারি মাস আসিয়া থাকিতেন। বলা বাহুল্য যে, এক মাত্র সন্তান বলিয়া বৈবাহিকদের সঙ্গে গৌরমোহন বাবুর ইহা একটি বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল, এবং তাঁহারাও গৌরমোহন বাবুর আর সন্তানাদি ছিল না বলিয়া তাঁহাকে এবিষয়ে সর্ব্বদা প্রসন্ন রাখিতেন। বিভার সবে একটি পুত্র জন্মিয়াছে—তাহার বয়স তিন বৎসর। গৌরমোহন চৌধুরী স্বভাবতঃ অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন; কিন্তু দৌহিত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে তাঁহার হাত কতকটা খোলা ছিল। আদরের নাতির কল্যাণে মাসে মাসে তাঁহার কিছু অর্থব্যয় হইত; তাহা না হইলে লোহার সিন্ধুকের চাবিতে তাঁহার বড় একটা হাত পড়িত না। তাঁহার কৃপণতা ও সিন্ধুকপূর্ণ টাকার কথা দেশে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র ছিল; কাজেই, বিশ্বনাথের দলবলের কাছে উহা গোপন থাকার কথা নহে। হঠাৎ একদিন ঐ দিকের একটি ছোট দলের সর্দ্দার গৌরমোহন বাবুকে খবর পাঠায় যে, শীঘ্রই তাহারা তাঁহার বাড়ীতে পড়িবে; এবং সেই কথামত আজ তাহারা আসিয়া রাত্রি ১১ টার সময় গৌরমোহনের সদর দরজায় ঘা মারিয়াছে। এই গল্পের প্রথমে আক্ষেপের উক্তিগুলি গৌরমোহন ও তাঁহার স্ত্রীর। ডাকাতের সর্দ্দার "দরজা খোল" বলিয়া তিন চারিবার দরজায় খুব জোরে আঘাত করাতেই, স্বামী স্ত্রী বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সত্য সত্যই পাপিষ্ঠেরা আসিয়াছে। সর্দ্দারের চিঠি পাইয়া পাঁচ সাত দিন পর্য্যন্ত গৌরমোহন বাড়ীতে লোক জন মোতায়েন রাখিয়া খুব হুসিয়ারিতে ছিলেন; কিন্তু পরে যখন দেখিলেন যে, ডাকাতের নামগন্ধ নাই, তখন সর্দ্দারের সেই চিঠি কোন শত্রুর কার্য্য মনে করিয়া লোকজন সব ছাড়াইয়া দিলেন। প্রতিদিন তাহাদের পাছে যে এতগুলি টাকা খরচ হইতেছে, তাহা কৃপণ গৌরমোহনের প্রাণে সহিল না। তাঁহার স্ত্রী কিন্তু তাঁহাকে বারম্বার বলিয়াছিলেন যে, এতশীঘ্র লোকজনগুলি ছাড়াইয়া দিয়া তিনি ভাল করিতেছেন না। আজ গৌরমোহন তাঁহার সেই টাকার পুঁজি সবই হারাইতে বসিয়াছেন, এবং নিজের কৃপণতাকে মনে মনে শত ধিক্কার দিয়া মাথা কপাল চাপড়াইতেছেন।

বিভাময়ী ছেলেটিকে কোলের মধ্যে নিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ বাহিরের গোলযোগে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বুড়া মা বাপকে ঐরূপ আক্ষেপ করিতে শুনিয়া পলকের মধ্যে সমস্ত ব্যাপার তিনি বুঝিতে পারিলেন। তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া শশব্যস্তে আসিয়া পিতাকে বলিলেন,—"বাবা, এখানে দাঁড়িয়ে অমন আক্ষেপ করে' এখন কোন ফল নাই। শীগ্‌গির খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। দেখুন, গ্রামের মধ্যে কোন সাহায্য পান কিনা। দেরী করলে সে সুযোগও হারাবেন।" মাতাকে বলিলেন,—"মা, ওরূপ অস্থির হ'য়ো না; সাহস কর, পরমেশ্বরকে ডাক; বিপদে অধীর হ'য়ে ফল নাই।"

গৌরমোহন বাবু বলিলেন—"সে কি মা, এ বিপদে তোমাদের একলা রেখে কোথায় যাব? আর কেইবা আমার জন্য এই

দুরাচারদের হাতে প্রাণ দিতে আস্‌বে!" এ দিকে ডাকাতদের পাঁচ সাত জনে একত্র দরজার উপর লাথি মারাতে সমস্ত বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। দরজা আর টেকে না। তখন বিভা অত্যন্ত উদ্বিগ্না হইয়া, পাছে বাহিরে ডাকাতেরা শোনে এই ভয়ে, পিতার কাণে কাণে কি বলিলেন এবং মাতার কাণেও সেই কথা বলিয়া তাঁহাকে মনে সাহস বাঁধিতে বলিলেন। তাঁহার উত্তরে গৌরমোহন বাবু বলিলেন—"মা, তুমি ছেলে মানুষ। কি বিপদে পড়েছ বুঝ্‌তে পারছ না। এ বিপদে তোমাদের কার কাছে রেখে বাড়ীর বা'র হ'ব?"

বিভা বলিলেন,—"বাবা, আমি ছেলে মানুষ হ'লেও বিপদের সবই বুঝ্‌তে পাচ্ছি; কিন্তু আপনি এখানে থাক্‌লে কি আমাদের রক্ষার সম্ভাবনা আছে? আপনি একলা কত লোকের সঙ্গে লড়্‌বেন? দুষমনেরা এসেই ত আমাদের হাত পা বেন্ধে ফেল্‌বে। এখনও আমার কথা শুনুন, খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। বিভার মাতাও বলিলেন—"ও গো, বিভার কথাই শোন। ভগবান রাখ্‌লে রক্ষে পাব, তা না হ'লে তোমার একলার কি সাধ্য যে, আমাদের সব রক্ষে কর'বে?"

গৌর মোহন তখন আর দেরী না করিয়া ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। এদিকে ডাকাতেরাও তখন সদর দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাদের দলবল ও বিকট চেহারা দেখিয়া বিভার মাতা মূর্চ্ছা গেলেন। তাহা দেখিয়া ডাকাতের সর্দ্দার বলিয়া উঠিল,—"ঐ গো, বুড়ীটা মূর্চ্ছা গেল। বুড়ো গেল কোথায়? কোন ঘরেই ত দেখ্‌ছি না।" বিভা জানিতেন যে, ঈশ্বর সহায় থাকিলে সেই পাষণ্ডদের সাধ্য নাই যে, তাঁহার মাথার একটি কেশও স্পর্শ করে, কিন্তু বৃদ্ধা মাতাকে মূর্চ্ছা যাইতে দেখিয়া একটু ভীতা হইলেন। ডাকাতের সর্দ্দার তখন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"ওগো ঠাকরুণ, তোমার মা ত মূর্চ্ছা গেলেন; তোমার বাপ কোথায়, আর লোহার সিন্ধুকের চাবিই বা কোথায়? সব যদি আমাদের দেখিয়ে দেও, কাউকে কিছু বলব না; আর তা না হ'লে বুঝ্‌তেই পার!" উত্তরে বিভাময়ী বলিলেন—"ও পাড়ায় যে বারোয়ারী হচ্ছে, বাবা বোধ হয় সেখানে গেছেন। সিন্ধুকের চাবি তাঁর কাছে থাকে। আমি চাবির সন্ধান কিছুই জানি না। দোহাই তোমাদের মা বাপের—তোমাদের ছেলেপিলের, আমাদের কিছু ব'লো না। আমাদের যা আছে সব নিয়ে যাও।" সর্দ্দার বলিল,—"তাত হবে; কিন্তু লোহার সিন্ধুকের চাবি না হ'লে যে আসল মাল বেরুচ্ছেনা। চাবি কোথায় দেও। বুড়ো সিন্ধুকের চাবি কিছু আর সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় না। চাবি কোথায় থাকে নিশ্চয় তুমি জান।"

বিভা তখন মহা বিপদে পড়িলেন। বাস্তবিক তিনি সিন্ধুকের চাবির সন্ধান জানিতেন না। গৌরমোহন বাবু উহা বিশেষ কোন স্থানে সর্ব্বদা লুকাইয়া রাখিতেন। ডাকাতের সর্দ্দারের অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি চাবি দেখাইয়া দিতে পারিলেন না। তখন সর্দ্দার একটা চুলা জ্বালিয়া বড় একটা কড়াতে এক কড়া তেল চড়াইয়া দিল, এবং একটা লোহার শিক সেই চুলার আগুনে দিল। তাহার পর দলের লোকদিগকে ঘরের অন্য সমস্ত জিনিস পত্র সংগ্রহ করিতে বলিয়া, বিভার দিকে তাহার আরক্ত চক্ষু দুইটি ঘুরাইয়া অতি বিকটস্বরে বলিল,—"ঠাকুরুণ, বুঝ্‌তে পাচ্ছ ব্যাপারখানা কি? ঐ পোড়ান ডগ্‌ডগে শিক্ দিয়ে তোমার সমস্ত শরীরে ছেঁকা দেব, আর ঐ কড়ার তেলে তোমার ননীর ছেলেকে ভাজ্‌ব। ভাল চাও ত এখনও চাবি বার ক'রে দেও।" সে কথা শুনিয়া বিভার

প্রাণ শুকাইয়া গেল। সেই দুরাচার পাষণ্ডদের অসাধ্য কিছুই নাই। সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া বিভাময়ী বিপদ কালের বন্ধু পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন।

হঠাৎ বাহিরে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। চারিদিক হইতে বাড়ীর মধ্যে ইট্ পাঁট্‌কেল পড়িতে লাগিল; এবং দেখিতে দেখিতে অসংখ্য লোক আসিয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিল। ডাকাতেরা তখন বুঝিতে পারিল যে, গ্রামের সব লোক জুটিয়া আজ তাহাদের ঘেরাও করিয়াছে,—ব্যাপার বড় সহজ নহে। কাজেই, তাহারা সংগৃহীত জিনিস গুলি পর্য্যন্ত ফেলিয়া, প্রাণ লইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। বিভাময়ী বুঝিলেন যে, ঈশ্বর মুখতুলিয়া চাহিয়াছেন। ডাকাতদের পলাইতে দেখিয়া তিনি দেহে বল পাইলেন। তখন বৃদ্ধা মাতার চখে মুখে জল দিয়া একটু খানি পাখার বাতাস করিতেই তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল।

পলাইবার সময় ডাকাতদের সঙ্গে এবং সেই গ্রামের লোকের সঙ্গে ছোট খাট একটি লড়াইয়ের মত হইল। দুইপক্ষেরই চারি পাঁচটি খুন জখম হইল। পাঁচ ছয় জন ডাকাত ধরাও পড়িল; আর সব কোন মতে প্রাণ লইয়া পলাইল। যাহারা ধরা পড়িল, যথা সময়ে তাহাদের বিচার হইয়া প্রত্যেকের ৬ বৎসর করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ হইয়া গেল।

বিভাময়ী যে ডাকাতের সর্দ্দারকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা গ্রামের অপর পাড়ায় বারোয়ারীর কাছে গিয়াছেন, সে কথা মিথ্যা নহে। বাস্তবিকই সেদিন গ্রামের অপর পাড়ায় বারোয়ারীতে যাত্রা হইতেছিল। বিভা তাঁহার পিতাকে খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া গিয়া, সেই যাত্রার কাছের লোকদের নিকট সাহায্য চাহিতে কাণে কাণে পরামর্শ দেন, এবং সেই পরামর্শ গ্রহণেই আজ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব রক্ষা পাইল। গ্রাম্য লোক সেই ডাকাতদের ধরিয়া নিয়া চলিয়া গেলে, গৌরমোহন বাবু আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং সস্নেহে বিভার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন—"মা, আজ তোমার বুদ্ধি ও সৎসাহসেই আমার যথা সর্ব্বস্ব রক্ষা পেয়েছে। তোমার পরামর্শ না শুন্‌লে আজ এখন আমার কি দশা হ'তো!" উত্তরে বিভা অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—"বাবা, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিন।" শ্রী অন্নদা চরণ সেন, বি, এ।

উড়িষ্যায় জগন্নাথ দেব।

চারু—দাদা মহাশয়, এই দেখ কেমন ছবি কিনে এনেছি। রথের বাজারে গিয়ে দেখ্‌লাম এই ছবি বিক্রী হচ্চে। এ কিসের ছবি দাদা মহাশয়?—

দাদা মহাশয়—ও জগন্নাথের ছবি। উড়েদের দেশে পুরী নামে একটা সহর আছে জান? সেখানে এই দেবতার একটা খুব বড় মন্দির আছে। রথ যাত্রাতে সেখানেই সব চেয়ে বেশী ধুমধাম হয়। তা দেবতার মূর্ত্তিটি তত সুন্দর না হলেও, ইহাঁর মন্দিরটি বড়ই সুন্দর। তার ছবি আমার কাছে আছে, দেখবে? এই দেখ তার ছবি।

জগন্নাথের ছবিটি তোমার পছন্দ হয় নাই, কিন্তু তাঁহারই অধিষ্ঠানের জন্য এত বড় জাঁকাল বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। আবার এ

মুর্ত্তি দেখিবার জন্য প্রতি বৎসর একলক্ষেরও উপর লোক পুরীতে যাইয়া থাকে। তার পর এই মূর্ত্তির পূজার জন্য বার্ষিক বারলক্ষ টাকারও উপর আয় হয় এবং বিশ হাজারেরও অধিক লোক প্রতি দিন খাটিয়া থাকে। তার মধ্যে খড়দহের মহারাজা সর্ব্ব প্রধান—তিনি এই দেবতার মেথর। এই মূর্ত্তির প্রতাপ্ কেমন এখন বুঝিলে ত?

চারু—তাত বুঝ্‌লাম। কিন্তু ছবিটি এমনতর কেন? এ যেন মিস্ত্রী জোটে নাই!

দাদামশায়—তাইত বটে। গল্পে যেরূপ আছে তাতে মিস্ত্রীর অভাবেই মূর্ত্তিটি অমনতর গড়া হয়েছে। গল্পটি মনগড়া হলেও তাতে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়।

চারু—গল্পটা বলনা দাদা মহাশয়।

দাদা মহাশয়—গল্পটা খুব বড়। এখন সব বল্‌বার অবসর নাই, তবে সংক্ষেপে একটু বলি।

লোকে বলে যে সত্য যুগে, অর্থাৎ অনেক দিন আগে বিষ্ণু ঠাকুর বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আপনাকে লুকাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহাকে অনেক খোঁজা হয়। অবশেষে মালব দেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এইজন্য চারিদিকে চারিজন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন। তিন দিকে যাহারা গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিল; কিন্তু পূর্ব্ব দিকের লোক আর ফিরেনা। এই ব্রাহ্মণটি চলিতে চলিতে বনের ভিতর একজন উড়ে গৃহস্থের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হয়। উড়ে জাতিতে অতি নীচ হইলেও খুব বিষ্ণুভক্ত ছিল। তার নাম ছিল বাসু। বাসুর ঘরে ব্রাহ্মণ যাইয়া উপস্থিত হইলে, সে তাঁহাকে খুব আদর অভ্যর্থনা করিল; এবং তাহার কন্যাকে সেই ব্রাহ্মণ বিবাহ করিলেন। অনেক দিন যায়, অবশেষে বাসু তাহার মেয়ের অনুরোধে ব্রাহ্মণ জামাইকে আপনার দেবতা দেখাইতে সম্মত হইল। বাসু রোজ ভোরে উঠিয়া গভীর জঙ্গলে চলিয়া যাইত এবং অক্ষয় বটের নীচে আপনার নীলমাধবকে (নীল রঙ্গের একটি শালগ্রাম শিলা) পূজা করিয়া বিকালবেলা বাড়ী ফিরিত।

জামাইকে দেবতা দেখাইতে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে বাসু তাঁহার চক্ষু বাঁধিল। অভিপ্রায় যে, তাহা হইলে সে পথ চিনিতে পারিবে না। জামাইও খুব সেয়ানা, সে হাতে করিয়া একটি ছোট সরিষার পুঁটলী লইল। যেমন পথ চলে, তেমনি সরিষা ছড়ায়। এই রূপে উভয়ে সেই বট গাছের নীচে যাইয়া উপস্থিত হইল। বাসু জামাইকে গাছ তলায় রাখিয়া ঠাকুরের ভোগ সংগ্রহের জন্য গভীর বনের মধ্যে গেল। একটি কাক সেই বট গাছের একটি ডালে বসিয়া ছিল। হঠাৎ কাকটা সেই ডাল ভাঙ্গিয়া দেবতার সম্মুখে পড়িয়া গেল। যেমন পড়া তেমনি মরা; কিন্তু কাকটা তখনই দিব্য কান্তি পাইল এবং উড়িয়া স্বর্গে চলিল। ব্রাহ্মণ কাকের এইরূপ সদ্‌গতি দেখিয়া, নিজেও গাছে উঠিয়া ঠাকুরের সম্মুখে পড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করিল। সে গাছে উঠিয়া পড়িতে যাইবে, এমন সময় দৈববাণী হইল—. "ব্রাহ্মণ থাম, আগে তোমার রাজাকে যাইয়া বল যে, আমি বিষ্ণু; আমার ভক্ত বাসুর কাছে এই জঙ্গলে আছি, তারপর যে রূপ হয় করিও।"

দৈববাণী শুনিয়া ব্রাহ্মণের চমক ভাঙ্গিল। সেই সময়ে বাসু দেব পূজার জন্য ফল ফুল

লইয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু সে আর দেবতা খুঁজিয়া পায় না। হঠাৎ দৈববাণী হইল,-"হে আমার প্রিয় ভক্ত, বনের ফুল ফলে আর আমার তৃপ্তি হয় না। এখন আমার মিঠাই ও ভাত খাইতে সাধ জন্মিয়াছে। সুতরাং, তুমি আর আমাকে তোমার নীলমাধব রূপে দেখিতে পাইবেনা। এখন হইতে আমি জগন্নাথ রূপে এই স্থানে বিরাজ করিব।" বাসু ক্ষুন্নমনে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ এদিকে দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। অনেক কষ্টে তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি মালব রাজের নিকট ফিরিয়া গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। মালব রাজা অমনি সসৈন্যে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে পূর্ব্বে যেখানে বাসুর নীলমাধব অর্চ্চিত হইতেন, সেই অক্ষয় বটের কাছে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। মন্দির প্রস্তুত হইলে পর, সমুদ্রতীরে নিক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড এক খণ্ড কাঠ লইয়া দেবতার মূর্ত্তি গড়িবার কথা হইল। একজন ভাল বুড়া মিস্ত্রী আসিয়া বলিল যে, সে একুশ দিনে মূর্ত্তি গড়িয়া দিবে, কিন্তু ইহার মধ্যে কেহ তাহার কাজ দেখিতে পাইবে না। যদি কেহ দেখে, তবে সে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিবে।

রাজা এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলে, বুড়া মিস্ত্রী কাঠ খানি কাটিয়া তিন খণ্ড করিল এবং তাহা লইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রস্তুত মন্দিরে প্রবেশ করিল। রাজা মন্দিরের কপাট বন্ধ করিলেন। মিস্ত্রী তাহার কাজ করিতে লাগিল। একদিন যায়, দুদিন যায়, এইরূপে সাত দিন চলিয়া গেল। এদিকে রাণীর আর দেরী সহে না। তিনি অনেক বলিয়া কহিয়া রাজাকে মন্দিরের দ্বার খুলিতে সম্মত করাইলেন। যেমন মন্দিরের দ্বার খোলা হইল, অমনি সেই মিস্ত্রী সে স্থান পরিত্যাগ করিল। রাজা দেখিলেন, মূর্ত্তি তিনটির কেবল উপরের অর্দ্ধেক গড়ান হইয়াছে। জগন্নাথ ও তাঁহার ভাই বলভদ্রের হাত বসাইবার আয়োজন হইতেছিল। সুভদ্রার হাত তখনও গড়া হয় নাই। অগত্যা রাজাকে বাধ্য হইয়া ঐ মূর্ত্তিতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। তাই এই মূর্ত্তি এমনতর দেখিতেছ।

চারু—তা রাজা অপর মিস্ত্রী দিয়ে মূর্ত্তি ভাল ক'রে গ'ড়ে নিলেন না কেন?

দাদা মহাশয়—আরে দুর পাগল! রাজা যে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। তার পর, এই গল্পকে সুধু গল্প বলিয়া মনে করিও না। ইহাতে একটু শিখিবার বিষয় আছে। আগে উড়িষ্যা দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। প্রায় ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বে একজন হিন্দু রাজা শেষ বৌদ্ধ রাজাকে পরাজয় করেন, ও বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে সে দেশে শিব পূজার প্রতিষ্ঠা করেন। সে হিন্দু রাজার নাম কি জান? ইন্দ্রদ্যুম্ন। তাহার সাত শত বৎসর পরে, আবার আর একজন হিন্দু-রাজা, শিব পূজার পরিবর্ত্তে উড়িষ্যাতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁরও নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন। সুতরাং উপরের গল্পের অর্থ এই বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক একজন আর্য্যরাজা উড়িষ্যা দেশে যাইয়া বৌদ্ধ দিগকে সেখান হইতে তাড়াইয়া, সেখানে আবার হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত করেন। এবং তারপর বৈষ্ণব ধর্ম্মও সেখানে এইরূপে হিন্দুদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়।

চারু—বৌদ্ধ কারা ছিল দাদা মহাশয়?

দাদা মহাশয়—দুর্গোৎসবের সময় বলি হ'তে দেখেছ?

চারু—দেখেছি বই কি?

দাদা মহাশয়—এই বলি দেওয়ার প্রথা প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এদেশে বড়ই প্রচলিত ছিল। গোরু, ভেড়া, মহিষ, ঘোড়া, এমনকি মানুষ পর্য্যন্তও যজ্ঞকুণ্ডের নিকট বলি হইত; এবং তাহাদের মাংসে হোম করা হইত। ক্রমে এই বলির প্রথা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, অবশেষে এক

রাজার ছেলে এই প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। ইঁহার নাম ছিল গৌতম বুদ্ধ। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, জীবহত্যা করিলে ধর্ম্ম হয় না। ঈশ্বর চিন্তা কর, সৎ হও, দয়ালু হও, পরোপকার কর, তাহা হইলেই পুণ্যলাভ হইবে; অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। কতকগুলি প্রাণী বধ করিয়া আগুনে ফেলিলে তাতে কিছু লাভ হয়না। বুদ্ধদেবের এই কথা অনেক লোকেই মানিয়াছিল। যাহারা তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল, তাহাদিগকেই বৌদ্ধ বলে।

চারু—তা এই বৌদ্ধেরা উড়িষ্যা দেশে কেন গিয়েছিল?

দাদা মহাশয়—তাদের ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য। তা ছাড়া উড়িষ্যা দেশটা তখন বেশ নির্জ্জন ছিল। সেখানে তপস্যা ও নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরের পূজা করিবার বড়ই সুবিধা ছিল। সেজন্য অনেক বৌদ্ধ উড়িষ্যা দেশে গিয়া পড়িয়াছিল। উড়িষ্যা দেশের সে সময়কার রাজাও বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয় ছিলেন। আচ্ছা চারু, কটক কোথায় জান?

চারু—জানি বই কি?—Cuttuck, the largest town in Orissa on the Mahanadi. সেই কটকের কথাই জিজ্ঞাসা করছ না?

দাদা মহাশয়—হাঁ, সেই কটক সহর হইতে প্রায় ৯॥ মাইল দক্ষিণে, পুরীর রাস্তায়, দুইটি অতি সুন্দর পাহাড় আছে। একটির নাম উদয়গিরি। আর একটির নাম খণ্ডগিরি। এই দুইটি পাহাড় এই প্রাচীন বৌদ্ধদের বড় প্রিয় স্থান ছিল। অনেক ধার্ম্মিক বৌদ্ধ এখানে আসিয়া এই পাহাড়ের উপর গুহা প্রস্তুত করিয়া সে থানে তপস্যা করিতেন। আবার এই সকল ধার্ম্মিক লোকদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য, অনেক সময় ধনী বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ রাজাগণ এখানে আসিতেন। তাঁহারা অনেক সময় এই সাধু দিগের বাসের জন্য বিচিত্র গুহা প্রস্তুত করাইয়া দিতেন। কোন গুহা দেখিতে হস্তীর মত, কোনটি গণেশের মত, কোনটি আবার বাঘের মুখের মত। ব্যাঘ্র গুহার ছবি এই

অবশেষে
ছয় শত
সর হইল,
শরী বংশ
করিয়া

দেখ, কেমন সুন্দর। উপরে বাঘের দাঁতপাটী কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। দাঁত পাটির উপর আবার কেমন বাঘের নাক চোক ও কপাল। এই পাহাড়ে এইরূপ হস্তি গুহা আছে, সর্প গুহা আছে। এই সকল গুহা গুলি দু হাজার বছরেরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই গুহা গুলিকে উড়িষ্যাদেশে গুম্ফ বলে; যথা হস্তিগুম্ফ, সর্পগুম্ফ, ব্যাঘ্রগুম্ফ ইত্যাদি। এই উদয় গিরি এবং খণ্ড গিরি, দুটি পৃথক পর্ব্বত নয়, একই পর্ব্বত মাঝ খানে খানিকটা স্থান নীচু হইয়া যাওয়ায় দুটি পর্ব্বত বলিয়া মনে হয়। এই পর্ব্বতটি বেলে পাথরের পর্ব্বত; বাটনা বাঁটিবার যে 'শিল নোড়া' দেখিয়াছ, সে গুলি যে জাতীয় পাথর, ইহাও সেই জাতীয় পাথর। এই পাথর খুব নরম বলিয়া এই সকল গুহা গুলি খুদিবার সুবিধা হইয়াছিল, ও সেই জন্যই গুহার গায়ের সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য গুলি জল বাতাসে ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। ব্যাঘ্র গুহাটির বয়স ২১৯৫ বছর। পাহাড় দুটিকে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া একেবারে একটা বড় মৌচাকের মত করা হইয়াছে।

চারু—আচ্ছা দাদা মহাশয়, এই বৌদ্ধগণকে যে ইন্দ্রদ্যুম্ন তাড়িয়েছিলেন, তিনি ত শিবভক্ত

ছিলেন। তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল ?

দাদা মহাশয়—এই খণ্ডগিরিরই কাছে তাঁহার রাজধানী ছিল। জায়গার নাম ছিল ভুবনেশ্বর।

ভুবনেশ্বর বা একাম্রকানন।

এই ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরও দেখিতে অতি সুন্দর। তাহারও ছবি তোমাকে দেখাইতেছি। ঐ যে মাঝ খানে একটি জলাশয় দেখিতেছ, উহা ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ সরোবর। এই সরোবরের চারিপাশে আগে প্রায় সাত হাজার মন্দির ছিল। তখন স্থানটি যে কেমন সুন্দর ছিল, তাহা কল্পনায়ও আসে না। এখন যে সকল মন্দিরে পূজা অর্চ্চনা হইয়া থাকে, তার সংখ্যা পাঁচ ছয় শতের অধিক হইবেনা। ঐ যে বড় মন্দির

দেখিতেছ, উহা প্রায় ৪০ হাত উচ্চ। মন্দিরের গায়ে হিন্দুদের সকল প্রকারের কার্য্য কলাপ চিত্রিত রহিয়াছে। এমন সুন্দর চিত্র অন্যত্র দেখা যায় না। এই মন্দিরটি ১৫৫৫ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে।

এখন যাও, তুমি তোমার পড়া কর গিয়ে। ঢের • লাম। তাহার সার কথা এই মনে রাখিও।

১। আড়াই হাজার বৎসরের ও পূর্ব্বে এদেশে বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ সাধুরা উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে গুহা প্রস্তুত করিয়া সেখানে থাকিতে ভাল বাসিতেন। এই ব্যাঘ্র-গুম্ফ সেই সকল গুহার একটি নমুনা।

২। তার পর প্রায় ১৫ শত বৎসর হইল ইন্দ্রদ্যুম্ন এই বৌদ্ধদিগকে উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া দেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে দেশে তখন শিবপূজা প্রচলিত হয়। এই রাজ বংশের নাম ছিল কেশরী এবং তাঁহাদের রাজধানী ছিল ভুবনেশ্বর। ভুবনেশ্বরের শিব মন্দির ও প্রসিদ্ধ পবিত্র সরোবর ভারতের মধ্যে একটি অতি সুন্দর ও প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।

৩। অবশেষে প্রায় ছয় শত বৎসর হইল, কেশরী বংশ ধ্বংশ করিয়া উড়িষ্যাতে গঙ্গা-বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বংশেরও প্রতিষ্ঠাতার নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন। ইহাঁরা বৈষ্ণব ছিলেন। সুতরাং ইহাঁদের সময় বিষ্ণু পূজার প্রচার হয়। ঐ জগন্নাথের মন্দির ইহাঁদের নির্ম্মিত।

ভুবনেশ্বরের মন্দির।

৪। তার পর, প্রায় তিনশত বৎসর হইল কালাপাহাড় গঙ্গাবংশ উচ্ছেদ করিয়া, উড়িষ্যায় মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় এক-শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীগণ মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দেন। কিন্তু অচিরেই দেশ ইংরাজ রাজের অধীন হইয়া পড়িল। সেই অবধি উড়িষ্যা ইংরেজ রাজার অধীন।

শ্রীকালীশঙ্কর সুকুল, এম, এ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যে ফুলের সৌরভ আছে, কুঁড়িতেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়। যাহার কুঁড়িতে সৌরভ নাই, সে ফুল ফুটিলেও সৌরভ পাওয়া যায় না। মানুষেরও প্রতিভা থাকিলে, সে প্রতিভা ফুটিয়া উঠিবার আগেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়। যাঁহারা বড় লোক হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের জীবনেই আমরা এটি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।

আজ বাঙ্গলার এক জন প্রধান প্রতিভাবান লেখকের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তোমাদিগকে বলিব। যে প্রতিভাবলে তিনি আজ এত যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, বাল্যকালে সেই প্রতিভা কি রকম করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

১২৬৮ সনের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। লক্ষ্মীসরস্বতীর একত্র মিলন প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু কলিকাতার এই ঠাকুর পরিবারের মধ্যে আমরা এ উভয়ের মিলন দেখিতে পাই। ধন ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে বিদ্যার এ প্রকার মিলন অতি বিরল।
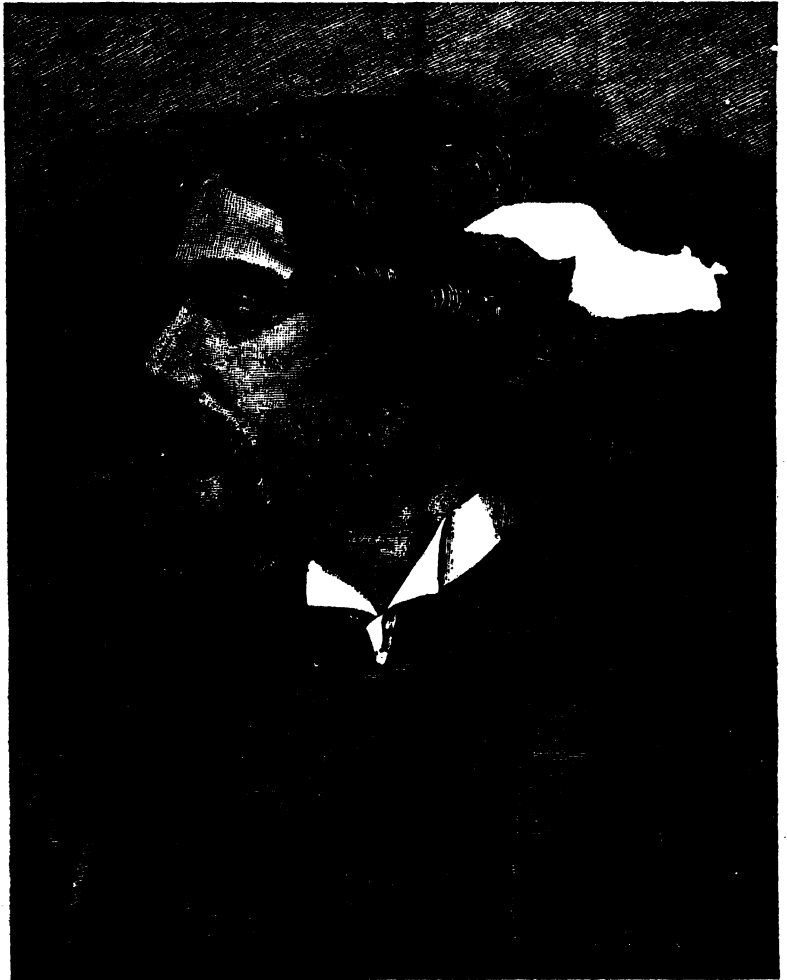
খুব অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি বাল্য কাল হইতেই রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন এবং তাহা পাইলে আর কিছু চাহিতেন না।

বাড়ীর একজন পুরাতন চাকর দরজার নিকট বসিয়া সুর করিয়া রামায়ণ পড়িত, রবীন্দ্রনাথ একাগ্র হইয়া তাহা শুনিতেন, এবং শুনিতে শুনিতে কখনো হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, কখনো অন্যায় অত্যাচারের কথা শুনিয়া রাগ সম্বরণ করিতে পারিতেন না, আবার কখনো দুঃখ কষ্টের বিবরণ শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন।

বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যেই বালক রবীন্দ্র নাথের ক্ষুদ্র পৃথিবীটি আবদ্ধ ছিল। বাড়ীর বাহির হইবার তাঁহার অধিকার ছিলনা; এবং সমবয়স্ক অন্যান্য বালকদের সহিতও খেলিতে পাইতেন না। দক্ষিণ খোলা একটি ঘরে বসিয়া, সম্মুখের পুষ্করিণী তীরের ঘনপল্লবময় বটগাছটির দিকে চাহিয়া থাকিতেন এবং বাল্য কল্পনায় সেই ছায়াময় বটমূলে কত পরীর আবাসস্থান দেখিতে পাইতেন। শ্বেতবর্ণ রাজহাঁস গুলি গলা বাঁকাইয়া পুষ্করিণীর কাল জলে আনন্দে স াঁতার দিয়া বেড়াইত, কখনো বা চঞ্চুদ্বারা আপনাদের পক্ষ পরিষ্কার করিত, মহা কুতূহলে বসিয়া বসিয়া তিনি তাহাই দেখিতেন।

গৃহের বাহিরে পৃথিবীর দৃশ্য কিরূপ, তাহা দেখিবার জন্য বালক রবীন্দ্রনাথের এক এক সময় একান্ত আকাঙ্ক্ষা হইত, একটু বাহিরে যাইবার স্বাধীনতা পাইবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কোন সমবয়স্ক বালক বালিকাকে বাহিরের উন্মুক্ত বায়ুতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেখিলে, তাহাদিগকে আপনার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী মনে করিতেন। কিন্তু শাসন বড় কঠিন ছিল, তিনি সে স্বাধীনতা পাইতেন না। তাই সময় সময় গৃহের ছাদে উঠিয়া, প্রাচীরের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া, বাহিরের জগৎটা একটু দেখিয়া লইতেন। কিন্তু কি দেখিতেন? গৃহের পর গৃহ, ছাদের পর ছাদ। কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে আর কি দেখিবেন? কোথাও কেহ ছাদে উঠিয়াছে, কোন ছাদে কেহ বা কাপড় শুকাইতে দিতেছে, একমনে বালক রবীন্দ্র তাহাই দেখিতেন এবং বাহিরের পৃথিবীর দৃশ্য দেখিবার সাধ তাহাতেই মিটাইতে হইত। স্কুলে যাইতে হইলেও তাঁহার এ সাধ কথঞ্চিত মিটিত, কিন্তু ছেলেবেলায় তাঁহাকে স্কুলেও যাইতে দেওয়া হয় নাই, বাড়ীতেই পণ্ডিত রাখিয়া পড়ান হইত। তাঁহা অপেক্ষা বয়সে দুই তিন বৎসরের বড় এক ভ্রাতা ও ভাগিনেয় তখন স্কুলে যাইতেন। তাঁহারা বয়স্কদের ন্যায় স্বাধীনভাবে বাড়ীর বাহিরে যান, আর তিনি গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, ইহা তাঁহার কাছে অতিশয় জুলুম মনে হইত। স্কুলে যাওয়া আর স্বাধীনতা পাওয়া, তাঁহার কাছে তখন একই কথা বলিয়া মনে হইত। স্কুলে যাইবার জন্য এক এক সময়ে তিনি কাঁদিতেন; তখন বাড়ীর পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন,—'এখন স্কুলে যাওয়ার জন্য কাঁদ্‌ছ, এর পর স্কুলে যেতে হবে বলে কাঁদ্‌বে।'

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামায়ণ মহাভারতের গল্প তিনি একাগ্রমনে শুনিতেন। চারি পাঁচ বৎসর বয়সের সময় যখন নিজেই রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিলেন, তখন আর তাঁহার আনন্দ ধরে না। তখন কতক বুঝিতেন, কতক বা বুঝিতেন না; কিন্তু তবু পড়িয়া কতই সুখী হইতেন। রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কবিতা লেখার আরম্ভটা কিরূপে হয়, শুন। তাঁহার অপেক্ষা বয়সে চারি পাঁচ বৎসরের বড়, তাঁহার একজন আত্মীয় একদিন তাঁহাকে বলিলেন,—"আয় রবি আমরা কবিতা লিখি।" রবি বলিলেন,—"কেমন করিয়া কবিতা লিখিতে হয়, তাত আমরা কিছুই জানিনা"। তখন তিনি বলিলেন,—"ও আর শক্ত কি, প্রতিছত্রে চৌদ্দটা করিয়া অক্ষর দিয়া মিল করিয়া লিখিলেই কবিতা হইল।" রবীন্দ্রও সেই উপদেশ অনুসারে কবিতা লিখিতে বসিলেন। তখন হাতের লেখা, অতি অল্প বয়স্ক

বালকের যেমন হইয়া থাকে, তেমনি ছিল। বড় বড় বাঁকা বাঁকা অক্ষরে রবীন্দ্রনাথ পদ্ম সম্বন্ধে এক কবিতা লিখিলেন, সেই তাঁহার প্রথম লেখা।

ইহার কিছুদিন পরে, তাঁহাদিগকে পানিহাটির বাগানে যাইয়া কিছুকাল থাকিতে হইবে স্থির হইল। পানিহাটির বাড়ীটি গঙ্গার ধারে, সম্মুখে বিস্তৃত বালুকাময় চড়া। গাছপালা, স্বভাবের শোভা, পাখীর গান, নদীর কুল্ কুল্ রব, এই সমস্ত দেখিবার ও শুনিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মন বড় ব্যাকুল হইত। এতদিনে তাঁহার সে সাধ মিটিল। কলিকাতা থাকিতে তাঁহার একটুও স্বাধীনতা ছিল না, অন্যান্য বালকেরা যে স্বাধীনতা টুকু পায়, তিনি তাহাতেও বঞ্চিত ছিলেন। সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলে যেখানে সেখানে বেড়াইবে, অভিভাবকগণ তাহা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু এখানে রবীন্দ্র নাথ কতকটা স্বাধীনতা পাইলেন। সেই বাগানে যতদিন বাস করিতে পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার খুব সুখের দিন ছিল বলিয়া মনে করিতেন। গঙ্গা দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতেছে, কোথাও বা গঙ্গার চড়ায় নৌকা বাঁধিয়া যাত্রিরা রাঁধিতেছে, কখনো বা নদীর জলে 'টাপুর টুপুর' বৃষ্টি পড়িতেছে, বালক রবীন্দ্রনাথ আকুল প্রাণে সেই সকল দেখিতেন। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বান' তখন তাঁহার মনে পড়িত এবং গঙ্গার চড়ায় যাত্রিদিগকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইত, শিব ঠাকুর তাঁহার পরিবারবর্গ লইয়া গঙ্গার চড়ায় বাস করেন।

অভিভাবকগণ যখন রবীন্দ্রনাথকে স্কুলে পাঠাইবার উপযুক্ত মনে করিলেন, তখন নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেই সময়ে নর্ম্মাল স্কুলে সাতকড়ি দত্ত নামে একজন শিক্ষক ছিলেন, তিনি কোন প্রকারে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এই বালক কবিতা লিখিতে পারে। তাই একদিন রবীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া সেকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাঁ বলিলেন। তখন সাতকড়ি বাবু বলিলেন, 'আচ্ছা আমি দুটি পদ দিতেছি, তুমি ইহা লইয়া একটি কবিতা রচনা কর'।

"রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।"

বালক রবীন্দ্র এই দুটি চরণ লইয়া এক মস্ত কবিতা লিখিয়া দিলেন; তাহা হইতে দুটি ছত্র নীচে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল;—

"মীনগণ দীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলে ক্রীড়া করে।"

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স আট বৎসর মাত্র। উদ্ধৃত দুটি চরণ পড়িলেই, এই ক্ষুদ্র বালকের প্রতিভার আভাষ পাওয়া যায়।

হরনাথ পণ্ডিত নামে একজন শিক্ষক এই সময়ে নর্ম্মাল স্কুলে ছিলেন। এই লোকটির প্রকৃতি বড় ভাল ছিল না; ছেলেদের সঙ্গে তিনি বড় ভাল ব্যবহার করিতেন না। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষকের উপর বড়ে চটা ছিলেন; কখনো ইহার সহিত কথা কহেন নাই, ক্লাশে পড়া জিজ্ঞাসা করিলেও রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তর করিতেন না। ইহার জন্য অনেক সময় তাঁহাকে খুব কঠিন শাস্তি পাইতে হইয়াছে, অনেক সময়ে উঠানে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। সে আবার সোজা দাঁড়ান নয়, মাথা হেঁট করিয়া পিঠ বাঁকাইয়া, অনেক ক্ষণ এক ভাবে থাকিতে হইত। কিন্তু এত কঠিন শাস্তি দিয়াও হরনাথ পণ্ডিত রবিকে কথা বা পড়া বলাইতে পারেন নাই। তিনি মনে করিতেন, ছেলেটার কিছু হইবে না; কিন্তু যখন বৎসরের শেষে পরীক্ষায় মধুসূদন স্মৃতিরত্নের নিকট রবীন্দ্র খুব বেশী নম্বর পাইয়া ক্লাসে ১ম কি ২য় হইলেন, তখন হরনাথ পণ্ডিত তাহা বিশ্বাসই করিলেন না। তিনি বলিলেন,-'পরীক্ষক পক্ষপাত করিয়া বেশী নম্বর দিয়াছেন। যে সারা বৎসর কিছু পড়ে নাই, সে কেমন করিয়া এত নম্বর পাইল'। রবীন্দ্রনাথের পুনরায় পরীক্ষা দিতে হইল। এবার অন্যান্য শিক্ষকদের সমক্ষে

পরীক্ষা হইল। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বের অপেক্ষাও এবার বেশী নম্বর পাইলেন। রবীন্দ্রনাথ মনোযোগের সহিত পড়া তৈয়ার করিতেন, কিন্তু হরনাথ পণ্ডিতের উপর বিরক্তি বশতঃ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেন না। হরনাথ পণ্ডিতের মনে হইত, রবি কিছুই করেনা।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ পিতৃঠাকুর মহাশয়ের সহিত বোলপুরে যান। সেখানে তৃণ লতা, পত্র পুষ্পশোভিত ক্ষেত্রের উন্মুক্ত বায়ুতে ছুটা ছুটি করিবার স্বাধীনতা পাইয়া, সে যেন এক নূতন জীবন পাইলেন।

তার পর পিতার সহিত ডালহাউসি পাহাড়ে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, রাত্রি চারিটার সময় উঠিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, পুত্রকেও সেই সময়ে উঠিয়া সংস্কৃত রামায়ণের শ্লোক ও সংস্কৃত ব্যাকরণ মুখস্ত করিতে হইত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিষ বড় ভাল বাসিতেন। বালক রবীন্দ্রনাথকে আকাশের তারা দেখাইয়া জ্যোতিষের কথা শিখাইতেন এবং সৃষ্টি কর্ত্তার মহিমার কথা বলিতেন। ইংরাজী জ্যোতিষের পুস্তক হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলা রচনা শিক্ষা হইত।

কিছু দিন পরে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই নগরে তাঁহার ভ্রাতা, সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের নিকট গিয়া থাকেন। সেখানে সত্যেন্দ্র বাবুর লাইব্রেরীতে বসিয়া ইংরাজী কবিতা পুস্তক পড়াই তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। এ সময়ে রবীন্দ্র নাথের বয়স ১৫ কি ১৬ বৎসর এবং এই সময় হইতেই তিনি রীতিমত লিখিতে আরম্ভ করেন। 'ভারতী' মাসিক পত্রে এই সময় হইতেই তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বিলাতের লণ্ডনে ইউনিভারসিটি কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন, এবং ইউরোপের নানাদেশ বেড়াইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। সেই অবধি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য চর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন। রবীন্দ্রনাথ অনেক গুলি কবিতা পুস্তক লিখিয়াছেন; এবং তাঁহার কবিতা, বাঙ্গালা ভাষায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে বলা যায়। সকল প্রকারের সঙ্গীত রচনায়ই তিনি সিদ্ধহস্ত নিজেও একজন অতি সুগায়ক; সঙ্গীতের ভাষা, ভাব ও সুরের এমন সুন্দর সমাবেশ কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। নাটক নভেলও তাঁহার কয়েকখানি আছে, তাহা ছাড়া প্রবন্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের ত সংখ্যাই নাই। তাঁহার রচিত 'রাজর্ষি' বালক বালিকাদের পড়িবার উপযোগী একখানি অতি সুন্দর পুস্তক। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কবিতাই অধিক লিখিতেন এবং একজন অসাধারণ কবি বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ কাল তাঁহার সমকক্ষ গদ্য লেখকও বড় দেখা যায় না। বঙ্কিম বাবু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অতিশয় প্রশংসা করিতেন। একবার একটি সভায় দেশের প্রধান প্রধান লেখকগণ একত্রিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বঙ্কিম বাবুর গলায় এক ছড়া মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বঙ্কিম বাবু সেই মালা ছড়াটি, রবীন্দ্রনাথের গলায় সাদরে পরাইয়া দিলেন। দেশের প্রধান প্রধান লেখকদিগের মধ্যে বঙ্কিম বাবুর কাছে এ প্রকার সমাদর লাভ করা সাধারণ গৌরবের কথা নয়। আজ কাল রবীন্দ্রনাথকে দেশেরমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শ্রী ... দেবী

সুন্দর বনে সাত বৎসর।

মগ বালকটির সহিত অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার খুব ভাব হইয়া গেল। কিসে আমি সুখী হইব, কি করিলে সুন্দর বনের সেই জঙ্গল-বাসের কষ্ট আমার দূর হইবে, সে কেবল দিন রাত্রি সেই চেষ্টায় থাকিত। তাহার নাম ছিল মউং মু। আমি তাহাকে মনু বলিয়া ডাকিতাম। মনুর মাও আমাকে আপনার ছেলের মত দেখিতেন। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব হীন সেই জঙ্গলে যাহাতে আমি মায়ের অভাব না বুঝিতে পারি, তিনি প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতেন।

সেই নিষ্ঠুর দস্যুদলের মধ্যে যে এমন দুইটি স্নেহমাখা কোমল হৃদয় আছে, তাহা আমি আগে বুঝিতে পারি নাই এবং এমন যে থাকিতে পারে তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি নাই। বাস্তবিকই মনু ও তাহার মায়ের যত্ন, আদর স্নেহ ও ভালবাসায় আমি কোন কষ্ট বা অভাবই বোধ করিতাম না। বাড়ীর জন্য প্রথম প্রথম যে কষ্ট হইত, তাহাও যেন ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম।

মনু ছায়ার মত সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে; আমরা একত্রে খাই, একত্রে শয়ন করি, একত্রে বেড়াইতে যাই। মনুর বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ ছিল এবং সে আমার সমবয়স্ক ছিল; আমার বয়স তখন ১৩ বৎসর। ইংরাজীতে আমি যে সকল বাঘ ভাল্লুকের গল্প পড়িয়াছিলাম, মনুকে তাহা বলিতাম; তাহা ছাড়া রামায়ণ মহাভারতের গল্পও তাহাকে শুনাইতাম। খেলা করা, গল্প করা এবং ক্ষিধের সময় খাওয়া ভিন্ন আমাদের আর কোন কাজ ছিল না। মনুও সুন্দর বনের বাঘ ভাল্লুকের অনেক গল্প আমাকে শুনাইত, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের গল্প তাহার কাছে সম্পূর্ণ নূতন ছিল। সে খুব আগ্রহের সহিত সেই সকল গল্প শুনিত। ক্রমে তাহার সেই সকল পড়িবার একটা আগ্রহ জন্মিল। আমারও ইচ্ছা হইল, তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিখাই। মনু এক দিন তাহার বাপকে গিয়া বলিল,—"আমাকে বই এনে দাও, আমি লেখা পড়া শিখ্‌ব।" মনুর বাপ তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল,—'বাঙ্গালীর ছেলেটা দেখ্‌ছি তোকে একেবারে বাঙ্গালী করে তুলেছে? লেখা পড়া শিখে তুই কি পণ্ডিতি রকমে ডাকাতি কর্‌বি নাকি? আর লেখা পড়া শিখ্‌লে কি তুই আর মানুষ থাক্‌বি? ঐ বাঙ্গালীর ছেলেদের মত ভীরু হয়ে যাবি, জুজু হয়ে থাক্‌বি। কলম—বাঙ্গালীর ছেলের অস্ত্র। আমাদের অস্ত্র—তীর ধনুক, তলোয়ার, বন্দুক। বাঙ্গালীর অস্ত্র—কলমে, বাঘ ভাল্লুকও শিকার করা যায় না, ডাকাতিও চলে না। যে বিদ্যে তোর কাজে লাগ্‌বে তুই তাই শেখ্, অন্য বিদ্যে শিখে তোর দরকার নেই।" মনু ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিল,—"তুমি জান না, তাই অমন কথা বল্‌ছ। বইএ যে সকল বীর পুরুষদের কথা লেখা আছে, যে সকল যুদ্ধের কথা লেখা আছে, তা শুনেই আমার শরীর গরম হ'য়ে ওঠে; সে সকল যদি নিজে পড়্‌তে পারি, তবে তাতে আমার আরো সাহস বাড়্‌বে। তোমরা ডাকাতি কর, লুটপাট কর, আমি রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো, আর তাদের হারিয়ে দিয়ে রাজা হব।" কথা গুলি বলিবার সময় যেন মনুর শরীর উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, চক্ষু দিয়া যেন একটা তেজ বাহির হইতেছিল। মনুর বাপ তাহার কথায় যেন একটু অবাক হইয়া গেল, আর কোন কথা না বলিয়া, 'কালই বই পাইবে,' এই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

মনু আমার সমবয়স্ক হইলেও তাহার শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল। এত অল্প বয়সে

এ প্রকার সাহসী বালক আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। তীর চালনা, তলোয়ার খেলা এবং বন্দুকের ব্যবহার সে এই বয়সেই সুন্দর শিখিয়াছিল। তাহার সঙ্গে থাকিয়া আমারও সে সকল কিছু কিছু অভ্যাস হইয়াছিল। আমি তাহাকে লিখিতে পাড়িতে শিখাইতাম, সে আমাকে তীর ও বন্দুক ছুঁড়িতে শিখাইত।

সুন্দর বনে অনেক মধুর চাক্ জন্মে। সেই সকল চাক্ ভাঙ্গিয়া মধু সংগ্রহ করা কতকগুলি লোকের ব্যবসায় আছে। আমাদেরও একদিন সখ্ হইল একটি চাক ভাঙ্গিব। খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটি চাক্ও পাইলাম, কিন্তু কাছে গিয়া দেখি, তাহাতে এত মৌমাছি বসিয়া আছে যে, একবার যদি তাহারা টের পায়, তাহা হইলে আমাদের চাক্ ভাঙ্গার সখ্ ভাল করিয়াই ভাঙ্গিয়া দিবে। সুতরাং আমাদের মৌচাক ভাঙ্গা হইল না। আমরা দুঃখিত মনে ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে একটা হরিণ দেখিতে পাইলাম। আমরা যখনই বাড়ীর বাহির হইতাম, তখনই তীর ধনুক ও বন্দুক লইয়া বাহির হইতাম. কেননা কখন কোন্ বিপদে পড়ি তাহার ঠিকানা নাই। হরিণটা দেখিয়া মনু বলিল, 'বেশ হ'য়েছে, শুধু হাতে আজ আর বাড়ী ফির্‌তে হ'ল না। কিন্তু এখান থেকে হরিণটাকে মারবার সুবিধে হবে না, মাঝখানে ঐ একটা গাছ রয়েছে। খুব পা টিপে টিপে আমার পেছনে পেছনে এস, একটু ঘুরে গেলেই বেশ সুবিধে পাওয়া যাবে।', মনুর কথা মত আমি তাহার পিছনে চলিলাম। কিন্তু একটু যাইয়াই মনু থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। আমি হরিণটার দিকে চাহিতে চাহিতে চলিতে ছিলাম, একেবারে মনুর গায়ের উপর গিয়া পড়িলাম।

সে আমার গা টিপিয়া কাণেকাণে বলিল, 'চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক, এক চুলও ন'ড়ো না, কথাও ক'য়ো না, ঐ দেখ!" মনু হাত বাড়াইয়া সম্মুখের দিকে দেখাইয়া দিল।

চাহিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দেখিলাম আমাদের সম্মুখে ৮।১০ হাত দূরে, একটা মাটীর ঢিবির কোলে, একটা বাঘ ঐ হরিণটাকে লক্ষ্য করিয়া আড়ি পাতিয়াছে। আমার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা হয়ত চীৎকার করিয়াই উঠিতাম। তাহা হইলে আমাদের যে দশা হইত তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছ। মনুর দেখিলাম অসীম সাহস। সে এক হাতে

আমাকে এবং আর এক হাতে বন্দুকটি লইয়া, স্থির হইয়া একদৃষ্টে বাঘের দিকে চাহিয়া রহিল, বোধ হইল যেন তাহার নিশ্বাসও পড়িতেছে না। বাঘটা প্রকাণ্ড; অত বড় একটা জানোয়ার চলিতেছে, অথচ একটুও শব্দ হইতেছে না, এও বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। কিন্তু শেষে জানিতে পারিলাম যে, কি জন্য ইহারা এত নিঃশব্দে চলিতে পারে। বেড়ালের পায়ের পাতার গঠন তোমরা দেখিয়া থাকিবে, ইহাদের পাও ঠিক সেইরকম, ইহাদের আঙ্গুলের মাথায় খুব তীক্ষ্ণ নখ আছে, (১ছবি দেখ) আবশ্যক মত এই নখ বাহির হয়, এবং অন্য সময়ে ইহা কচ্ছপের শুঁড়ের মত ভিতরে ঢুকিয়া থাকে। তখন পায়ের তলাটি বেশ গদির মত হয় (২ছবি দেখ)

(১)

(২)

সুতরাং হাঁটিবার সময় কিছুমাত্র শব্দ হয় না। সে যাহাই হউক, বাঘ আড়ি করিয়া এক লাফে গিয়া হরিণটার উপর পড়িল এবং তাহার সম্মুখের পায়ের এক আঘাতেই হরিণটার ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বাঘ তখন তাহাকে লইয়া গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল, আমরাও প্রাণ লইয়া সে যাত্রা বাড়ী ফিরিলাম।

আর একদিন একটা বাঘ ভারি জব্দ হইয়াছিল। তার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, বলি শুন। বাঘ সুন্দর বনের রাজা বলিলেই হয়। কিন্তু সুন্দরবনের মহিষগুলিও বড় ভয়ঙ্কর। অত বড় ও বলবান মহিষ অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ। বাঘ মহিষে সুন্দর বনে প্রায়ই লড়াই হয়। কখনো বাঘের জিৎ হয়, কখনো বা মহিষকেও জিতিতে দেখা গিয়া থাকে। সে যাহা হউক, একদিন একটা মহিষের বাচ্চা চরিতে চরিতে বাথান হইতে একটু দুরে গিয়া পড়িয়াছিল। একটা বাঘ, বেচারিকে দেখিয়া লোভ সামলাইতে না পারিয়া, যেমন তাহাকে ধরিবার জন্য লাফ দিতে যাইবে, এমন সময় বাচ্চাটি তাহা দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই শব্দে একেবারে

ছয় সাতটা মহিষ সেই দিকে দৌড়িয়া আসিল। বাঘ তখন আর পলাইবার অবসর টুকুও পাইল না। সেই ছয় সাতটা মহিষে মিলিয়া সিং এবং পায়ের আঘাতে বাঘটাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া মারিয়া ফেলিল।

ক্রমশঃ

বুদ্ধি যার বল তার।

চিৎপুরে এক সাহেব থাকে,
আর থাকে তার বিবি,
বাড়ী তাদের নদীর ধারে,
দেখ্‌তে যেন ছবি।
আর থাকে এক পোষা কুকুর,
নামটি তার জেসি ;
সাহেব যদিও বাস্‌তো ভাল,
বিবি বাস্‌তো বেশী।
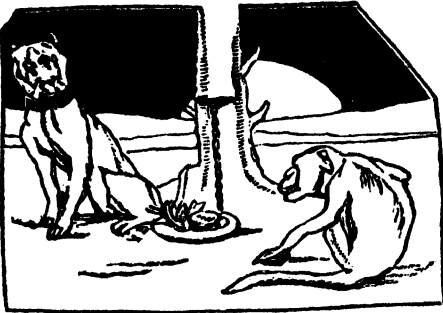
বাগানে এক গাছের গোড়ায়,
রাখ্‌তো বেঁধে তারে,
রকম রকম খাবার রোজ,
আস্‌তো সান্‌কি ভরে'।
একটা বাঁদর সেই বাগানে,
ডালের উপর থেকে,
যখন তখন এসে এসে
জেসির খাওয়া দ্যাখে।

রোজ রোজ তাই দেখে দেখে,
নোলায় আসে জল,
কিন্তু জেসির খাবার নিতে,
নাইক তত বল।
যেমন জেসির কাছে আসে,
অমনি আসে তেড়ে;
কাজেই তখন বাঁদর মশায়,
তফাতে যান সরে।
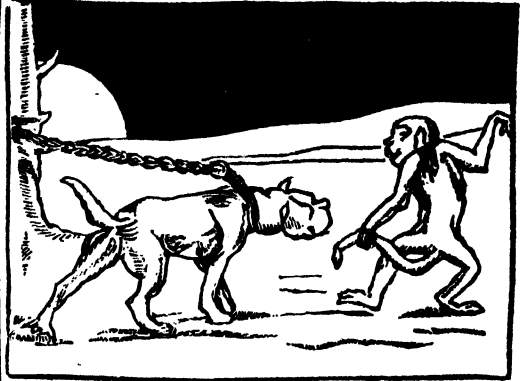
থেকে থেকে একটা ফিকির,
ঠাহর করে মনে,
ভাব্‌লে আজ খেতেই হবে
জেসির খানা এনে।

এই না ভেবে ধীরে গিয়ে,
বস্‌লো তার পাশে,
অমনি কুকুর তেড়ে উঠে,
তার দিকেতে আসে।
বাঁদর তখন দাঁড়িয়ে উঠে,
লেজটি হাতে ধ'রে,
গাছের গুঁড়ির চার দিকেতে,
লাগ্‌লো যেতে ঘুরে।
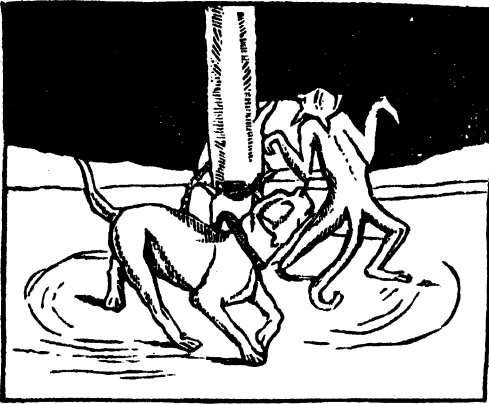
বাঁদর যত ঘুর্‌তে থাকে,
জেসিও পিছে ধায়,
এই বুঝি গো ধরে ফেল্লে,
খে-য়ে ফে-ল্লে হায়!
ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে গাছের গোড়ায়,
শিকলি জড়িয়ে এল;

জেসি তখন আট্‌কে গিয়ে,
লাফিয়ে ধর্‌তে গেল।

যেমন যাওয়া, তেমনি গলায়
আট্‌কে গেল ফাঁসি,
(তখন) খাবার নিয়ে পলায় বানর
কে দেখে তার হাসি।

গায়ের জোরে যেখানেতে কাজটা নাহি হয়,
বুদ্ধিবলে অনেক সময় সহজ হয়ে যায়।

দ্বাদশ বর্ষ } ভাদ্র ১৩০২ { ৫ম সংখ্যা

শিশুর প্রতি।

এই যে বিশাল বিশ্ব জীবের আবাস,
কাহার ইচ্ছায় এর হইল প্রকাশ ?
কাহার অনন্ত ভাব ধরে এ আকাশ,
কাহার ইচ্ছায় ঘোরে ফিরে—বারমাস ?
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা বৃক্ষ লতা গণ,
কাহার কৃপায় করে জীবন ধারণ ?
রবি কার জ্যোতি পেয়ে আলো দান করে,
কাহার সৌন্দর্য্য কণা ফোটে শশধরে ?
কাহার সুগন্ধ বায়ু করে বিতরণ,
কাহার শোভায় শোভে বন উপবন ?
কোকিল পাপিয়া আদি যত পাখীগণ,
কাহার মধুর স্বরে জুড়ায় শ্রবণ ?
বিন্দু মাত্র স্নেহ সুধা কার কাছে পেয়ে,
সন্তানে পালেন পিতা মাতা এত স্নেহে ?
সকলের মূলাধার স্রষ্টা সবাকার,
তাঁর নাম, যাদুমণি, জগৎ ঈশ্বর।

শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী।

শিবজী।

আমরা আজ তোমাদিগকে যে হিন্দু বীরের কথা বলিতেছি ইহাঁর মহারাষ্ট্র দেশে জন্ম এবং ইনি মহারাষ্ট্র দেশের মুসলমান সুলতানদিগের অধীনস্থ একজন মহারাট্টা জায়গীরদার বা সেনাপতির সন্তান। ইঁহার বীরত্বের কথা ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ।

১৬২৭ খৃঃ পুনা নগরের ২৫ ক্রোশ উত্তরে সুবর্ণ দুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। ইঁহার পিতা শাহজী একজন বীরপুরুষ ছিলেন। সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে আহম্মদ নগর, বিজয়পুর ও গলখন্দ, এই তিনটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ছিল। দিল্লির মোগল সম্রাট সাজাহান যখন আহম্মদ নগর জয় করিতে চেষ্টা করেন, তখন মহারাষ্ট্র বীর শাহজী আপনার বাহুবলে আহম্মদ নগর স্বাধীন রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে আহম্মদ নগর পরাধীন হইলে শাহজী বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে একজন সেনাপতি হইয়া বৃহৎ জায়গীর প্রাপ্ত হন।

দাদাজী নামে শাহজীর একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই শিবজী দাদাজীর কাছে শিক্ষা পান। শিবজী কখন লেখা পড়া শিখেন নাই, আপন নামটি পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন না; কিন্তু অল্পবয়সেই তীর ধনুকের ব্যবহারে, নানারূপ মহারাষ্ট্রীয় খড়্গ ও ছুরিকা চালনায় এবং অশ্বারোহণে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। এই অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা লইয়াই যে শিবজী কাল কাটাইতেন তাহা নয়, যখনই অবসর পাইতেন, দাদাজীর নিকট বসিয়া মহাভারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরত্বের গল্প ও বীরদিগের কীর্ত্তি-কাহিনী শুনিতেন। প্রাচীন কালের সেই বীরদিগের বীরত্বের কথা শুনিতে শুনিতে বালক শিবজীর ক্ষুদ্র হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিত এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইত। এইরূপে অল্পবয়সেই শিবজীর হৃদয়ে দেশের প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ জন্মিল। বীর বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া যশঃস্বী হইবার জন্য তাঁহার একটা আকাঙ্ক্ষা হইল। ক্রমে তিনি অত্যন্ত মুসলমান বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন।

শিবজীর বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তিনি সমবয়স্ক কতকগুলি যুবককে লইয়া একটি দল করিলেন। পর্ব্বতপূর্ণ কঙ্কন দেশে তাহাদের সহিত সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। পর্ব্বত সকল কিরূপে উল্লঙ্ঘন করা যায়, কোথায় পথ আছে, কোন্ পথে কোন্ দুর্গে যাওয়া যায়, কোন্ কোন্ দুর্গ অতিশয় দুর্গম, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ ও রক্ষা করিতে হয়, এই সকল চিন্তায় তাঁহার দিন কাটিত। ক্রমে একজন স্বাধীন রাজা হইবার

প্রবল ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল, এবং কিরূপে দুইএকটি দুর্গ হস্তগত করিবেন তাহারই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। উনিশ বৎসর বয়সের সময় শিবজী তোরণ দুর্গ হস্তগত করিয়া, সেখানকার জমীদারদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতে লাগিলেন, এবং পর বৎসর রাজগড় নামে এক নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। বিজয়পুরের সুলতান এই সমস্ত বিষয়ের সংবাদ পাইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু শিবজী কাহারও কোন কথা শুনিলেন না। কোথাও দুর্গরক্ষকদিগকে টাকায় বশীভূত করিয়া, কোথাও বা আপন দল বল লইয়া সহসা দুর্গ আক্রমণ করিয়া, তিনি অনেক দুর্গ হস্তগত করিলেন। শিবজী পিতার সম্মতি অনুসারেই এরূপ করিতেছেন মনে করিয়া, বিজয়পুরের সুলতান তাঁহার পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন। শাহজীকে যে ঘরটিতে রাখা হইয়াছিল তাহা পাথরে নির্ম্মিত; একটি মাত্র দরজা তাহাতে ছিল। সেই ঘরে আবদ্ধ করিয়া সুলতান একটা সময় স্থির করিয়া দিয়া এই আদেশ করিলেন যে, সেই সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা স্বীকার না করিলে, সেই ঘরের সেই একটি মাত্র দরজাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। শিবজী পিতাকে এইরূপ বিপদগ্রস্থ দেখিয়া, দিল্লির সম্রাটের নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন; কিন্তু চারি বৎসর কাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দী স্বরূপ রহিলেন।

কয়েকটি দুর্গ জয় করিয়া শিবজীর সাহস ও আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গেল। তখন তিনি সমস্ত কঙ্কন প্রদেশ জয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এবার বিজয়পুরের সুলতান শিবজীকে একেবারে ধ্বংশ করিবার ইচ্ছা করিলেন। আফ্জল খাঁ নামক একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান যোদ্ধা বহুসংখ্যক সৈন্য ও কামান লইয়া শিবজীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ইনি অতিশয় গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিলেন যে, এই বিদ্রোহীকে অক্লেশে শিকলে বাঁধিয়া সুলতানের পায়ের নিকট হাজির করিয়া দিবেন। শিবজী দেখিলেন মুসলমান সৈন্য অসংখ্য, এত গুলি সৈন্যের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করা অসম্ভব, তাই তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, এবং আফজলখাঁ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তিনি বিনীত ভাবে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবেন ইহাও জানাইলেন। প্রতাপগড় দুর্গের নিকট উভয়ের সাক্ষাৎ করা স্থির হইল। আফ্জলখাঁর দেড় হাজার সৈন্য দুর্গ হইতে কিছু দূরে রহিল, তিনি একমাত্র সহচরের সহিত পাল্কি করিয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে শিবজী তুলার কুর্ত্তির নীচে লৌহবর্ম্ম ও পাগড়ির নীচে শিরস্ত্রাণ পরিলেন এবং স্নেহময়ী মাতার চরণে মস্তক রাখিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, আফ্জল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সাক্ষাৎ কালে আফ্জল খাঁ যেমন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন, শিবজী অমনি লুকায়িত ছুরিকা দ্বারা তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিলেন। তাঁহার এই কার্য্য বীরের উপযুক্ত হয় নাই। ইহা তাঁহার জীবনের একটি কলঙ্ক। শিবজীর গুপ্তসেনা আফ্জল খাঁর সেনাকে পরাস্ত করিল। সুলতান তখন আর এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। শিবজী যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন, কিন্তু কোন পক্ষই জয়লাভ করিতে পারিল না। এই বিশৃঙ্খলায় শাহজী মধ্যবর্ত্তী হইলেন। শাহজী শিবজীকে দেখিতে আসিলে, শিবজী ঘোড়া হইতে নামিয়া, পিতাকে রাজার ন্যায় সম্মান করিয়াছিলেন। পিতার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাঁটিয়া গিয়াছিলেন এবং পিতা বসিতে বলিলেও তাঁহার সম্মুখে আসন গ্রহণ করেন নাই। শাহজী পুত্রের ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে যাইয়া সুলতানের সহিত শিবজীর সন্ধি স্থাপন করিয়া দিলেন। এই সন্ধিতে শিবজী সমস্ত কঙ্কন দেশের অধীশ্বর হইলেন।

শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।

সাপ।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে মাঠে ঘাটে অনেক সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির বিষ আছে, আর কতকগুলির বিষ নাই। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর অনেক লোক সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। গ্রীষ্ম কালে রাত্রিতে সাপেরা পথের উপরে শুইয়া হাওয়া খায়। গরমের সময়ে রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গেলে, সাপেদের খুব আনন্দ হয় এবং এই সময়ে তাহারা ব্যাং ধরিয়া খাইবার জন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে সময়ে কোথাও যাইতে হইলে আলো ভিন্ন পথে চলিবে না। পায়ে জুতা বা খড়মের শব্দ করিয়া হাঁটিবে, অথবা হাতে লাঠি লইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করিতে করিতে যাইবে।

সাপ নানা জাতীয় হয়। পৃথিবীতে এক হাজারেরও বেশী রকমের সাপ আছে। খুব শীতপ্রধান দেশে সাপ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই অনেক রকমের সাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

কতকগুলি সাপ আছে, তাহারা কেবল মাটিতেই বেড়ায়; কতকগুলি জলেই থাকে, কতকগুলি আবার গাছে গাছেই থাকে, আর কতকগুলি কেবল সমুদ্রেই থাকে। কতকগুলি খুব ছোট—আধ হাত মাত্র, কতকগুলি খুব বড়—কুড়ি হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই সকল সাপের মধ্যে ও কতকগুলির বিষ আছে, কতকগুলির বিষ নাই।

বাঙ্গালা দেশে গোখুরা, কেউটিয়া, কালাজ এবং কেরোতা সাপই খুব বিষাক্ত। এই সকল সাপের কামড়েই মানুষের মৃত্যু হয়।

গোখুরাকে খরিষও বলে। গোখুরা ও কেউটা একই জাতীয় সাপ। কিন্তু ইহারা নানা প্রকারের হয়। সচরাচর চারি প্রকারের গোখুরা সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। 'খই'য়ে গোখুরা,

সাঁখামুটী গোখুরা, কালী গোখুরা এবং পদ্ম গোখুরা। গোখুরা ও কেউটে সাপে ফণা ধরে, অন্য কোন বিষাক্ত সাপে ফণা ধরিতে পারে না। ইহাদের গলার কাছের প্রায় গোটা কুড়ি পাঁজর খুব লম্বা এবং এই পাঁজরের উপর যে মাংস ও চামড়া আছে, তাহাও খুব চওড়া।

এই বিস্তৃত চ্যাটাল অংশটাকে ফণা বলে। গোখুরা ইচ্ছা মত এই ফণা কমাইতে ও বাড়াইতে পারে। রাগিলেই মাথা উঁচু করিয়া লেজের ভরে সোজা হইয়া দাঁড়ায় ও খুব বড় ফণা ধরে। ফণার উপর গোরুর খুর, নুপুর বা চস্‌মার মত দাগ্ থাকে। ঐ বড় ছবিতে দেখ গোখুরা কেমন ফণা ধরিয়াছে।

'খই'য়ে গোখুরার গায়ে সাদা সাদা খইয়ের মত দাগ আছে। ইহারা প্রায় তিন হাত লম্বা হয়।

সুন্দর বনে হল্‌দে শাঁখামুটী (শঙ্খচূড়?) গোখুরার রং হল্‌দে, দেখিতে ঢোঁড়া সাপের মত। ইহারা আকারে খুব বড় হয়। ইহারা চার পাঁচ হাত লম্বা হয়। ইহাদের রাগ অত্যন্ত বেশী। ফণাটি কুলার মত বড়। ইহারা লেজে ভর দিয়া মানুষের সমান উচু হইয়া উঠে ও তাড়া করিয়া কামড়াইতে যায়। ইহাদের বিষ সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ। ইহারা অন্যান্য সাপ ধরিয়া খায়।

কালী গোখুরার রং কাল ইহারা খুব চঞ্চল ও রাগী। পদ্ম গোখুরা দেখিতে খুব সুশ্রী। গায়ের রং লাল্‌চে তার উপর কাল ছোট ছোট টোপ সাজান।

গোখুরা সাপ অনেকটা ধীর ও শান্ত, হঠাৎ রাগে না ও সহজে দংশন করে না। অনেক সময়ে দেখিয়াছি, লোক বসিয়া আছে, গোখুরা সাপটি তাহার কোলের উপর দিয়া, পায়ের উপর দিয়া, সুড় সুড় করিয়া চলিয়া গিয়াছে, দংশন করে নাই। কোন প্রকার শব্দ শুনিলে ইহারা পলাইয়া যায়, তবে যখন বড় ভয় পায় ও আপনাকে বিপদগ্রস্ত মনে করে, তখনই কামড়াইতে যায়। গোখুরা সাপ অনেক সময়ে লোকের বাড়ীতে গর্ত্তের ভিতরে বাস করে ও ইন্দুর ধরিয়া ধরিয়া খায়; কিন্তু বাড়ির কাহাকেও দংশন করে না। সাপেরা প্রায়ই আপনাদের বাসস্থান ত্যাগ করে না।

কেউটিয়া সাপ দেখিতে প্রায় গোখুরার মত। দুইয়ে প্রভেদ খুব কম। কেউটে গোখুরার চেয়ে কাল। ইহার ফণার উপর যে দাগটা আছে, তাহাও তত পরিষ্কার নহে। ইঁটের পাঁজা ও পুরাতন ভাঙ্গা বাড়িতেই গোখুরা সাপ থাকিতে ভাল বাসে। লোকে বলে, গোখুরা সাপ মানুষের বাড়ির কাছে থাকিতে ভালবাসে আর কেউটে সাপ মাঠে, বিলে, খালে ও ধান ক্ষেতে বাস করে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই গোখুরা সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক স্থানে এত অধিক যে, সাপ ঘরের চালে, বিছানার ভিতর, জুতার মধ্যে, ও ভাতের হাঁড়ির মধ্যেও লুকাইয়া থাকে। ইহারা এক কালে ২০টা হইতে ৩০টা ডিম পাড়ে ও যতদিন না ডিম ফুটে, ততদিন ডিম গুলিকে জড়াইয়া বসিয়া থাকে। কেবল এক একবার বাহিরে গিয়া চরিয়া আসে। ইহারা পাখী, পাখীর ডিম, ইন্দুর, ব্যাং, মাছ, ও কীটপতঙ্গ ধরিয়া খায়। ইউরোপ অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা দেশে গোখুরা সাপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

গোখুরা জাতীয় সাপ ছাড়া এ দেশে আরও অনেক বিষধর সাপ আছে। কিন্তু তাহারা ফণা ধরিতে পারে না। উলুবোড়া বা চন্দ্রবোড়া, লাউডগা, রাজসাপ বা শাঁখিনি ও কেরোতাই প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কেরোতা সাপই অধিক মারাত্মক। ইহারা চৌকাটে, দরজায়, জানালায়, আলমারিতে আসিয়া লুকাইয়া থাকে, এবং এই সকল স্থানে থাকে বলিয়া অনেক সময়ে অনেকে অন্ধকারে দরজা জানালা বা আলমারি খুলিতে গিয়া, ইহাদের কামড়ে প্রাণ হারায়। রাজসাপের মাথাটা তিনকোণা। গায়ে নীল ও হল্‌দে দাগ আছে। এদেশের লোকে বলে, এই সাপের দুটো মুখ। কিন্তু সেটা কল্পনা মাত্র। লেজের আগাটা মাথার দিকের মত মোটা, তাহাতেই লেজটিকেও মুখ বসিয়া ভ্রম হয়। চন্দ্রবোড়া তিন হাত হয়। গায়ের রং মেটে, তার উপর কাল ও সাদা ডোরা। ইহাদের বিষ দাঁত খুব বড়।

অষ্ট্রেলিয়া দেশেও অনেক বিষধর সর্প আছে। আমেরিকায় 'র‍্যাটেল স্নেক' নামে এক প্রকার বিষধর সর্প আছে, ইহাদের লেজের আগায় কতকগুলি ছোট ছোট বাটীর মত শক্ত পাত আছে। এই সাপ যখন রাগে, তখন কুণ্ডলি পাকাইয়া, মাথাটি নীচু করিয়া, লেজের আগা উঁচু করিয়া লেজ নাড়িতে থাকে; তাহাতে সেই বাটী গুলির

পরস্পরের ঘর্ষণে শুক্‌না পাকা শিম নাড়িলে যে রূপ শব্দ হয় সেই রূপ শব্দ হইতে থাকে। কামড়াইলে, থলের ভিতর হইতে বিষ আসিয়া দাঁতের ছিদ্র দিয়া, ক্ষত স্থানে প্রবেশ করে। সকল সাপের বিষ সমান তীব্র নয়। গোখুরার বিষ সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র। ইহার কামড়ে ইন্দুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব, পাঁচ ছয় সেকেণ্ডেই মরিয়া যায়; মানুষ পাঁচ মিনিট হইতে আধ ঘণ্টার মধ্যে মরে।

র‍্যাটেল স্নেক্

গোখুরা সাপের ছোঁ মারিতে বড় দেরি হয়। কুণ্ডলি করিয়া, ঘাড় উঁচু করিয়া মাথা একদিকে হেলাইয়া, পরে ছোঁ মারে। একবার মারিয়া আবার ছোঁ মারিবার জন্য প্রস্তুত হইতে অনেক সময় যায়। যাহারা সাপ নাচায় তাহারা জানে, সাপটা কখন কোন ভঙ্গী করিবে। তাহাতেই তাহারা সাবধান হইতে পারে। গোখুরা সাপের বিষের ভাল ঔষধ আজও বাহির হয় নাই।

সাপুড়িয়ারা বোকা লোকদের অনেক রকমে ঠকায়। একটা পোষা সাপ নিজের কাছে লুকাইয়া রাখে, তাহার বিষের কোষ তুলিয়া ফেলে। পরে নূতন যায়গায় গিয়া মাটী খুঁড়িয়া সাপ বাহির করিবার ভাণ করিয়া পোষা সাপটা, গর্ত্ত হইতে বাহির করে ও সেটাকে দিয়া নিজের শরীরে দংশন করায়। পরে "আমায় সাপে কামড়াইয়াছে আমি মরিলাম" বলিয়া ঢলিয়া পড়ে। লোকে ব্যস্ত হইয়া তাহার নিকট দৌড়িয়া যায়, তখন সে বলে "আমার কোমরে মাদুলি আছে শীঘ্র সেটা ছিঁড়িয়া ক্ষত স্থানে লাগাও" লোকে তাহাই করে। খানিক পরে সে সুস্থ হইয়া উঠে ও মাদুলির প্রশংসা করে। লোকে তাহাই বিশ্বাস করিয়া অনেক টাকা দিয়া সেই মাদুলি কিনিয়া ঠকে।

এই জন্য ইহার নাম 'র‍্যাটেল স্নেক'। এই বাটী গুলি শুষ্ক থাকিলেই শব্দ হয়। জলে ভিজিলে আর শব্দ হয় না। ইহারা খরগোস, কাঠবিড়াল ইন্দুর প্রভৃতি ধরিয়া খায়। ইহারা আমাদের দেশের উলুবোড়ার জাত। ইহারা কুণ্ডলি না করিলে কামড়াইতে পারে না, এবং সহজে কাহাকেও কামড়ায় না। ইহাদের দুই হাত দুর দিয়া লোক চলিয়া গেলেও কিছু বলে না; তবে কামড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কোন সাপের বিষই গোখুরার বিষের মত তীব্র নয়। সব বিষধর সাপের বিষ, উপরের চোয়ালে বড় বড় দুইটা দাঁতের গোড়ায়, পেঁয়াজের কোয়ার মত দুইটা থলের ভিতর থাকে। ঐ থলের ভিতর বিষ জন্মায়। দাঁতে লম্বালম্বি এপার ওপার ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র, বিষের থলের সহিত সংযুক্ত। সাপ রাগিয়া

আমাদের দেশে নির্বিষ অনেক সাপ আছে, তার মধ্যে আমরা সচরাচর দেখিতে পাই—হেলে সাপ ও ঢোঁড়া সাপ। হেলে সাপ দেখিতে

খুব সুন্দর। ইহাদিগকে নির্ভয়ে ধরা যায়। ইহারা কামড়ায় না। ব্যাং প্রভৃতি ধরিয়া খায়। ঢোঁড়া সাপ জলে থাকে। মাছ, ব্যাং, ইন্দুর প্রভৃতি ধরিয়া খায়।

তোমরা অনেকেই হয়ত হেলে প্রভৃতি সাপকে ব্যাং ধরিয়া খাইতে দেখিয়াছ। সাপের মুখ, গলা ও পেট কত সরু আর ব্যাংটা কত বড়, অথচ সাপ সেই ব্যাংটাকে গিলিয়া ফেলে! সাপের মুখের গঠন এমনি যে, ইহারা উপরে নীচে, আশে পাশে মুখটাকে অনেক খানি
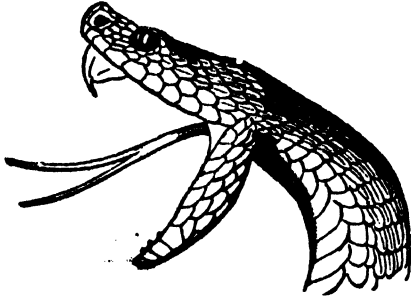
র‍্যাটেল স্নেকের বিষ দাঁত।

ফাঁক করিতে পারে। শরীরও রবরের মত, আবশ্যক মত বাড়িয়া যায়। ইহাদের দাঁতও এমন ভাবে গঠিত যে. এক বার শিকার মুখে ধরিলে, তাহার আর পলাইবার যো থাকে না। এমন কি সাপ নিজে ইচ্ছা করিয়াও মুখ হইতে শিকার বাহির করিয়া দিতে পারেনা, ক্রমাগত গিলিতে বাধ্য হয়।

সকল সাপের চেয়ে পাহাড়ী বোড়াসাপ খুব বড়। ইহাদের মত বড় সাপ পৃথিবীতে আর নাই। ইহাদিগকে অজগর বলে। অজগর অর্থে ছাগল ভক্ষণ-কারী সাপ। আসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় অনেক পাহাড়ী বোড়া আছে। আমাদের দেশের পাহাড়ী বোড়া সেই সকলের অপেক্ষা বড়। ইহারা ছাগল, ভেড়া, বানর ও হরিণ, যাহা সহজে গিলিতে পারে, এরূপ জন্তু ধরিয়া খায়। কখন কখন বাঘ ধরিয়া খাইতেও দেখা গিয়াছে। বড় বড় মহিষ ধরিয়া চাপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাহা গিলে কিনা সন্দেহ। আবার অনেক আষাঢ়ে গল্পও প্রচলিত আছে, যেমন—ইহারা বড় বড় হাতী গিলিয়া ফেলে, ছোট নৌকাতে

পাহাড়ী বোড়াসাপ।

কয়েক জন ঘুমাইতেছিল, নৌকা শুদ্ধ গিলিয়া ফেলিল—এ সকল বানান গল্প।

সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গেলে আবার নূতন দাঁত গজায়। বিষ দাঁত ছাড়া, মুখে অন্য দাঁতও থাকে তাহাতে আহারের কার্য্য হয়। সাপ উপরি উপরি দু তিন বার বিষ ঢালিলে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে অনায়াসে ধরা যায়, আর বড় কামড়াইতে উদ্যত হয় না। সকল সাপেই খোলস্ বদলায়। নীচে নূতন চামড়া জন্মিলে শরীরের উপরের চামড়া ক্রমে শরীর হইতে আলগা হইয়া যায় ও মাথার কাছে ফাটিয়া যায়। সাপ সেইখান দিয়া আপনার শরীরটাকে বাহির করিয়া লয়।
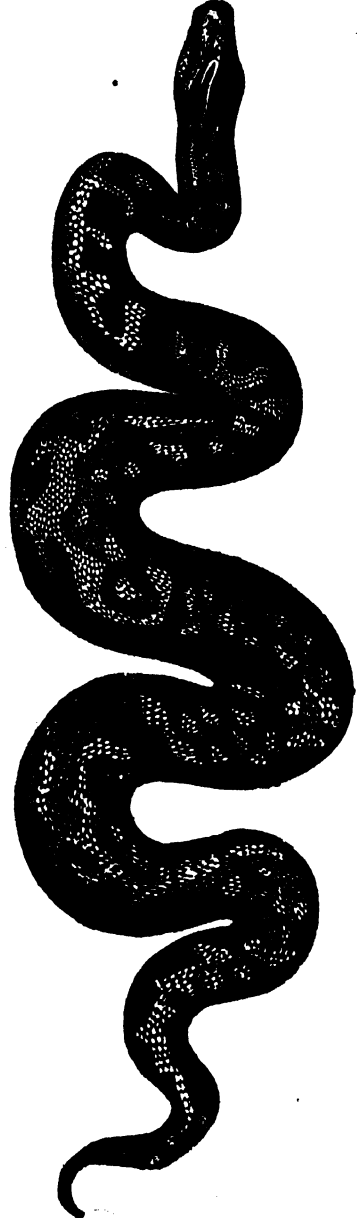
পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় সাপের মুখের ছবিতে তাহার জিহ্বার আকৃতি দেখিয়াছ। দেখিয়া বোধ হয় যেন সাপের দুইটা জিহ্বা, কিন্তু তাহা নয়, সাপের জিহ্বা খুব সরু ও লম্বা এবং মাথার দিকটা চেরা। আমরা হাতের দ্বারা যেমন স্পর্শ করি, বিড়ালেরা যেমন তাহাদের মুখের উপরের বড় বড় লোমের স্পর্শে সহজে সমস্ত অনুভব করিতে পারে, সাপেরাও তেমনি তাহাদের এই জিহ্বার স্পর্শে অতি সহজেই অনুভব করিতে পারে, এবং এই জন্যই সাপেরা চলিবার সময় ক্রমাগত জিহ্বা বাহির করিতে থাকে।

বোড়া সাপ সচরাচর দশ পনের হাত লম্বা ও বাঁশ বা মানুষের উরুর মত মোটা হয়। কিন্তু ২০।২৫ হাত লম্বা ও মানুষের শরীরের মত মোটা পাহাড়ে বোড়া সাপের কথাও কখন কখন শুনিতে পাওয়া যায়। হিমালয় পর্ব্বতে, দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ে জায়গায়, আসাম ও সুন্দর বনের জঙ্গলে অনেক পাহাড়ী বোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা গাছেই থাকে ও আশ্চর্য্য কৌশলে শিকার ধরে। গাছের ডালে লেজ জড়াইয়া, মাথা নীচু করিয়া ঝুলিতে থাকে, একটুও নড়ে চড়ে না। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, গাছের ডাল বা কোন লতা গাছে জড়াইয়া আছে। কোন জন্তু নিকটে আসিলে, অমনি একটু দুলিয়া, বিদ্যুৎ বেগে তাহার উপর গিয়া পড়ে এবং ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের শরীরে জড়াইয়া চাপিয়া ধরে। শিকারটা প্রাণপণ টানাটানি করিয়াও তাহার নিকট হইতে পলাইতে পারে না। সাপটা শিকারের পেট জড়াইয়া ধরিয়া এমন জোরে কসিতে থাকে যে, তাহাতেই তাহার অস্থি পঞ্জর ভাঙ্গিয়া যায়।

তাহার পর সেই জন্তুটাকে আস্ত গিলিতে আরম্ভ করে। গিলিবার সময়ে ইহাদের মুখ হইতে

অনেক 'লালা' বাহির হইতে থাকে, তাহাতে শিকারের শরীর পিছল হইয়া যায় ও ইহাদের গিলিবার সুবিধা হয়। শিকারটি একটু বড় হইলে, শিং, চুল প্রভৃতি সমেত গিলিতে ইহাদের কিছু কষ্ট হয়। একটা বড় শিকার গিলিতে এক ঘণ্টা হইতে ছয় সাত ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগে। শিকার গিলিয়া ইহারা সহজে আর নড়িতে চড়িতে পারে না। ছয় সাত দিন এক স্থানে পড়িয়া থাকে। সে সময়ে ইহাদিগকে সহজেই মারা যায়।

একবার এই দেশের কোন নগরের বাহিরে কতকগুলি লোক কাঠ কাটিতে গিয়াছিল। দুই প্রহরের সময়ে তাহারা একটা খুব বড় গাছের তলায়, সেই গাছের একটা মোটা শিকড়ের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিল ও গল্প করিতেছিল। তামাক খাওয়া হইলে, 'কল্‌কে' হইতে আগুন ঢালিয়া, সেই শিকড়ের উপর রাখিল। কিছুক্ষণ পরে, শিকড় মনে করিয়া যাহার উপর তাহারা বসিয়াছিল, তাহা হঠাৎ নড়িয়া উঠায় তাহারা চমকিয়া উঠিল। তার পর একটু মনোযোগ করিয়া যখন দেখিল, তখন বুঝিল, সেটি গাছের শিকড় নহে, অন্য কিছু; কোন জীবিত প্রাণী হইবে। তখন তাহারা নগরে দৌড়িয়া গিয়া ইহার বিষয় বলিলে, অনেক লোক তাহা দেখিতে আসিল এবং সেই 'শিকড়টাকে' অনেক টানাটানি করিয়াও কিছুতেই সরাইতে পারিল না। তখন তাহার তলা দিয়া, খুব মোটা একটা দড়ি চালাইয়া দিয়া, খুব কসিয়া বাঁধিল এবং সেই দড়িটার অন্য দিক, গাছের ডালের সহিত আটকাইয়া দিয়া, সকলে মিলিয়া টানিয়া তুলিতে লাগিল ও একজন লোক আগুন জ্বালিয়া সেই শিকড়ে লাগাইয়া দিল। আগুনের তাপ পাইয়া জিনিসটা খুব নড়িয়া উঠিল, তখন তাহাকে সহজে টানিয়া তোলা গেল। যখন গাছের ডালে ঝুলিতে লাগিল, তখন সকলে দেখিল সেটা গাছের শিকড় নয়, একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ে বোড়া সাপ! শরীরে কাদা লাগিয়া তাহা শুকাইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তাহা সাপের গা বলিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই, এবং পেটের ভিতর কিছু ছিল বলিয়া পেটটা ফুলিয়া এত মোটা হইয়াছিল যে, বোধ হইতেছিল যেন একটা গাছের গুঁড়ি; এবং গাছের তলায় একটা গর্ত্তের মধ্যে মুখ ও শরীরের খানিকটা প্রবেশ করাইয়া দিয়া এমন আটকাইয়াছিল যে, এত চেষ্টাতেও তাহাকে টানিয়া বাহির করিতে পারা যায় নাই।

পেট চিরিয়া দেখা গেল, সাপটা একটা বড় শূয়োর তাহার দুটি বাচ্চা সমেত গিলিয়া বসিয়াছিল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ বসু।

গণকের ছেলে।

(উপকথা)

পূর্ব্বকালে দাক্ষিণাত্যে এক বৃদ্ধ গণক বাস করিতেন। এই গণকের দুই ছেলে ছিল। বড় ছেলের নাম মহীধর, ছোট ছেলের নাম গঙ্গাধর। গণক মৃত্যুকালে তাঁহার সামান্য যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল, তাহা বড় ছেলে মহীধরকেই দিয়া যান। ছোট ছেলেকে বিশেষ কিছুই দেন নাই। কেন দেন নাই তাহা বলা যায় না, তবে লোকে বলে গণক গঙ্গাধরের ভাগ্য গণনা করিয়া বলিয়া ছিলেন,—

জন্মঃপ্রভৃতি দারিদ্র্যং দশবর্ষাণি বন্ধনম্
সমুদ্রতীরে মরণং কিঞ্চিৎ ভোগং ভবিষ্যতি।

এই গণকের গণনার বড় খ্যাতি ছিল। তিনি যাহা গণিয়া বলিতেন, তাহা নাকি কখন মিথ্যা হইত না। গঙ্গাধর মনে মনে ভাবিল "আমার কপালে আর সুখ নাই; জন্মাবধি দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিব, দশবৎসর বন্ধন দশায় থাকিতে হইবে, সমুদ্রতীরে মৃত্যু হইবে, তাহার পর আবার কিঞ্চিৎ সুখভোগও আছে; এইটেই কিছু আশ্চর্য্য কথা। মরেই যদি যাই ত আবার সুখভোগ হবে কি করে?" যাহা হউক সে পিতৃশ্রাদ্ধ শেষ করিয়া তীর্থ করিবার জন্য কাশী যাইবার মনস্থ করিল। দাদার কাছে বিদায় লইয়া সে কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করিল। কয়দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত হাঁটিতে হাঁটিতে গঙ্গাধর বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে পথ চলিতে চলিতে তাহার বড়ই তৃষ্ণা পাইল, নিকটে কোথায়ও জল না পাওয়াতে বড় বিপদে পড়িল। অতি কষ্টে কতকদূর হাঁটিয়া আসিলে পর একটা কূপ দেখিতে পাইল। তাহার সঙ্গে একটা ঘটি ছিল, তাহাই দড়িতে বাঁধিয়া কূপে নামাইয়া দিল। সে যেমন ঘটিটা কতকদূর নামাইয়া দিয়াছে অমনি ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল—"ভাই আমাকে বাঁচাও; আমি বাঘদের রাজা, এই কয় দিন থেকে কূয়োর ভিতর পড়ে ক্ষিদেয় মারা যাচ্ছি। ভাই তুমি যদি আমায় উপরে উঠাও, তা হ'লে তোমার কখনও অনিষ্ট করব না, চিরকাল তোমার বন্ধু হ'য়ে থাক্‌ব।" বাঘের কথা শুনিয়া প্রথমতঃ গঙ্গাধরের বড়ই ভয় হইল; তাহার পর সে মনে মনে ভাবিল, পিতার কথা

মিথ্যা হইবার যো নাই। সমুদ্রতীরে আমার মরণ নিশ্চয়, বাঘের হাতে আমার মরিবার সম্ভাবনা নাই। বাঘ যখন এত ক'য়ে ব'লছে তখন সে আমায় কখনো খেয়ে ফেল্‌বে না।" এই কথা ভাবিয়া সে বাঘকে ঘটিটা শক্ত করিয়া ধরিতে বলিল, বাঘও তাহাই করিল। গঙ্গাধর তখন তাহাকে আস্তে আস্তে টানিয়া উপরে তুলিল। বাঘ উপরে উঠিয়া গঙ্গাধরের কোন অনিষ্ট করিল না,

বরং তাহাকে বলিল,—"ভাই আমি চিরদিন তোমার বন্ধু হ'য়ে রইলাম, যখন তোমার কোন দরকার প'ড়বে, আমাকে এক বার মনে করিলেই আমি তখনি তোমার কাছে এসে হাজির হব। আমি একজন স্বর্ণকারকে তাড়া করেছিলাম, সে দৌড়ে এই কুয়োর ভিতর লাফ দিয়ে পড়েছিল, আমিও তাহার পিছনে পিছনে লাফ দি, কিন্তু কুয়োর ভিতর ঐ যে মোটা কাঠের আগা খানিকটা বেরিয়ে আছে দেখ্‌ছ, ঐটেতে আমি আট্‌কে গিয়েছিলাম, সেই স্বর্ণকার কিন্তু একেবারে নীচে পড়ে গেছে। এই কুয়োর ফাটলের মধ্যে একটা সাপ আর একটা গর্ত্তের মধ্যে একটা ইন্দুর ও আছে, তারাও ক্ষিদেয় ভারি কষ্ট পাচ্ছে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তাদেরও পরে তুলো, কিন্তু ঐ স্বর্ণকারকে কিছুতেই তুলো না, সে বড় দুষ্ট লোক। আমার ভাই বড় ক্ষিদে পেয়েছে, আমি এখন চল্লাম।" এই বলিয়া বাঘ চলিয়া গেল। সেই সাপ এবং ইন্দুরও গঙ্গাধরকে অনেক মিনতি করিতে লাগিল। সে তাহাদিগকেও উপরে উঠাইল। তাহারা ও উপরে উঠিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল এবং বলিল তাহারা চিরদিন তাহার বন্ধু হইয়া থাকিবে এবং সে যখন তাহাদের স্মরণ করিবে তাহারা তখনি তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইবে; কিন্তু তাহারাও দুইজনে স্বর্ণকারকে উঠাইতে বারণ করিল। গঙ্গাধর মনে করিল, স্বর্ণকার বেচারিরই বা দোষ কি? কতকগুলি জন্তুর কথায় একজন মানুষকে কূপের ভিতর ফেলিয়া রাখাটা অন্যায় বিবেচনা করিয়া সে তাহাকেও উপরে উঠাইল। গঙ্গাধর তখন তৃষ্ণায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। সে স্বর্ণকারের সঙ্গে কোন কথা না বলিয়া আবার কূপের ভিতর ঘটিটা নামাইয়া দিল। সেই কূপে জল অল্পই ছিল, তাহাই কোন রকমে উঠাইয়া পান করিল। জল খাইয়া একটু সুস্থির হইলে পর স্বর্ণকার তাহার সমুদয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল এবং সে কোথায় যাইতেছে তাহাও শুনিল। তখন স্বর্ণকার তাহাকে বলিল—"ভাই তুমি আমার পরম বন্ধু। ঐ জানোয়ারদের কথা না শুনে তুমি যে আমার কত উপকার করেছ, তা আর কি বলব। এখান থেকে দশক্রোশ দূরে উজ্জয়িনী নগরে আমার বাড়ী। তুমি কাশী থেকে বাড়ী ফির্‌বার সময় আমার বাড়ী হ'য়ে যেও, তা না হলে আমি ভারি দুঃখিত হব।" এই কথা বলিয়া স্বর্ণকার তাহার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, গঙ্গাধরও কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

সে কাশীতে দশবৎসর থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিল। দশবৎসর পরে তাহার বাড়ী ফিরিবার বড় ইচ্ছা হইল। তাহার পর, দিন স্থির করিয়া কাশী ছাড়িয়া, যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়া চলিল। সে যখন ক্রমে ক্রমে সেই কূপের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার একে একে সেই বাঘ, সাপ ও ইন্দুরের কথা মনে পড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই বাঘ কোথা হইতে একটা সুন্দর রাজমুকুট আনিয়া গঙ্গাধরকে উপহার দিল। গঙ্গাধর দেখিল, মুকুটখানি অতিশয় মূল্যবান, কত মণি মুক্তা বসান, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। সে মুকুটটি পাইয়া, বাঘকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল। বাঘ বলিল, "ভাই আমি মনে করেছিলাম তুমি বুঝি আমায় ভুলে গেছ, আমাকে যে একেবারে ভোল নাই, তাই দেখে ভারি খুসি হ'লাম।" একে একে সেই সাপ এবং ইন্দুর আসিয়াও গঙ্গাধরকে অনেক সুন্দর সুন্দর উপহার দিল। সে তাহাদের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা বলিয়া বিদায় লইল। এবং তার পর স্বর্ণকারের অনুরোধ স্মরণ করিয়া, সে উজ্জয়িনীতে গিয়া তাহার বাড়ীতে অতিথি হইল। স্বর্ণকারও তাহার পুরাতন বন্ধুকে পাইয়া ভারি খুসী হইল এবং তাহাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিল। বাঘ

যে মুকুটটা দিয়াছিল, গঙ্গাধর তাহা স্বর্ণকারকে দেখাইয়া বলিল;—এত বড় মুকুট সে কি করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে, পথে চোর ডাকাতে কাড়িয়া লইতে পারে এবং সেই মুকুট কিনিবার মত উপযুক্ত ক্রেতা পাওয়াও বড় সহজ নয়, সেই জন্য সে স্বর্ণকারকে সেই মুকুটের সোণা ও মণি মুক্তা খুলিয়া বিক্রয় করিয়া দিতে বলিল। স্বর্ণকার ও তাহাতে রাজি হইল।

এদিকে উজ্জয়িনীতে কয়দিন হইল একটা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। উজ্জয়িনীর রাজা মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কে যে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। রাজার ছেলে এখন রাজপাটে বসিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মৃত রাজার হত্যাকারীকে ধরিয়া দিবে, তাহাকে পুরস্কার দেওয়া যাইবে। স্বর্ণকার বেশ বুঝিতে পারিল যে, সেই বাঘই রাজাকে মারিয়া তাঁহার মুকুট আনিয়া গঙ্গাধরকে দিয়াছে। সে পুরস্কারের লোভ ছাড়িতে পারিল না, তাই সে মুকুটটা লইয়া রাজার ছেলেকে দেখাইয়া বলিল যে, গঙ্গাধরই রাজাকে মারিয়া সেই মুকুট লইয়া আসিয়াছে। গঙ্গাধর কোথায় আছে, সে সন্ধানও সে বলিয়া দিল। পেয়াদারা তৎক্ষণাৎ আসিয়া গঙ্গাধরকে বাঁধিয়া রাজার কাছে আনিল। রাজা তাহাকে অন্ধকার কারাগারে রাখিয়া অনাহারে মারিতে হুকুম দিলেন। পেয়াদারা তাহাকে ভয়ানক একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ করিয়া রাখিল। কি দোষে তাহার এই শাস্তি হইল, তাহা সে বেচারী বুঝিতেই পারিল না। সেই অন্ধকার ঘরের ভিতর সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "এত দিনে দেখ্‌ছি বাবার গণনা ফলিল! হায় এখন কি দশ বৎসর এই অবস্থায় পড়ে থাক্‌ব। এখানে ত না খেয়েই মারা যাব।" এই দুরবস্থায় তাহার সেই বাঘ, সাপ ও ইন্দুর বন্ধুদের মনে পড়িল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বাঘ, ও ইন্দুর রাজারা তাহাদের দলবল ও সৈন্য সামন্ত লইয়া সেই কারাগারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ঘরে প্রবেশ করিবার কোন পথ ছিল না। তাই ইন্দুর রাজা তাঁহার সৈন্য দিগকে গর্ত্ত খুঁড়িতে হুকুম দিলেন। তাহারা আধ ঘণ্টার মধ্যে সেই মজবুৎ দেওয়াল ফুটা করিয়া ফেলিল। ইন্দুররাজ ভিতরে প্রবেশ করিয়া গঙ্গাধরের প্রতি অনেক সহানু-

ভূতি জানাইল, এবং বলিল বাঘরাজও বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, তিনিও তাহার দুঃখে বড় দুঃখিত, তাঁহার যে প্রকাণ্ড শরীর, তাই ভিতরে আসিতে পারেন নাই। ইন্দুর আরও বলিল "তোমার কোন ভয় নাই, আমি তোমায় ভাল করে খাওয়াব।" এই বলিয়া সে তাহার অনুচরদিগকে হুকুম করিল, "দেখ ইহাকে দেশের যত ভাল ভাল খাবার, সন্দেশ, রসগোল্লা, লুচি কচুরি প্রভৃতি সব এনে খাওয়াবে।" তাহারাও তাহাই করিল। বেচারার জল খাইবার বড় অসুবিধা, তাই ইন্দুরেরা নেকড়া ভিজাইয়া মুখে করিয়া আনিয়া দিতে লাগিল, সে বেশ চুসিয়া চুসিয়া জল খাইতে লাগিল। সর্পরাজও রাজাকে জব্দ করিবার জন্য বাঘের সহিত পরামর্শ করিল। বাঘের হুকুমে অন্য বাঘেরাও রাজ্যের লোকদিগকে খাইতে আরম্ভ করিল, সাপেরাও যাহাকে পাইল তাহাকেই দংশন করিতে লাগিল। দেশে একটা হুলস্থূল

পড়িয়া গেল। সাপ গঙ্গাধরকে পরামর্শ দিল যে, সে যেন ঘরের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে চিৎকার
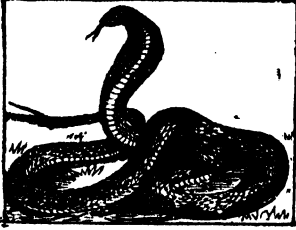
করিয়া বলে "বাঘ রাজাকে খেয়ে ফেল্লে, আর রাজার ছেলে কিনা আমায় বন্ধ ক'রে রাখলে, এম্নি বিচার বটে! দেশে মড়ক হবে না, ভগবান ত দেখ্ছেন?" সাপের কথামত সে মাঝে মাঝে ঐ কথা গুলি চীৎকার করিয়া বলিত, কিন্তু লোকে তাহার কথা শুনিয়াও শুনিত না। এইরূপে যখন দশ বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল এমন সময় একটা সাপ রাজার মেয়েকে কামড়াইল। রাজা কত ওঝা, কত বৈদ্য, আনাইলেন, কিন্তু কেহই তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না। তখন রাজা ঘোষণা করিয়া দিলেন,--"এই মেয়েকে যে বাঁচাইয়া দিবে, আমার রাজ্যের অর্দ্ধেক তাহাকে দিব এবং এই কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিব।" গঙ্গাধর মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া যে সকল কথা বলিত, একজন লোক রাজাকে গিয়া সেই সব কথা বলিয়া দিল। রাজা গঙ্গাধরকে তাঁহার নিকটে আনিতে হুকুম দিলেন। এই দশ বৎসরে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এবং এই দশ বৎসর যখন সে অনাহারেও বাঁচিয়া আছে, তখন সে যে বড় সাধারণ লোক নয়, এই ধারণাটা সকলেরই হইল। রাজা তাহার নিকট করজোড়ে ক্ষমা চাহিলেন এবং তাঁহার কন্যাকে বাঁচাইয়া দিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মৃত ব্যক্তিকে যে প্রকারে বাঁচাইতে হয়, তাহার সাপ ও বাঘ বন্ধুরা তাহাকে তাহা শিখাইয়া দিয়াছিল; সে বলিল, "দেশে যত মড়া আছে আনিতে আজ্ঞা হউক, আমি সকলকেই বাঁচাইয়া দিব।" চারিদিক হইতে গাড়ি গাড়ি মড়া আসিতে লাগিল। সে কেবল ব্যাঘ্ররাজ ও নাগরাজকে স্মরণ করিয়া তাহাদের গায়ে জল ছড়াইয়া দিল, আর তৎক্ষণাৎ সকলে বাঁচিয়া উঠিল। রাজার মেয়েও বাঁচিয়া উঠিল। রাজা আপন কথামত তাহাকে সেই কন্যা ও রাজ্যের অর্দ্ধেক দান করিতে চাহিলেন, এবং সেই দুষ্ট স্বর্ণকারকে ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। সিপাহীরা স্বর্ণকারকে রাজার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজা তাহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু গঙ্গাধর বলিল, "পুরস্কারের লোভে এ ব্যক্তি এই কাজ করেছে হাজার হলেও এ আমার বন্ধু, ইহাকে অনুগ্রহ করে ছেড়ে দিন।" কি রূপে স্বর্ণকারের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল তাহাও সে তখন রাজাকে বলিল। রাজা তখন সেই বিশ্বাস-ঘাতকের দশ বৎসর কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। পরদিন গঙ্গাধর তাহার দাদার সহিত দেখা করিবার জন্য দেশে যাইতে চাহিল এবং ফিরিয়া আসিয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিবে এইকথা বলিয়া সে নিজের দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিল। সে বাড়ী হইতে যে পথে আসিয়াছিল, সে পথে না গিয়া ভুলক্রমে অন্য পথে গিয়াছিল। কয়েকদিন চলিতে চলিতে শেষে সমুদ্রের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। পথে তাহার দাদার সঙ্গে দেখা হইল, তাহার দাদাও এই পথে কাশী যাইতেছিল। অনেক দিন পরে দাদাকে দেখিয়া গঙ্গাধরের এত আনন্দ হইল যে, সেই আনন্দের আবেগে তাহার মৃত্যু হইল। কোথায় ছোট ভাইকে দেখিয়া তাহার দাদার কত সুখ হইবে না একি দুর্দ্দশা হইল। ভাইয়ের শোকে

তাহার আর দুঃখের সীমা রহিল না। সে মৃত ভাইটিকে কাঁধে করিয়া নিকটস্থ দেব মন্দিরে লইয়া গেল এবং সে খানে বসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে ভাইটিকে বাঁচাইবার জন্য ৭ দিন ধরিয়া অনাহারে দেবতার পূজা করিল। তাহার দেবভক্তি ও অসাধারণ ভ্রাতৃস্নেহ দেখিয়া দেবতা গঙ্গাধরকে বাঁচাইয়া দিলেন। গঙ্গাধর পুনরায় জীবিত হইয়া, দাদার সহিত উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া গেল এবং রাজ কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু, বি,এ।

অতি লোভের শাস্তি।

এক যে ছিল নেংটে কুকুর
সে বড্ড গেলো বেড়ে,
খিদিরপুরে থাক্‌তো সাহেব
তার নজরে প'ড়ে।
ভারি যত্ন ক'র্ত্তো সাহেব,
কতই আদর তার,
সাবান দিয়ে স্নান করে সে,
গলায় দেয় 'কলার'।
এক মুঠো ভাত জুঠ্‌তো না তার
(এখন) মিল্‌লো মাংস রাশি,
খেয়ে খেয়ে নেংটে কুকুর
হলেন 'খোদার খাসি'।
(কিন্তু) কেমন স্বভাব এত খেয়েও
আশ্‌ মিট্‌তোনা তার,
খাবার পেলেই, চুরি করে
হ'তো পুলের পার।
এমনিতর একদিন সে
মাংস চুরি ক'রে,
সুযোগ বুঝে বাড়ী থেকে
বেরিয়ে প'ড়্‌লো স'রে।
এক ছুটে উঠ্‌লো গিয়ে
পুকুরের পাড়ে,
(কিন্তু) সেথায় বসা সুবিধে নয়—
পাছে ধরা পড়ে।
(তাই) ভাব্‌লে মনে 'সাঁতার দিয়ে
পুকুর হয়ে পার,
বসে সেথায় মাংস খানা
করিগে সাবাড়।'
(কিন্তু) পুকুরেতে নাম্‌তে গিয়ে
হঠাৎ থেমে গেলো,
জলের ভিতর মাংস মুখে
(এক) কুকুর দেখ্‌তে পেলো।
সে যে নিজের ছায়া, বোকানেংটে
বুঝ্‌তে নাহি পেরে,
(ভাব্‌লে) 'মেরে ওকে মাংস খানা
নিতে হ'লো কেড়ে।'

এই না ভেবে লম্ফ দিয়ে
ধ'ত্তে গেলো তারে,
হা করে কামড়াতে মুখের
মাংস গেলো প'ড়ে।

হাতের জিনিস হারিয়ে ফেল্লে
অধিক আশা ক'রে,
বোকা ব'নে, নেংটতখন
ফিরে গেল ঘরে!

আত্ম-বিসর্জ্জন।

'সখা ও সাথী'র পাঠক পাঠিকা, নীচের ছবিটি দেখে তোমাদের কি কিছু মনে পড়ে? তোমাদের মধ্যে যারা একটু বড় হয়েছ, দু পাঁচ খানি বই পড়েছ, ছবিটি দেখ্‌লে একজন

প্রভুভক্ত অনুচরের প্রভুর প্রাণ রক্ষার জন্য প্রাণদানের কথা হয়ত তাদের স্মরণ হবে। ঘটনাটি পুরাতন হলেও তা আজ আমরা আমাদের ছোট পাঠক পাঠিকাদের কাছে বল্‌ব।

অষ্ট্রিয়া দেশের একজন কাউণ্ট্‌ (খুব ধনী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক) একবার সপরিবারে ক্রাকো হইতে ভিয়ানা নগরে যাচ্ছিলেন। পথের দু'ধার পাহাড় ও বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, আর সেই বন জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুক প্রভৃতি নানা প্রকার হিংস্র জন্তুর ভয় ছিল। কাউণ্ট্‌ যদিও গাড়ীতে যাচ্ছিলেন, তবু বিপদের আশঙ্কায় পূর্ব্বেই সাবধান হ'য়ে যেতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। আত্মরক্ষার জন্য একজন অনুচর বন্দুক ও তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় তাঁদের পিছুপিছু যাচ্ছিল।

অর্দ্ধেকের কিছু বেশী পথ ছেড়ে যেতে না যেতে তাঁরা যা ভয় করেছিলেন, তাই ঘট্‌ল। তাঁদের গাড়ী খুব জোরে চ'লছিল, আর সেই রক্ষক পিছু পিছু কদমে আস্‌ছিল; এমন সময় হঠাৎ একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে পিছু ফিরে যা দেখ্‌তে পেলেন, তাতে কাউণ্ট ও তাঁর স্ত্রীর প্রাণ শুকিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় তাঁদের সেই রক্ষক অনুচর চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"প্রভু, সর্ব্বনাশ হয়েছে, যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে; নেক্‌ড়ের দল পিছু লেগেছে। কিন্তু কোন ভয় নাই, আমি বেঁচে থাক্‌তে এরা আপনাদের হানি করতে পারবে না।"

কোচম্যান তখন ঘোড়ার পিঠে জোরে চাবুক লাগাতে ঘোড়া গাড়ী নিয়ে বিদ্যুত্যের বেগে ছুট্‌ল। কিন্তু সে নেকড়ে বাঘের হাত এড়ান বড় শক্ত। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারা দল শুদ্ধ গাড়ীর কাছে এসে পড়্‌ল। রক্ষক কত বার বন্দুক আওয়াজ কল্লে, কিন্তু নেকড়ের দল ছাড়িবার পাত্র নয়; তাতে তারা আরো যেন ক্ষেপে উঠ্‌ল। সে তখন বুদ্ধি ক'রে তার ঘোড়া সেই নেক্‌ড়েদের মুখে ছেড়ে দিয়ে নিজে গাড়ীর পিছনে উঠে বস্‌ল। বেচারী ঘোড়াটিকে তখন সেই নেক্‌ড়ের দল লোফা লুফি ক'রে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেল্‌লে। এই সুযোগে কাউণ্ট খানিকটা দূর এগিয়ে পড়লেন। এ দিকে সেই নেক্‌ড়ের দল রক্তের আস্বাদ পেয়ে আরো অধিক ক্ষেপে কাউণ্টের গাড়ীর পিছু পিছু ছুট্‌ল। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে, তাঁরা আবার গাড়ী ধর ধর হ'ল। আর এক মিনিটেই হয়ত সকলকেই তাদের হাতে প্রাণ হারাতে হবে। সেই ভয়ঙ্কর রক্ত পিপাসু নেকড়েদের নিশ্বাস

প্রশ্বাস ক্রমে গাড়ীর পিছনে সেই অনুচরের গায়ে লাগ্‌তে লাগল। তখন নিরুপায় দেখে সে বল্লে—"প্রভু, এখন আমার প্রাণ দান ভিন্ন আর রক্ষার উপায় নাই। দেখবেন, আমার স্ত্রীপুত্র যেন অন্নবস্ত্রের কষ্ট না পায়।"

এই ব'লে সে বন্দুক ও তলোয়ার নিয়ে সেই নেকড়ের দলের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল। কাউণ্ট তাকে অনেক নিষেধ কল্লেন, হাত ধ'রে জোর ক'রে রাখবার চেষ্টা ক'রলেন, কিন্তু সে কোন বাধা মান্‌লনা না। খানিকক্ষণ সে নেকড়েদের সঙ্গে ল'ড়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল, তারপর তাদের হাতে তার প্রাণ দিল।" নেকড়ের দল তখন মুখে মুখে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেল্‌ল। এই অবসরে কাউণ্ট একটা গ্রামে পৌছে সপরিবারে রক্ষা পেলেন।

কি আশ্চর্য্য প্রভু ভক্তি, পরহিতে আত্মবিসর্জ্জনের কি সুন্দর ছবি! এ পুণ্য কাহিণী শুন্‌লেও লোকের প্রাণ মন উন্নত হয়। এই ঘটনার পর কাউণ্ট্ সেই প্রভুভক্ত অনুচরের স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিকে আপনার পরিবারের মধ্যে প্রতিপালন করতে লাগলেন; আর তাঁর মৃত্যুর স্থানে একটি সুন্দর সমাধি মন্দির তু'লে, তার উপর সোণার অক্ষরে তার সেই আশ্চর্য্য আত্মবলিদানের কথা লিখে রেখেছিলেন।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন বি, এ।

বণ্টন।

ভাই বোনে সারা বেলা
রোদে রোদে ক'রে খেলা,
ছুটে ছুটে, খুঁটে খুঁটে, ধান কাটা ভুঁয়ে,—
খুঁজে পেতে চারিদিশ
আনিয়া ধানের শিষ,
এক ঠাঁয়ে জড় ক'রে যায় থুয়ে থুয়ে।
চাষা ধান কাটা সেরে
গৃহ পানে যায় ফিরে,
সোণার ছবিটি রবি হেসে বসে পাটে;
মনোসুখে ভাই বোন
দিনের সঞ্চিত ধন
সুবর্ণের শিষগুলি,—ল'য়ে ব'সে বাঁটে।
ভাই শিষ গুলি নিয়ে,
দুই তুপে দিয়ে দিয়ে,
সমান করিয়া দুটি ভাগ সাজাইল,
ভগিনী দেখিয়া তায়
কহে বাণী করুণায়,
—করুণার রাণী যেন করুণা ঢালিল;—

"ননীরে কি গেছ ভুলে
সাথে সে আসেনি ব'লে?
রোগে সে যে ঘরে শুয়ে, খেলেনি ক'দিন,
কুড়াতে পারেনি সেত,
আমরা পেয়েছি এত,
তার ভাগ কই দাদা, সে যে সুখহীন?
আমরা খেলেছি কত,
একেলা সে চেয়ে পথ
কতই ভেবেছে, আহা কাতর মলিন!
তারে যদি নাহি দিবে
বল সে গো কোথা পাবে?
কবে গো হইবে তার খেলিবার দিন!"
শুনে বাণী করুণার,
বুঝি ভুল আপনার,
সোহাগের ভরে বোনে করিল চুম্বন;
তিন গোছা করি ধানে
ল'য়ে গেল গৃহ পানে,
হরষে রোগীও রোগ ভুলিল তখন।

মনে রেখো ভাই বোন,
তোমার সঞ্চিত ধন
কত দীন হীন সনে বেঁটে নিতে হবে;
উপায় নাহিক যার
তার যেন ধারো ধার—
এই ভেবো, তবে আর দুঃখ নাহি রবে।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র মিত্র বি, এল্।

ইন্দুরের কৌশল।

ইন্দুরদের ডিম চুরি করা অভ্যাসটি বিলক্ষণ আছে। কিন্তু একটা ইন্দুরে যে একটা ডিম চুরি করিয়া লইয়া যাইবে, সে ক্ষমতা তাহাদের নাই,—না পারে মুখ দিয়া কামড়াইয়া ধরিতে, না পারে হাতে করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতে। তবে কি করিয় ডিম চুরি করে? ইহাদের সে বড় চমৎকার কৌশল। একটা ইন্দুর হাত পা দিয়া ডিমটাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে আর একটা ইন্দুর তাহার লেজ ধরিয়া টানিতে টানিতে গর্ত্ত পর্য্যন্ত লইয়া যায়. পরে ডিমটাকে ঠেলিয়া গর্ত্তের মধ্যে গড়াইয়া ফেলিয়া দেয়।

রবি বাবুর পত্র।

শ্রাবণ মাসের 'সখা ও সাথী'তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে বাল্য-জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার দু একটি ভ্রম দেখাইয়া রবীন্দ্র বাবু আমাদের যে চিঠী লিখিয়াছেন পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

"আধুনিক কালের শাস্ত্র অনুসারে পিণ্ডদানের পরিবর্ত্তে জীবন বৃত্তান্ত রচনা প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু অনুরাগী ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদের প্রীতি ভাজনের জীবদ্দশাতেই উক্ত বন্ধুকৃত্য আগে ভাগে সারিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, তখন সজীব সশরীরে তাঁহাদের প্রদত্ত সেই অন্তিম সৎকার গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। প্রেতলোকের প্রাপ্য ইহলোকেই আদায় করিতে বসিলে মনে হয় ফাঁকি দেওয়া হইতেছে। ফলতঃ, এখনো আমার জীবন আমারই হস্তে আছে; আশা করি, আরও কিছুকাল থাকিবে; যখনই ইহার অধিকার ত্যাগ করিব তখন সেই পরিত্যক্ত জীবনটাকে লইয়া যাঁহার ধর্ম্মে যাহা বলে তিনি তাহাই করিতে পারেন। আপনারা যখন আমার বাল্য বিবরণ লিখিবেন বলিয়া আমাকে শাসম করিয়া গিয়াছিলেন, তখন তাহার গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করিতে পারিনাই—এবং নিশ্চিন্ত চিত্তে সম্মতি দিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আপনাদের মাসিকপত্রে

প্রবন্ধের শিরোভাগে নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখিয়া সবিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি। ছাপার কালিতে ম্লান না দেখায় এমন উজ্জ্বল নাম অল্পই আছে।

কিন্তু তাহা লইয়া অধিক পরিতাপ করিতে বসিলে অবিনয় প্রকাশ করা হইবে। এক্ষণে কেবল আপনাদের প্রবন্ধের দুই একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

১। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আমি বাহিরের বারান্দায় বেড়াইতেছিলাম, সেইখানে বঙ্কিমের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার কোন নব প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন এমন সময় কন্যা কর্ত্তৃপক্ষের কেহ বঙ্কিমের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরাইতে আসিলে তিনি তাহা লইয়া স্বহস্তে আমার গলে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে দেশের প্রধান লেখকেরা উপস্থিত ছিলেন না—এবং মাল্যদানের দ্বারা বঙ্কিম আমাকে অন্যান্য লেখকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদ দেন নাই।

২। ড্যালহৌসি পাহাড়ে থাকিতে আমার পিতা অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতেন; আমাকে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার জন্য রাত্রি চারিটার সময় উঠাইয়া দিতেন।

৩। শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়কে আপনাদের প্রবন্ধে স্মৃতিরত্ন উপাধি দেওয়া হইয়াছে; নিশ্চয়ই সেটা বিস্মৃতি বশতঃই ঘটিয়াছে।

৪। অভিভাবকগণ যথেষ্ট বাল্যবয়সেই আমাকে স্কুলে দিয়াছিলেন; কিন্তু আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক সঙ্গীগণ আমার পূর্ব্বেই স্কুলে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়াতে আমি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া প্রভৃত শোক প্রকাশ করিয়াছিলাম সে কথা যথার্থ।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ভ্রমগুলি সংশোধন করিবেন।"

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সমালোচনা।

শকুন্তলা—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।

এই ছোট বই খানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে। যাহাদের জন্য বই খানি লেখা হইয়াছে, আশা করি তাহাদের ইহা আরো ভাল লাগিবে। শকুন্তলা হস্তগত হইবামাত্রই আমরা অনেকগুলি বালক বালিকাকে ডাকিয়া পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। পুস্তকের আগা গোড়া তাহারা অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত শুনিয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্যও অসহিষ্ণু হয় নাই। পুস্তকখানি যে বালক বালিকাদের উপযোগী হইয়াছে ও ইহা যে তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই গ্রন্থের শিরোনামে 'বাল্যগ্রন্থাবলী' কথাটি দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। সুকুমারমতি বালক বালিকাদের উপযোগী গল্পের পুস্তকের নিতান্তই অভাব। বিশেষতঃ এরূপ সুমিষ্ট ভাষায়, এমন সুন্দর গল্প লিখিতে পারেন, এরূপ লোকও আমাদের দেশে বিরল। সুতরাং উল্লিখিত শিরোনামটিতে ভবিষ্যতে এরূপ আরো পুস্তক লিখিত হওয়ার যে আশা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হওয়ার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

দ্বাদশ বর্ষ | আশ্বিন ১৩০২ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ছুটি।

১

আয়রে সাধের ছুটি,—

খই ফোটে চড় বড়ে,
ঘোড়া ছোটে ঘোড় দৌড়ে,
তার চেয়েও আয় ছুটে বাড়ী যাবার ছুটি,—
আনন্দেতে উঠ্‌ছে ছুটে আঁখি কোটি কোটি।
আয় ল'য়ে ভালবাসা,
আয় ল'য়ে প্রাণ আশা,
আয় যাই যেথা যেতে প্রাণের বাসনা,
আয় যাই যেথা বিনা মন বসে না।
বরষা গিয়েছে কেটে
আঁধার গিয়েছে টুটে,
আয় তবে দুই দিন ভুলে দুঃখ শোকে,
আয় রব দুই দিন দুজনায় সুখে।

হাসি মুখে হাসি কথা,
ফুটিবে—ছুটিবে সেথা,
জোছনা যেমন ফোটে তরঙ্গ লীলায়,
আয় তবে যাই সেথা, আয়, আয়, আয়।

যেথা জননীর কোলে
খেলেছি সকল ভুলে,
পিতার চরণ তলে বসিয়া যেথায়
কত কথা শুনিতাম,— আয় সেথা আয়।
ভা'য়েরা আসিবে হেসে,
ভগিনী স্নেহেতে ভেসে,
ছুটে এসে কত কথা 'আবোল তাবোল'
সুধাবে সরল প্রাণে যেন রে পাগল!
আয় চ'ড়ে রেল গাড়ী,
নায়ে নিয়ে শত দাঁড়ী,
আয়রে ছুটিয়া,—যাব তোর সাথে আয়,
হেন সুধামাখা স্থান নাহিক ধরায়।
সেথায় ব্যথার ব্যথী,
হৃদয়ের সখা সাথী,
স্নেহময় পরিজন—সকলি সেথায়,
সদা ভরপুর সেথা সুরভি সুধায়।
সেথা প্রবাসীর তরে,
প্রাণ স্নেহে পূর্ণ করে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে সবে পথ পানে চেয়ে,
মিটাবে প্রাণের সাধ স্নেহ প্রীতি দিয়ে।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র মিত্র, বি,এল্।

শিবজী।

(৮৭ পৃষ্ঠার পর)

এই সময় হইতে শিবজীর ক্ষমতা, রাজ্য এবং দুর্গের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। দিল্লির সম্রাট আরংজীব তখন সায়েস্তা খাঁকে দক্ষিণ দেশের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, শিবজীকে একেবারে দমন করিবার আদেশ দেন। সায়েস্তা খাঁ পুনা, চাকনদুর্গ ও অন্য কয়েক স্থান অধিকার করেন এবং শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার সংকল্প করেন। আরংজীবের আদেশে মাড়োয়ারের রাজা যশোবন্ত সিংহ বহু সৈন্য লইয়া সায়েস্তা খাঁর সহিত যোগ দিলেন। মোগল ও রাজপুত সৈন্য পুনা নগরের নিকটে তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতেছিল। যে গৃহে শিবজী বাল্যকালে মাতার সহিত বাস করিতেন, সায়েস্তা খাঁ সেই গৃহেই তখন বাস করিতেছিলেন। সায়েস্তা খাঁ আদেশ করিলেন যে, অনুমতি পত্র বিনা কোন মহারাষ্ট্রীয় পুনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। শিবজী নিকটবর্ত্তী সিংহগড় নামক দুর্গে সসৈন্যে বাস করিতেছিলেন। দিল্লির পুরাতন শিক্ষিত সেনার সহিত তাঁহার সম্মুখ যুদ্ধ করা কোন মতেই সম্ভব নহে; সুতরাং শিবজী বুদ্ধিবল ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষার ও হিন্দুরাজ্য বিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না। শিবজী এক বিবাহের আয়োজন করিলেন। নগরের বাহির হইতে রাত্রে বিবাহের বরযাত্রীরা নগরের মধ্যে আসিবে, সুতরাং সায়েস্তা খাঁর অনুমতি পত্র আবশ্যক। অনুমতি প্রার্থনা করা হইলে জন কয়েক বাদ্যকর, জন কয়েক অস্ত্রধারী পুরুষ, বর ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনদের নগর প্রবেশের অনুমতি হইল। শিবজী তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর ও কয়েকজন সৈন্য লইয়া এই বরযাত্রীদের সহিত মিলিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। সকলেরই ছদ্মবেশ; বাহিরের উৎসবের সুন্দর বেশের নীচে লৌহবর্ম্ম ও অস্ত্র লুক্কায়িত ছিল। বরযাত্রীগণ সায়েস্তা খাঁর বাটীর নিকট দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রায় ত্রিশ জন লোক, খাঁ

সাহেবের গৃহের কাছে লুকাইয়া রহিল। গভীর রাত্রিতে খাঁ সাহেবের গৃহের সকল লোক নিদ্রিত হইলে, সেই গৃহের দেয়ালের গায়ের একটি অতি ছোট জানালা দিয়া সেই ত্রিশ জন লোক, একের স্কন্ধে আর একজন, তার স্কন্ধে আর একজন, এই ভাবে নিঃশব্দে পিপীলিকার সারির ন্যায় সেই গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে সায়েস্তা খাঁর গৃহরক্ষক গণ অনেকেই হত ও আহত হইল। সায়েস্তা
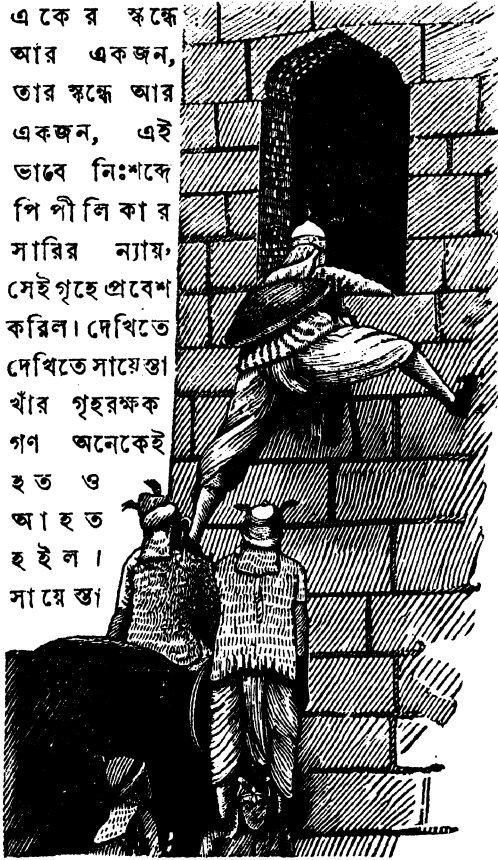
খাঁ নিশ্চিন্তমনে গৃহ মধ্যে সুখে নিদ্রাযাইতে ছিলেন। জাগিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বুঝিলেন আর রক্ষা নাই! তখন তিনি একটি জানালা দিয়া এক গাছি দড়ির সাহায্যে নীচে নামিয়া পলায়ন করিলেন। পলায়নের সময়ে একব্যক্তি তাঁহাকে খড়্গ দ্বারা আঘাৎ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা তাঁহার গায়ে লাগে নাই, একটি মাত্র আঙ্গুল কাটিয়া যায়। সায়েস্তা খাঁর অন্যান্য অনুচরদের সঙ্গে তাঁহার পুত্রও এই রাত্রিতে হত হন। সায়েস্তা খাঁর গৃহ হস্তগত হইল। শিবজী তখন আপন অনুচর দিগকে আর বৃথা হত্যা করিতে নিষেধ করিলেন। যুদ্ধে জয়ী হইবার পর আর নিরর্থক হত্যা করিতে দেখিলে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইতেন।

তারপর শিবজী লোক জন লইয়া সিংহগড়ে প্রস্থান করিলেন। পর দিন ক্রুদ্ধ মোগলগণ সিংহগড় আক্রমণ করিল, কিন্তু কামানের গোলায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া তাহাদের পলায়ন করিতে হইল। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর শিবজী রায়গড় গিয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন।

আরংজীব, তখন মহাবল পরাক্রান্ত অম্বরের রাজা জয়সিংহকে দিলওয়ার খাঁ নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতির সহিত, শিবজীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। জয়সিংহের নাম, সৈন্যসংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, এবং পরাক্রম শিবজীর অবিদিত ছিল না। তাঁহার সহিত যুদ্ধ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, শিবজী বার বার জয়সিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন। পরে শিবজী বিনা যুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। শিবজী মোগল দিগের যে বত্রিশটি দুর্গ জয় করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কুড়িটি সম্রাটের অধীনে ভোগ করিবেন স্বীকার করিয়া বাকী গুলির অধিকার ত্যাগ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই আরংজীব শিবজীকে দিল্লিতে আহ্বান করিলেন। শিবজী জয়সিংহের পরামর্শে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল্লি যাত্রা করিলেন। সম্রাট সেই সময়ে শিবজীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে তাঁহাকে চির-বিশ্বস্ত ভৃত্য করিতে পারিতেন; কিন্তু আপন ক্রূরতা ও ধূর্ত্তবুদ্ধি বশতঃ শিবজীকে বরং অবমাননাই করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই শিবজী বুঝিলেন, আরংজীব তাঁহাকে দিল্লিতে বন্দীভাবে রাখিতে চাহেন। তিনি আর স্বদেশে না যাইতে পারেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কখনও

স্বাধীন না হয়, ইহাই আরংজীবের উদ্দেশ্য। শিবজী সম্রাটের আচরণে অতিশয় রুষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া, দিল্লি হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শিবজী স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পাইবার জন্য, সম্রাটের নিকট আবেদন করিলেন; তাহার অনুমতি সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করিলেন। শিবজীর অনুচরেরা সকলে দিল্লি হইতে প্রস্থান করিবে শুনিয়া, সম্রাট সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাদিগকে অনুমতি পত্র দান করিলেন। শিবজীর অনুচর সংখ্যা যত হ্রাস হয় ততই তাঁহার সুবিধা।

শিবজীও কম চতুর নহেন। হঠাৎ তাঁহার
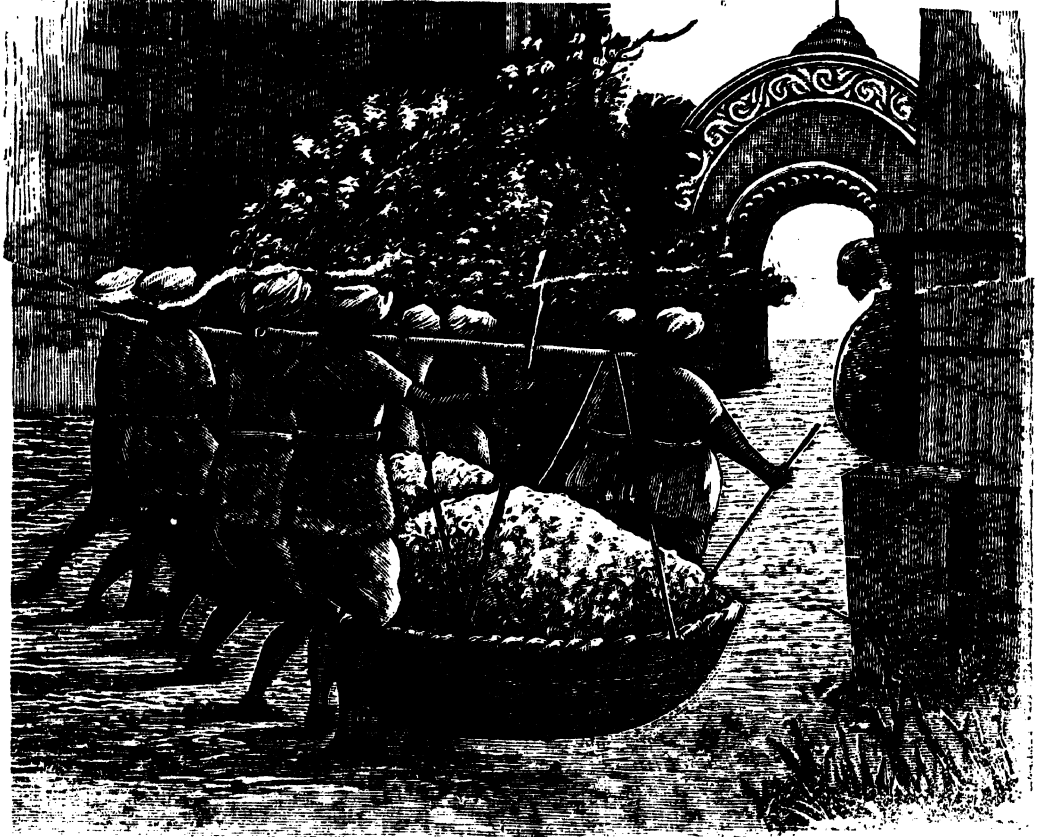
(শিবজীর দিল্লি পরিত্যাগ—১০৯ পৃষ্ঠা।)

কোন উত্তর পাইলেন না, বরং তাহাতে সম্রাটের মনে সন্দেহ হইল। সম্রাট নগরের কোতওয়ালকে আদেশ দিলেন যে, শিবজীর গৃহের চারিদিকে দিবারাত্রি প্রহরী থাকিবে, শিবজী কোথাও গেলে সঙ্গে প্রহরী যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে। শিবজী তখন আপনার অনুচরদিগের দেশে ফিরিয়া যাইবার কি এক পীড়া হইল। অতিশয় সঙ্কট জনক পীড়া হইয়াছে, সমস্ত দিল্লি নগরে এ সংবাদ প্রচারিত হইল। শিবজীর গৃহের জানালা দরজা দিবারাত্রি বন্ধ; চিকিৎসকগণ আসিতেছেন ও যাইতেছেন, শিবজী বাঁচেন কি না সন্দেহ। শিবজী কেমন আছেন, তিনি রক্ষা পাইবেন কি না, কল্য পর্য্যন্ত জীবিত

থাকিবেন কিনা, এইরূপ নানা কথা নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে, ঘাটে সকল সময়ে বলাবলি করিত। কয়েক দিন পরে নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, শিবজীর পীড়ার কিছু উপসম হইয়াছে। নগরে পুনরায় ধূম ধাম পড়িয়া গেল; সকলেই সেই কথা কহিতে লাগিল। রোগ আরোগ্য উপলক্ষে শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে ও দিল্লির সমস্ত বড় লোকের বাড়ীতে রাশি রাশি মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন। মিষ্টান্ন ক্রয় করাইয়া শিবজী নিজের গৃহে আনিতেন, এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাত্রে সেই মিষ্টান্ন নিজে সাজাইয়া পাঠাইয়া দিতেন। এই পাত্র গুলি কখন কখন তিন চারি হাত দীর্ঘ হইত ও তাহা ছয় সাত জন লোকে বহিয়া লইয়া যাইত। কয়েক দিন এইরূপে মিষ্টান্ন বিতরিত হইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ দুইটি প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের পাত্র শিবজীর গৃহ হইতে বাহির হইল। ইহার একপাত্রে শিবজী, পুত্র শম্ভুজীকে বসাইয়া, উপরে মিষ্টান্ন সাজাইয়া দিয়াছিলেন এবং অন্যটিতে নিজে বসিয়া, ভৃত্যদিগের দ্বারা সেইরূপ সাজাইয়া লইয়াছিলেন। বাহকেরা প্রত্যহ যেমন মিষ্টান্ন বিতরণ করিতে লইয়া যায় এ দুটি পাত্রও সেই দিন সেইরূপ লইয়া চলিল। এইরূপে শিবজী চতুরতায় আরংজীবকে পরাস্ত করিয়া দিল্লি হইতে উদ্ধার পাইলেন। দিল্লি হইতে উদ্ধার পাইয়া নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া শিবজী স্বদেশে পৌছিলেন। তার পর নানা রূপ যুদ্ধে মোগল সৈন্য পরাস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে হিন্দু স্বাধীনতা দৃঢ়ীভূত এবং রাজ্য সুশৃঙ্খল করিয়া শিবজী ১৬৮০ খৃঃ কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত, সি,আই,ই।

ইচ্ছা-পূরণ।

সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মত মানুষটি হয় না। সেই জন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্ব্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড় শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াসুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মত দৌড়িতে পারিত, কাজেই কিল চড় চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাৎ যেদিন ধরা পড়িতেন সেদিন তাঁহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেছিল না। তাহার অনেক গুলা কারণ ছিল। একে ত আজ স্কুলে ভুগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও পাড়ার বোসেদের বাড়ী আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধুমধাম চলিতেছে। সুশীলের ইচ্ছা সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া শেষকালে ইস্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে, বিছানায় পড়ে আছিস্ যে? আজ ইস্কুলে যাবিনে!"

সুশীল বলিল, "আমার পেট কামড়াচ্চে, আজ আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।"

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, রোস একে

আজ জব্দ করতে হবে। এই বলিয়া কহিলেন, "পেট কাম্‌ড়াচ্চে? তবে আর তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসেদের বাড়ী বাজি দেখ্‌তে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জন্যে আজ লজঞ্জুস্‌ কিনে রেখেছিলুম, সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক্‌ আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবল চন্দ্র খুব তিতো পাঁচন তৈরি করিয়া আনিতে গেলেন। সুশীল মহা মুস্কিলে পড়িয়া গেল। লজঞ্জুস্‌ সে যেমন ভাল বাসিত পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্ব্বনাশ বোধ হইত। ওদিকে আবার বোসেদের বাড়ী যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তাহাও বুঝি বন্ধ হইল।

সুবল বাবু যখন খুব বড় একবাটি পাঁচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন, সুশীল বিছানা হইতে ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার পেট কাম্‌ড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ ইস্কুলে যাব।"

বাবা বলিলেন, "না না সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এই খেনে চুপ চাপ্‌ করে শুয়ে থাক্‌।" এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল, যে, "আহা, যদি কালই আমার বাবার মত বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখ্‌তে পারে না।"

তাহার বাপ সুবল বাবু বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, যে, "আমার বাপ মা আমাকে বড় বেশি আদর দিতেন বলেই ত আমার ভাল রকম পড়া শুনো কিছু হোল না। আহা, আবার যদি সেই ছেলে বেলা ফিরে পাই তাহলে আর কিছুতে সময় নষ্ট না করে কেবল পড়া শুনো করে নিই।"

ইচ্ছা ঠাকরুণ্‌ সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ভাল, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক্‌।"

এই বলিয়া বাপ্‌কে গিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।" ছেলেকে গিয়া বলিলেন, "কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।"

"তুই পাঁচন খেয়ে এই খেনে চুপ চাপ্‌ করে শুয়ে থাক্‌।"

শুনিয়া দুইজনে ভারি খুসি হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভাল ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটায় ঘুমাইতেন। কিন্তু

আজ তাঁহার কি হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, খুব ছোট হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সব গুলি উঠিয়াছে; মুখের গোঁফ দাড়ি সমস্ত কোথায় গেছে তাহার আর চিহ্ণ নাই। রাত্রে যে ধুতি এবং জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন সকাল বেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে, যে, হাতের দুই আস্তিন প্রায় মাটি

(বৃদ্ধ সুবলচন্দ্রের বাল্যাবস্থা প্রাপ্তি)

পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা বুক পর্য্যন্ত নাবিয়াছে, ধুতির কোঁচাটা এতই লুটাইতেছে, যে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্য দিন ভোরে উঠিয়া চারিদিকে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার আর ঘুম ভাঙ্গে না। যখন তাহার বাপ সুবল চন্দ্রের চেঁচামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল তখন দেখিল কাপড় চোপড় গুলো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে, যে, ছিঁড়িয়া ফাটিয়া কুটি কুটি হইবার যো হইয়াছে; শরীরটা মস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে; কাঁচা পাকা গোঁফে দাড়িতে অর্দ্ধেকটা মুখ দেখাই যায় না; মাথায় এক মাথা চুল ছিল, হাত দিয়া দেখে, সাম্‌নে চুল নাই, পরিষ্কার টাক তক্ তক্ করিতেছে।

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উচ্চৈস্বরে হাই তুলিল; অনেকবার এ পাশ ও পাশ করিল; শেষকালে বাপ সুবলচন্দ্রের গোলেমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুই জনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুস্কিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত, যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মত বড় এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া জলে ঝাঁপ দিয়া কাঁচা আম খাইয়া পাখীর বাচ্ছা পাড়িয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে, যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানা পুকুরটা দেখিয়া মনে হইল, ইহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে। চুপ চাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। একবার মনে হইল, খেলাধূলোগুলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভাল হয় না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক্। এই বলিয়া, কাছে একটা আমড়া গাছে ছিল সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করিল। কাল যে গাছটাতে কাঠবিড়ালীর মত তড়্‌তড়্ করিয়া চড়িতে পারিত আজ বুড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না; নীচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙ্গিয়া গেল এবং বুড়া সুশীল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল তাহারা বুড়োকে ছেলেমানুষের মত গাছে চড়িতে ও পড়িতে

দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সুশীল চন্দ্র লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া আবার সেইদাওয়ায়

(কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করিল।—১১১ পৃষ্ঠা)

মাদুরে আসিয়া বসিল। চাকরকে বলিল. 'ওরে বাজার থেকে এক টাকার লজঞ্জুস্ কিনে আন্।'

লজঞ্জুসের প্রতি সুশীলচন্দ্রের বড় লোভ ছিল। স্কুলের ধারের দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজঞ্জুস্ সাজান দেখিত; দু চার পয়সা যাহা পাইত তাহাতেই লজঞ্জুস্ কিনিয়া খাইত; মনে করিত যখন বাবার মত টাকা হইবে তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজঞ্জুস কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় এক রাশ লজঞ্জুস্ কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পূরিয়া চুষিতে লাগিল; কিন্তু বুড়ার মুখে ছেলেমানুষের লজঞ্জুস্ কিছুতেই ভাল লাগিল না। একবার ভাবিল, এগুলো আমার ছেলে মানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক্, আবার তখনি মনে হইল, না, কাজ নাই, এত লজঞ্জুস খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।

কাল পর্য্যন্ত যে সকল ছেলে সুশীল চন্দ্রের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে, আজ তাহারা সুশীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়ো সুশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল। সুশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মত স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলই ডুডুডুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে; কিন্তু আজ রাখাল, গোপাল, অক্ষয়, নিবারণ হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল; ভাবিল, চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনি বুঝি ছোঁড়াগুলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।

আগেই বলিয়াছি বাবা সুবলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন, 'যখন ছোট ছিলাম তখন দুষ্টামি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি; ছেলে বয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্ত দিন শান্ত শিষ্ট হইয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া কেবলই বই লইয়া পড়া মুখস্থ করি। এমন কি, সন্ধ্যার পরে ঠাকুর মার কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।'

কিন্তু ছেলে বয়স ফিরিয়া পাইয়া সুবলচন্দ্র কিছুতেই স্কুলমুখো হইতে চাহেন না। সুশীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, "বাবা স্কুলে যাবে না?" সুবল মাথা চুলকাইয়া মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, "আজ আমার পেট কামড়াচ্চে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।" সুশীল রাগ করিয়া বলিত, "পার্ব্বে না বৈ কি! ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ওসব জানি!" বাস্তবিক সুশীল এত রকম উপায়ে ইস্কুল পালাইত এবং সে এত অল্প দিনের কথা. যে. তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম্ম নহে। সুশীল জোর করিয়া ক্ষুদ্র বাপটিকে ইস্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। ইস্কুলের ছুটির পরে সুবল

বাড়ী আসিয়া খুব এক চোট্ ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃদ্ধ সুশীলচন্দ্র চোখে চষ্‌মা দিয়া একখানা কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া করিয়া পড়িত, সুবলের ছুটাছুটি গোলমালে তাহার পড়ার ব্যাঘাত হইত। তাই সে জোর করিয়া সুবলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা শ্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁক গুলো এমনি বড় বড় বাছিয়া দিত, যে তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের এক ঘণ্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যা বেলায় বুড়া সুশীলের ঘরে অনেক বুড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত সে সময়টায় সুবলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাষ্টার রাখিয়া দিল; মাষ্টার রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড় কড়াক্কড় ছিল। কারণ, তাহার বাপ সুবল যখন বৃদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার খাওয়া ভাল হজম হইত না, একটু বেশি খাইলেই অম্বল হইত—সুশীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে সেই জন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্পবয়স হইয়া আজ কাল তাঁহার এমনি ক্ষুধা হইয়াছে, যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাঁহাকে যতই অল্প খাইতে দিত, পেটের জ্বালায় তিনি ততই অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল শক্ত ব্যামো হইয়াছে, কেবলি ঔষধ গিলাইতে লাগিল।

বুড়া সুশীলেরও বড় গোল বাধিল। সে তাহার পূর্ব্বাকালের অভ্যাসমত যাহা করে তাহাই তাহার সহ্য হয় না। পূর্ব্বে সে পাড়ায় কোথাও যাত্রা গানের খবর পাইলেই বাড়ী হইতে পালাইয়া হিমে হোক্, বৃষ্টিতে হোক্ সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া সর্দ্দি হইয়া কাশি হইয়া গায়ে মাথায় ব্যথা হইয়া তিন হপ্তা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে আজও তাহাই করিতে গিয়া হাতের গাঁঠ পায়ের গাঁঠ ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল; তাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। তাহার পর হইতে দুই দিন অন্তর সে গরমজলে স্নান করিত এবং সুবলকেও কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্ব্বেকার অভ্যাসমত, ভুলিয়া তক্তপোষ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গুলো টন্ টন্ ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আস্ত পান পুরিয়াই হঠাৎ দেখে দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধ্য। ভুলিয়া চিরুণী ব্রুশ্ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক এক দিন হঠাৎ ভুলিয়া যাইত, যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়া হইয়াছে এবং ভুলিয়া পূর্ব্বের অভ্যাসমত দুষ্টামি করিয়া পাড়ার বুড়ী আন্দিপিসির জলের কলসে হঠাৎ ঠন্ করিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত—বুড়ামানুষের এই ছেলেমানুষী দুষ্টামি দেখিয়া লোকেরা তাহাকে মার্ মার্ করিয়া তাড়াইয়া যাইত, সেও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সুবলচন্দ্রও এক এক দিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত, যে, সে আজকাল ছেলেমানুষ হইয়াছে। আপনাকে পূর্ব্বের মত বুড়া মনে করিয়া যেখানে বুড়ামানুষেরা তাস পাসা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বুড়ার মত কথা বলিত, শুনিয়া সকলেই তাহাকে "যা যা খেলা করগে যা, জ্যাঠামি করতে হবেনা" বলিয়া কাণ্ ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাষ্টারকে গিয়া বলিত, "দাও ত তামাকটা দাও ত খেয়ে নিই।" শুনিয়া মাষ্টার তাহাকে বেঞ্চের উপর একপায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, "ওরে বেজা, ক'দিন আমাকে কামাতে আসিস্ নি কেন?" নাপিত ভাবিত, ছেলেটি খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে, সে উত্তর

দিত, "আর বছর দশেক বাদে আস্‌ব এখন।" আবার, এক এক দিন তাহার পূর্ব্বের অভ্যাস মত তাহার ছেলে সুশীলকে গিয়া মারিত।

সুশীল ভারি রাগ করিয়া বলিত—"পড়াশুনো করে তোমার এই বুদ্ধি হচ্চে! একরত্তি ছেলে হয়ে বুড়োমানুষের গায়ে হাত তোল!"—অমনি চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া কেহ কিল, কেহ চড়, কেহ গালি দিতে আরম্ভ করে!

তখন সুবল একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, 'আহা, যদি আমি আমার ছেলে সুশীলের মত বুড়ো হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।'

সুশীলও প্রতিদিন যোড়হাত করিয়া বলে, 'হে দেবতা, আমার বাপের মত আমাকে ছোট করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা যে রকম দুষ্টামি আরম্ভ করিয়ছেন উঁহাকে আর আমি সামলাইতে পারিনা, সর্ব্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।'

তখন ইচ্ছা ঠাকরুণ আসিয়া বলিলেন, "কেমন, তোমাদের সখ্ মিটিয়াছে?"

তাঁহারা দুইজনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন—"দোহাই ঠাক্রুণ, মিটিয়াছে; এখন, আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও!"

ইচ্ছা ঠাক্রুণ বলিলেন—"আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।"

পরদিন সকালে সুবল পূর্ব্বের মত বুড়া হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুই জনেরই মনে হইল যে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি। সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন, "সুশীল, ব্যাকরণ মুখস্থ করবে না?"

সুশীল মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, "বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে!"

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

কি ক'রে বড়লোক হওয়া যায়।

নেপোলিয়নের গল্প।

চারু—দাদা মশায়, এ কার ছবি?

দাদা—বেশ কথা জিজ্ঞাসা করেছ চারু। এই লোকটিকে আমি বড় ভালবাসি। আজ ঠিক্ একশত বৎসর হইল ইহাঁর যশে পৃথিবী ভরিয়া রহিয়াছে। অনেক সাধুলোক এবং সাধুতার বড়াই করিয়া বেড়ান, এমন অনেক লোক কিন্তু এঁর নামে বড়ই চটা। তাঁরা এঁর নাম শুনিলেই যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন। আমার বিশ্বাস যে, তাঁরা এঁর কথা ভাল জানেন না। তাঁরা এঁর শত্রুদের মুখে এঁর গল্প শুনে অনেক মিথ্যাকে সত্য, দিনকে রাত ঠাওরাইয়া রাখিয়াছেন। তাই তাঁরা এঁর উপর এত চটা। এঁর শত্রুর সংখ্যা অনেক ছিল। আমার এক এক বার মনে হয় যে, যে যত বড় লোক, তার শত্রুর সংখ্যাও বুঝি বা তত বেশী। দেখ, যিশু খৃষ্ট কত বড় লোক ছিলেন, তাঁর শত্রুর সংখ্যাও কত অধিক ছিল। এমন কি তাঁর শত্রুরাত তাঁকে ক্রুশে বিঁধিয়া হত্যাই করিল! শত্রু থাকে না কেবল বোবার। তা নেপোলিয়ন আর যাই হউন, বোবা ছিলেন না।

চারু—এ বুঝি নেপোলিয়নের ছবি, না? তিনি কে ছিলেন দাদা মশায়।

দাদা—নেপোলিয়নের জন্ম ফরাসী দেশে। আজ প্রায় একশত বৎসরেরও কিছু অধিক

হইবে, সে দেশে রাজা ও বড় লোকেরা মিলিয়া গরিবদের উপরে বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন কি গরিব লোকদের দু সন্ধ্যা খাওয়াও জুটিত না। এত বাড়াবাড়ি সহিতে না পারিয়া তাহারা অবশেষে ক্ষেপিয়া উঠিল। রাজা ও বড় বড় লোকদিগের অনেককে ধরিয়া তাহারা মারিয়া ফেলিল, এবং আর আর দেশের গরিবদিগকে তাহাদেরই মত কাজ করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। চারি পাশের রাজারা ইহাদের উপর চটিয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কিন্তু ইহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। তবে এই গোলযোগে ইহাদের মধ্যে আবার যাহারা বড় হইয়া উঠিল, তাহাদের বুদ্ধির দোষে অনেক রকম অত্যাচার হইতে লাগিল। নেপোলিয়ন এই সময়ে আপনার বুদ্ধি বলে আর সাহসের গুণে ফরাসী দেশকে এই দুর্দ্দশার হাত হইতে বাঁচাইয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর গুণে ফরাসীর নাম দেশ বিদেশে ছাইয়া পড়িয়াছিল।

চারু—আচ্ছা দাদামশায়, নেপোলিয়ন ত ছেলেবেলা আমাদেরই মত ছেলেমানুষ ছিলেন। তিনি কিবা খেতেন, কি ক'র্‌তেন, যে অত বড় লোক হয়ে উঠ্‌তে পেরেছিলেন?

দাদা—এ ভাল কথা জিজ্ঞাসা করেছ। তোমরা যা খাও তার বেশী যে তিনি কিছু খেতেন তা নয়। বরং তাঁর বাপের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের অবস্থা এত খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে, খাওয়া দাওয়া বিষয়ে তাঁহাদের কষ্টই হইত বলিতে হয়। তবে তিনি যা করিতেন, সেরূপ যদি তুমিও করিতে পার তবে তুমিও যে দেশের মধ্যে একজন বড় লোক হতে পার, তার সন্দেহ নাই।

নেপোলিয়নের ছেলে বেলা

কি প্রকারে কেটেছিল শোন। তোমার ত এখন ছেলেবেলা, তুমি কি করে সময় কাটাও ভাব দেখি? তোমাকে জোর করিয়া না ধরিয়া রাখিলে তুমি অমনি হয় রাস্তায় ছুটোছুটি কর, নয় তোমার ভাই বোনদের সঙ্গে খেলা কর, এইত? আপন ইচ্ছায় দুদণ্ড বসিয়া একটু রামায়ণ পড়া, একটু ভাল বই পড়া, কিম্বা আমার কাছে বা তোমার বাপ্ মার কাছে কোন ভাল গল্প শুনিতে বসা, এ তোমার কখনও হয় না। ঘরের চেয়ে রাস্তাটা তোমার কাছে বেশী মিষ্টি, আমার কাছে বসার চেয়ে অপরের কাছে বসিতে তোমার বেশী ভাল লাগে, কেমন? দেখ নেপোলিয়নের স্বভাবটা ঠিক্ ইহার উল্টা ছিল। তাঁর আর আর ভাই বোনদের স্বভাব অনেকটা তোমারই মত ছিল। সুযোগ পাইলেই তারা প্রজাপতির পিছনে দৌড়িত বা সকলে মিলিয়া খেলা করিত; তাদের নামও কেহ করেনা। কিন্তু নেপোলিয়ন সময় পাইলেই, তাঁহার মার কাছে যাইয়া উপস্থিত হইতেন কিম্বা তাঁহার বাবার কোল চাপিয়া বসিয়া, তিনি নিজে যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার গল্প শুনিতেন, আর কখনও বা নিজের দেশে পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তার গল্প শুনিতেন। তাঁর ভাই বোনদের স্বাভাবিক গতি ছিল রাস্তা ও মাঠের দিকে, তাঁর স্বাভাবিক গতি ছিল বাপ মায়ের কোলের দিকে। তাঁরাও ছেলে নেপোলিয়নের আগ্রহ দেখিয়া প্রীত হইতেন এবং আদর করিয়া তাহার সব কথার জবাব দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতেন। মাঠের দিকে যে ছেলে ছোটে, সে মেঠো ছেলে হয়, আর পিতা মাতার কোলের দিকে যে ছেলে ছোটে, সে লক্ষ্মী ছেলে হয়। নেপোলিয়ন তাই লক্ষ্মী ছেলে হইয়াছিলেন। আচ্ছা তোমরাও স্কুলে যাও, তোমাদেরকেও ত মাষ্টার মশায় আঁক কষিতে দিয়া থাকেন। নেপোলিয়নের এই আঁক কষার একটা গল্প বলি শোন।

নেপোলিয়ন স্কুলে

সবে তিন বৎসর পড়িতেছেন। তখন তাঁর বয়স ১৪ বৎসর মাত্র। মাষ্টার মহাশয়

একদিন ক্লাসে আসিয়া বলিলেন, 'দেখ আজ একটা খুব শক্ত আঁক দিব। দেখি কে কষিয়া দিতে পারে।' এই বলিয়া বোর্ডে আঁক লিখিয়া দিলেন। আঁকটি শক্ত শুনিয়া কোন কোন ছেলে ত তাহা খাতায়ই তুলিল না; শক্ত আঁক তাদের জন্য নয়, ভাল ছেলেদের জন্য; তারা গল্প করিতে লাগিল। আর যারা ভাল ছেলে ছিল, তারা খানিক ক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই কষিতে না পারিয়া অবশেষে ক্ষান্ত হইল। সে দিনকার কাজ এইরূপেই শেষ হইল। নেপোলিয়ন কিন্তু ছাড়িলেন না। ঘণ্টা খানেক ক্লাশে চেষ্টা করিলেন, হইল না দেখিয়া, স্কুলের ছুটির পর নিজের ঘরে যাইয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে বিরক্ত না করে, এমন কি খাওয়ার নিমিত্তও যাহাতে তাঁহাকে ঘর ছাড়িতে না হয়, তার জন্য চাকরাণীকে তাঁহার খাবার ঘরে আনিয়া দিতে বলিয়া তিনি আঁকের পিছনে লাগিলেন। সে দিন কাটিয়া গেল, সারা রাত্রি কাটিয়া গেল, তার পর দিন কাটিয়া গেল, তার পর রাত্রি কাটিয়া গেল, আর এক দিন রাত্রি কাটিল. নেপোলিয়নের চক্ষে ঘুম নাই, অন্য কথা নাই, অন্য চিন্তা নাই! অবশেষে ৭২ ঘণ্টা ক্রমাগত চেষ্টার পর আঁকটি মিলিল। নেপোলিয়ন তখন মাষ্টার মহাশয়ের নিকট যাইয়া আঁকটি কষিয়া দিয়া আসিলেন। কেমন নাছোড় বান্দা দেখিলে? অত শক্ত আঁক তোমাদের কষিতে হয় না। কিন্তু যে সব আঁক তোমাদিগকে দেওয়া হয়, তার জন্য কি তোমাদের মনে কোন রূপ জেদ জন্মে? এ কাজ করিবই, এ পড়া শিখিবই, এমন জেদ যদি না জন্মিল, তবে শিখিবেই বা কিরূপে আর করিবেই বা কি? নেপোলিয়নের এ গুণটা পূর্ণমাত্রায় ছিল। যে কাজ ধরিতেন সে কাজ করিতেন। তার জন্য যা কষ্ট সহিতে হইত, সহিতেন। এমন কি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত সে জন্য ত্যাগ করিতে হইলে তাহাতে বিমুখ হইতেন না। আর তোমরা সব কেমন ছেলে? আস্‌ছে আসুক, যাচ্ছে যাক্, হচ্ছে হোক্, কিছুই যেন গ্রাহ্য নাই। এটা করতেই হবে, এটা শিখ্‌তেই হবে, এটা জান্‌তেই হবে—যায় খেলা যাক্, যায় ছুটো ছুটি যাক্, আমার কাজ আমি ছাড়িব না—মনের এইরূপ জোর ছিল বলিয়াই নেপোলিয়ন বড় হইয়াছিলেন। এই রূপ মনের জোর যার জন্মায়, সেই বড় লোক হইতে পারে।

শ্রীকালীশঙ্কর সুকুল, এম্, এ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।

রাম শর্ম্মা ও খুদিরাম।

রাম শর্ম্মা বিদ্যাভিমানী বামনপণ্ডিত, খুদিরাম অশিক্ষিত, নৌকার মাঝি। পণ্ডিত মহাশয় তাহার নৌকা ভাড়া করিয়া শিষ্যবাড়ী যাইতেছেন। বিদ্যা জিনিসটা বড়ই গুরুপাক. সকল লোকে ইহা পেটে রাখিতে পারে না। পণ্ডিত মহাশয়েরও এই রোগটা বিলক্ষণ ছিল। আর কাহাকেও না পাইয়া, তিনি গরীব বেচারী খুদিরামের নিকটেই বিদ্যা জাহির করিতে লাগিলেন। রাম শর্ম্মা বলিলেন, "ওরে মাঝি. জোয়ার ভাঁটা কেন হয় বলিতে পারিস্?" খুদিরাম বলিল, "ঠাকুর আমরা মূর্খ লোক অত জানব কি কোরে। জোয়ারে আসি, ভাঁটায় যাই, এই মাত্র জানি।" পণ্ডিত কিছু দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তবেত তোর জীবনের চারি আনাই বৃথা গিয়াছে।" খুদিরাম শুনিয়া কিছুই বলিল না, আপন মনে নৌকা বাহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিত আবার বলিলেন, "ওরে মাঝি, দিবা রাত্রি কেন হয় কিছু

জানিস্ ?" এবারেও খুদিরাম বিনীত ভাবে বলিল, "ঠাকুর মহাশয়, এত সব জানিলে আমরা ছোট লোক হইব কেন ? দিন যায়, রাত্রি হয়, আমরা ইহাই দেখি, কেন হয় কিছুই বলিতে পারিনা।" পণ্ডিত এবার কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যা বেটা, তোর জীবনের আট আনাই বৃথা গিয়াছে।" খুদিরাম এবারেও চুপ করিয়া নৌকা বাহিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিত আবার বলিলেন, "ওরে মাঝি, ঝড় বৃষ্টি কেন হয় জানিস্ ?" এবারে খুদিরাম একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "বলি ঠাকুর মহাশয়, বার বার কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি যদি এত সবই জানিব, তবে ত পণ্ডিতই হইতাম।" রামশর্ম্মা খুদিরামের মূর্খতা দেখিয়া এবারে রাগিয়া বলিলেন, "যা বেটা, তোর জীবনের বার আনাই বৃথা গিয়াছে।" -"গিয়াছে তো গিয়াছে, বেশ হইয়াছে" একটু রাগের সহিত এই কথা বলিয়া খুদিরাম পাড়ী ধরিল।

ক্ষুদ্র নৌকা খানি বিদ্যার বোঝা রাম শর্ম্মাকে লইয়া মাঝ খানে উপস্থিত হইলে, বায়ুদেব কিছু উগ্র হইয়া উঠিলেন। প্রথমে জলটি কাঁপিল, ক্রমে ছোটর পরে বড়, আরো বড়, আরো বড় ঢেউ উঠিয়া নৌকা খানিকে নাচাইতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় নদীর দিকে তাকাইয়া চক্ষে সরিষা ফুল দেখিতে লাগিলেন। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে একবার হরিনাম ও একবার খুদিরামের নাম করিতে লাগিলেন। বুঝি শিষ্য বাড়ী যাওয়া এই থানেই শেষ হয়। পণ্ডিত কাঁদিয়া বলিলেন, "মাঝি, বাবা কি হবে, এখন উপায় কি ?" খুদিরাম বলিল "ঠাকুর মহাশয় আপনি সাঁতার জানেন ?" কাঁপিতে কাঁপিতে পণ্ডিত বলিলেন, "না বাবা আমি আদবে সাঁতার জানি না।" তখন গায়ের ঝাল মিটাইয়া খুদিরাম বলিল, "মহাশয় তবে ত আপনার জীবনের ষোল আনাই বৃথা যায় দেখিতেছি!"

তীরের কিছু দূরে থাকিতে নৌকা খানি ডুবিল। বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত মহাশয়ের টিকি তল হইতেছে দেখিয়া, খুদিরাম তাঁহাকে চুলে ধরিয়া টানিয়া উঠাইল। কিছু কাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, "খুদিরাম তুমি আমাকে বাঁচাইলে; সংসারে আমার মত মূর্খ অনেক আছে, যাহাদের কার্য্যকরী শক্তি নাই, অথচ বৃথা জ্ঞানের বড়াই আছে।

সাক্ষী ও হাকিম।

(১)

হাকিম। এই মোকদ্দমার আসামী রামধনকে তুমি চেন ?

সাক্ষী। আজ্ঞে হুজুর।

হা। ইহার বাড়ী জান ?

সা। আজ্ঞে হুজুর।

হা। সহর হইতে ইহার বাড়ী কত ক্ষণ ?

সা। আজ্ঞে নৌকায় কি হেঁটে ?

হা। হেঁটে যাওয়ায় ত সুবিধা নাই, নৌকার কথা বল।

সা। হুজুর, কত বড় নৌকা।

হা। মনে কর ছোট ডিঙ্গি নৌকা।

সা। হুজুর, কয়জন দাঁড়ি ?

হা। ধর যেন দুইজন ?

সা। আজ্ঞে উজান কি ভাঁটি ?

হা। ভাঁটিই ধরে নেও।

সা। বাতাস উজান কি পিঠান ?

হা। (বিরক্ত হইয়া) ধরে নে যেন বাতাসও পিঠান।

সা। (হাত যোড় করিয়া) ধর্ম্মাবতার! এমন সুবিধায় আমি কখনও যাই নাই।

(২)

হাকিম। তোর নাম কি রে?

সাক্ষী। আজ্ঞে, রামকান্ত।

হা। বয়স কত?

সা। আজ্ঞে চৌদ্দবৎসর।

হা। সেকি? প্রকাণ্ড দাড়ি গোঁফ, তোর বয়স চৌদ্দ বৎসর? ক্ষেপা নাকি? পঁচিশ বৎসরের কম ত কোন মতেই নয়।

সা। (করযোড়ে) আজ্ঞে আপনার কথার চেয়ে কি আমার কথা বড়? না আপনার চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশী? হুজুর যা বোঝেন তাই লিখুন।

হা। আচ্ছা আমি ২৫ বৎসরই লিখিলাম। এখন বল্ তোর বাপের নাম কি?

সা। (নিরুত্তর।)

হা। (সক্রোধে) আদালতের সময় বৃথা নষ্ট করিতেছিস, শীঘ্র তোর বাপের নাম বল্‌না, চুপ করে থাক্‌লি যে?

সা। (করযোড়ে) আজ্ঞে হুজুর, আমার কাছে আর জিজ্ঞাসা কেন? আমি যাহা বলি, আপনি ত তাহা বিশ্বাস করেন না? সুতরাং আপনার ইচ্ছামত যে কোন একটা নাম লিখিয়া লউন

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

সুন্দর বনে সাতবৎসর।

কয়েকদিন ধরিয়া একটা বাঘ আমাদের বাড়ীর কাছে ভারি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। রাত্রিতে তাহার ভয়ে আমাদিগকে শশব্যস্ত থাকিতে হয়; কখন ঘরের কানা'চে কোন ছোট জন্তুর উপর লাফাইয়া পড়িতেছে, কখন উঠানের উপর দাঁড়াইয়াই ডাক ছাড়িতেছে। সকালে উঠিয়া প্রতিদিনই দেখিতে পাই, এখানে একটা হরিণের মাথা, ওখানে দুটো শূয়োরের দাঁত, কোথাও বা একটা মহিষের মাথা। দিনকতক বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বাঘটাকে মারিবার জন্য খুব চেষ্টা হইতে লাগিল, তীর ধনুক ও বন্দুক লইয়া সকলে ফিরিতে লাগিল; কিন্তু সে এমন সতর্ক ভাবে চলাফেরা করিত যে, কোন মতেই তাকে মারিতে পারা গেল না। মনু ও আমিও তীর ধনুক ও বন্দুক লইয়া সর্ব্বদা ফিরিতাম। একদিন একটা ঝোপের কাছ দিয়া আমরা যাইতেছি, এমন সময় ঝোপের আড়ালে পায়ের শব্দ পাইয়া আমরা মনে করিলাম, বোধ হয় বাঘ যাইতেছে। বন্দুক বোঝাই ছিল, ঠিক করিয়া হাতে লইয়া ঝোপের ভিতর দিয়া উকি মারিয়া দেখিতে গেলাম; কিন্তু দেখিলাম বাঘ নয় একটা গণ্ডার। যথা লাভ, আর গণ্ডারও বড় সাধারণ শিকার নয়, গণ্ডার গণ্ডারই সই। মনু বলিল, 'খুব আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে এস, একটু ঘুরে গিয়ে গুলি করতে হবে।' আমি দেখিলাম, সেই ঝোপের আড়াল থেকে গুলি করাই সুবিধা, আমরা গণ্ডারটাকে বেশ দেখিতে পাইতেছি, অথচ সে আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছে না। কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, নির্ব্বিঘ্নে গুলি করা যাইবে। মনুকে সে কথা বলায় সে বলিল, 'সে কি! তুমি কি জাননা যে, গণ্ডারের চামড়া এত পুরু যে তাতে গুলি বসে না? এখান থেকে ওর শরীরের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে, গুলি করলে সে গুলি ওর গায়ে বস্‌বেনা অথচ বন্দুকের আওয়াজে শিকার পালাবে। গণ্ডারকে

মারতে হ'লে ওর নাকের ভিতর দিয়ে গুলি করতে হয়, কাজেই ঘুরে সুমুখ দিকে না গেলে ওকে মারতে পারা যাবে না।' এই বলিয়া মনু আগে চলিল, আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম এবং এমন একটি যায়গায় গিয়া দাঁড়াইলাম, যেখান থেকে গণ্ডারের নাকটি বেশ লক্ষ্য হয়। তখন মনু আমাকে গুলি করিতে বলিল; অত বড় একটা জানোয়ার শিকার করিয়া একটু যশ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার না হইয়াছিল, তা নয়; কিন্তু আমার হাত তখনও খুব সই হয় নাই, বিশেষ অত বড় শরীরটি সমস্তই বাদ দিয়া, কোথায় নাকের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র, সেইখানে গুলি করিতে হইবে। কাজেই আমি রাজি হইলাম না। তখন মনু বলিল, 'তবে বন্দুকটা ঠিক করিয়া দাঁড়াও, যদি গুলি নাকে না লাগে এবং আমাদের দিকে রোখ্ করিয়া আসে, তবে আর রক্ষা থাক্‌বে না।' এই বলিয়া সে বন্দুক সই করিল। গণ্ডারটা চোখ বুজিয়া ছিল, আমাদিগকে দেখিতেও পায় নাই; আমরা মনে করিলাম ভারি সুবিধাই হইয়াছে। গণ্ডারটা আমদের দেখিতে পায় নাই বটে, কিন্তু তার শরীরের উপর গোটা কতক পাখী বসিয়াছিল,

তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া ভারি ডাকাডাকি আরম্ভ করিল; শেষটা ডাকাডাকি ছাড়িয়া গণ্ডারটার চোখে মুখে পাখার ঝাপ্‌টা মারিতে লাগিল। ঝাপ্‌টা খাইয়া গণ্ডারটা তখন চোখ খুলিল। চোখ খুলিয়াই আমাদিগকে দেখিয়া দৌড়। মনু যদিও ঠিক সেই সময়েই বন্দুকের ঘোড়া টানিয়াছিল, কিন্তু গুলি সে পর্য্যন্ত পৌছিতে না পৌছিতে গণ্ডারটা সরিয়া যাওয়ায় গুলিও লাগিল না, শিকারও পলাইল। বেলা তখন অনেক হইয়াছে, কাজেই সেদিনকার মত আমাদের বাড়ী ফিরিতে হইল।

বাড়ী ফিরিয়া গেলে, মনুর বাপ জিজ্ঞাসা করিল, 'কিগো আজ কি শিকার কল্লে।' আমরা সকল ঘটনা তাকে বলিলাম এবং এমন শিকারটা পাখী গুলার জ্বালায় হাত ছাড়া হইল বলিয়া ভারি দুঃখ প্রকাশ করিলাম। মনুর বাপ সেই কথা শুনিয়া বলিল, 'অমন প্রায়ই হয়, কেবল গণ্ডার কেন, পাখীর জ্বালায় অনেক শিকার ঐ রকম ক'রে হাত ছাড়া হয়। গণ্ডারের গায়ে এক রকম খুব ছোট ছোট কীট আছে; তারা গণ্ডারকে বড় যাতনা দেয়। পাখীরা সেই কীট ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে খায়; ইহাতে গণ্ডারেরও উপকার হয়, তাদেরও পেট ভরে। শুধু শরীরে নয়, নাকের মধ্যে, চোখের কোনে, কানের বা মুখের ভিতর হতেও ইহারা ঐ কীট খুঁটে বাহির করে। চোখ বা কান প্রভৃতি নরম যায়গা থেকে কীট বাহির করবার সময় গণ্ডাদের সময় সময় বেশ্ একটু যাতনা পেতে হয়, কিন্তু কীটের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য তারা সে কষ্ট সহ্য ক'রে থাকে। এই পাখীরা যে কেবল কীটের হাত থেকে গণ্ডারকে রক্ষা করে তা নয়, মানুষের হাত থেকেও এদের রক্ষা করে। যখনই গণ্ডারের কোন বিপদ দেখে, তখনই ইহারা খুব চীৎকার আরম্ভ করে

এবং তাতেও গণ্ডারের যদি হুঁশ না হয়, তবে চোখে মুখে ঝাপ্‌টা মেরে তার হুঁশ করায়। গণ্ডার তখন বিপদ বুঝ্‌তে পেরে পলায়।

গোরু মহিষ প্রভৃতির গায়ে ও মাথায় ব'সে এক রকম পাখীকে তোমরা ঠোক্‌রাতে দেখে

থাকবে। তাদেরও ঐ কাজ। গোরু বা মহিষের গায়েও এক রকম কীট আছে, তারা এদের বড়ই যাতনা দেয়। পাখীরা ঐ সকল কীট ঠোক্‌রাইয়া খায় এবং কোন বিপদের আশঙ্কা দেখ্‌লে, তারা ঐ রকম ক'রে গোরু মহিষ প্রভৃতিকে সতর্ক ক'রে দেয়।

'এ ত গেল গোরু, মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতির কথা। পাখীদের ঠোক্‌রানিতে এরা ব্যথা পেলেও তাদের কিছু বলে না, আর কিছু করবার ক্ষমতাও তাদের বড় একটা নাই; পিঠের উপর ব'সে ঠোক্‌রাইতেছে, ব্যথা পেলে বড় জোর একবার সিং নাড়া দেবে, তা তখনি পাখীরা উড়ে সরে যায়, সিং নাড়াই সার। কিন্তু যেখানে বিপদের বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে, সেখানেও পাখীদের খুব যেতে দেখা যায়। একবার আমি দেখ্‌লাম, জলের ধারে একটা প্রকাণ্ড কুমীর চোখ বুঁজে হাঁ ক'রে বেশ স্থিরভাবে প'ড়ে আছে। আমি মনে করলাম, বেশ সুবিধেই হয়েছে, হাঁ ক'রে আছে, ঠিক মুখের ভিতর গুলিটি চালিয়ে দিলেই কাজ হবে। এই ভেবে যেমন বন্দুক তুলেছি; অমনি কতগুলো পাখী ভারি ডাকাডাকি আরম্ভ কল্লে। কুমীরটা সেই ডাকে চোখ খুলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে জলে লাফিয়ে পড়লো; আমার আর গুলি করা হলো না। কুমীরের দাঁতের ভিতর এক রকম কীট জন্মায়, সেই কীটের জ্বালায় দাঁতের গোড়া ফুলে কুমীরকে এক এক সময় ভারি কষ্ট পেতে হয়। তাই প্রায়ই সন্ধ্যার আগে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, জলের ধারে কুমীর হাঁ ক'রে প'ড়ে আছে, আর এক জাতীয় পাখী নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে তার সেই মুখের ভিতরে গিয়ে, দাঁতের ভিতর থেকে পোকা গুলোকে খুঁটে বার কচ্ছে। এমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে, কুমীর হাঁ ক'রেই আছে, পাখীরাও ঘুরে ফিরে পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে! কুমীর বিলক্ষণ হিংস্র জন্তু, যখন হাঁ ক'রে থাকে, তখন এক একবারে চার পাঁচটারও বেশী পাখী তাদের মুখের ভিতরে যায়, ইচ্ছা ক'রলে—একবার মুখ বন্ধ ক'রলেই পাখী গুলো উদরসাৎ হয়। কিন্তু যারা তাদের এত উপকার করে—'দাঁতের পোকা ভাল' করে, তাদের সঙ্গে তারা এমন অধর্ম্ম করে না।

তবে কখন কখনও এমন হয় যে, খুব বেশীক্ষণ হাঁ ক'রে থাকৃতে থাকৃতে ক্লান্ত হ'য়ে হয়ত হঠাৎ মুখ বন্ধ ক'রে বসে। তখন যদি কোন পাখী বেরুতে না পেরে মুখের ভিতর থেকে যায়, তবে সে এমন জোরে ঠোঁট দিয়ে মুখের ভিতর আঘাৎ কত্তে থাকে যে, কুম্ভীরকে বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে তখনই আবার হাঁ ক'ত্তে হয়।'

সে যাহা হউক, কথায় কথায় আমরা আসল কথাই ভুলিয়া গিয়াছি, বাঘটা ত এ পর্য্যন্ত কোন মতেই মারা পড়িল না। কিন্তু একদিন ভারি মজা হইল। ভোরে বাঘের ভয়ঙ্কর ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, আমি ত চমকাইয়া উঠিলাম। উঠিয়া শুনিলাম, মনুর বাপ বলিতেছে, 'আপদ চুকেছে, বাঘ ফাঁদে প'ড়েছে।' তখন আর বিলম্ব না করিয়া তীর ধনুক, বন্দুক ও লাঠি প্রভৃতি লইয়া সকলেই বাহির হইয়া পড়িল, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। বাঘটাকে মারিবার জন্য যেমন সকলে বন্দুক ও তীর ধনুক লইয়া বেড়াইত, তেমনি এক যায়গায় একটা জাল দিয়া ফাঁদও পাতিয়া রাখা হইয়াছিল। অনেক সময় এই সকল ফাঁদে বাঘ ধরা পড়ে। আমরা গিয়া দেখিলাম, আমাদের সেই জালে বাঘটা পড়িয়া ভয়ঙ্কর চিৎকার করিতেছে এবং জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইবার জন্য ভারি লম্ফ ঝম্ফ করিতেছে। কিন্তু লম্ফ ঝম্ফ বড় অধিকক্ষণ করিতে হইল না। জালের মধ্যে অধিক ক্ষণ তাহাকে রাখাটা বড় নিরাপদ নয় বলিয়া, তখনই গুলি করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলা হইল।
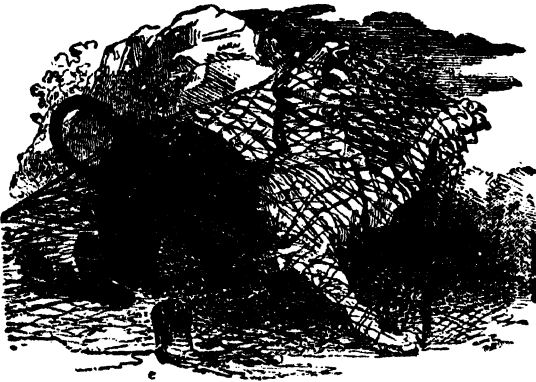
(ক্রমশঃ)

ইতর প্রাণীর বুদ্ধি।

ইন্দুরের দয়া।

আমেরিকার এক সাহেব বলিয়াছেন যে, তিনি একদিন তাঁহার ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া এক দল ইন্দুর দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ইন্দুরেরা পলাইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে একটি ইন্দুর ভাল করিয়া চলিতে পারিতেছিল না ইন্দুরটিকে বুড়া বলিয়া বোধ হইতেছিল। ইন্দুরের চলা দেখিয়া তাঁহার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল। খানিক পরে দেখিতে পাইলেন যে একটা ছোট ইন্দুর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। একটা ছোট কাঠির একদিক সেই বুড়া ইন্দুরটা মুখে করিয়া ধরিয়াছে ও আর একদিক ছোট ইন্দুরটা ধরিয়াছে। তখন আরও ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন যে, বুড়া ইন্দুরটা অন্ধ। ছেলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া লাঠি ধরিয়া অন্ধ পিতা মাতাকে যত্নপূর্ব্বক পথে লইয়া যায়, এই ছোট ইন্দুরটাও সম্ভবতঃ তাহার বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতা বা মাতাকে, কাঠি মুখে করিয়া পথ দেখাইতেছিল। তিনি শব্দ করিয়া ভয় দেখাইলেও এই ইন্দুরটা এই বৃদ্ধ ও অন্ধকে ফেলিয়া পলাইল না! ইন্দুরের এই রূপ পরোপকারের বিষয়

অনেক পুস্তকে পড়া যায় ও যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহাদের নিকট শুনা যায়।

মাছের বুদ্ধি।

আমেরিকার একজন সাহেব মাছের খুব আশ্চর্য্য বুদ্ধির কথা লিখিয়াছেন। তিনি তাঁহার বাগানে একটা ছোট পুকুরের ভিতর অনেক রকম মাছ পুষিয়াছিলেন। এই পুকুরের ধারে একটা গাছের ডালে ছোট একটা ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই ঘণ্টার আগায় লম্বা একটা দড়ি বাঁধা ছিল; দড়িতে মাছেদের জন্য তিনি খাবার বাঁধিয়া বাঁধিয়া জলে নামাইয়া দিতেন। মাছগুলা যেমন খাবার ঠোকরাইতে আরম্ভ করিত আর অমনি ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। তাহার পর সাহেব মজা দেখিবার জন্য সেই দড়িতে ছোট ছোট ইঁটের টুক্‌রা বাঁধিয়া দিতেন, মাছেরা সেই দড়ি ধরিয়া টানিত আর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। সাহেব তখন হাতে খাবার রাখিয়া জলের ভিতর হাত ডুবাইয়া দিতেন, আর মাছেরা তাঁহার হাত হইতে খাবার খাইত। রোজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাবার পাইয়া মাছেদের এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, ঠিক সময় উপস্থিত হইলেই তাহারা ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিত। মাছেরা পায়ের শব্দে বা অন্য কোন রকমে যদি বুঝিতে পারিত যে, সাহেব নিকটে আসিয়াছেন, তাহা হইলে অমনি ঘণ্টা বাজাইয়া সাহেবের নিকট খাবার চাহিত।
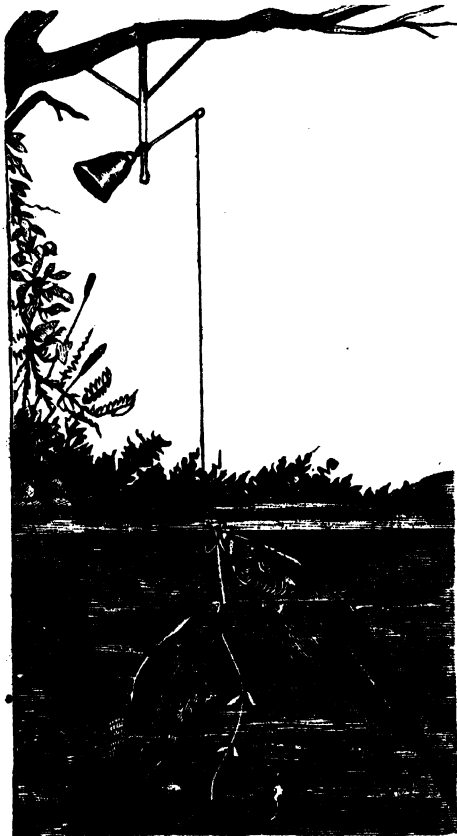
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

গণেশ বাবুর পূজো।

গণেশ বাবু মস্ত বাবু সবার আছে জানা,
কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, ষোল কড়াই কানা।
শরীর খানি বেজায় মোটা মান্লে পরে ঠেলা,
মাটীর উপর গড়ায় যেন মস্ত একটি জালা।
বুদ্ধি শুদ্ধি তথৈবচ বিদ্যে আছে থোড়া,
"কথামালা"র দুচার পাতা ছিল খানিক পড়া।
এমন ধারা গণেশ বাবু বাড়ী যাবেন আজ,
কেন না পূজোটা এল; দেরিতে কি কাজ।

ইষ্টিশনে যেতে হবে কোশ দুয়েকের পথ,
কেমন করে যাওয়া যায় এ মহা বিপদ!
গাড়োয়ানেরা বড় নচ্ছার, অতি বড় পাজী
বাবুজীকে পৌছে দিতে কেউ হোলো না রাজী।
কাজে কাজেই পাল্কী ডেকে যেতে হল তাঁকে,
যদিও ডবল ভাড়া হ'লো বেহারা গুলোর পাকে।
পাল্কীখানা গণেশ বাবুর সম্মুখেতে এলো,
কিন্তু ভিতর ঢুকতে গিয়ে পেট্‌টি বেধে গেলো।
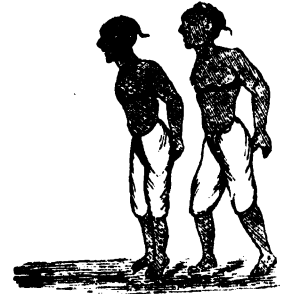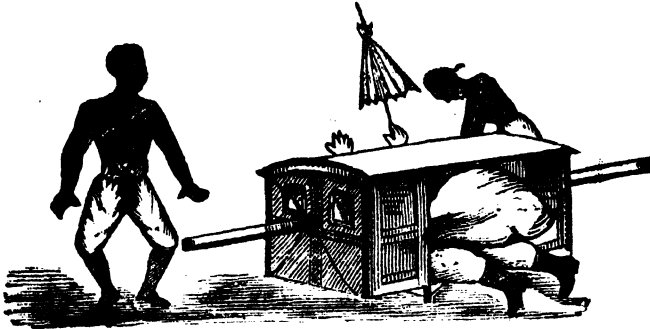
অনেক কষ্টে ঠেলে ঠুলে ভিতরে যান শেষে,
বেহারা গুলো ব্যাপার দেখে মরে হেসে হেসে।
তার পর সেই চারটে লোকে তুলে কাঁধে তাঁকে,
পাল্কী নিয়ে চল্লো তারা ইষ্টিশনের দিকে।

গণেশ বাবু বড়ই খুসি দেখেন চারি পাশ,
'এমন সময় শব্দ হোলো পট্ পট্ পটাশ্।
কি হোলে! কি হোলো! বলে সবাই দেখে চেয়ে,
গনেশ বাবু চিৎ পটাঙ্ রাস্তার উপর শুয়ে।
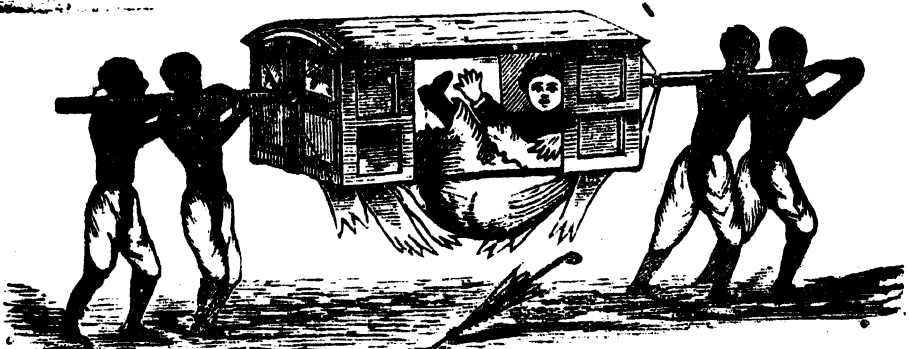
হায় হায় হায় পূজোর সময় কোথায় যাবেন বাড়ী
তা না হ'য়ে পাল্কী ছিঁড়ে পথে গড়াগড়ী।

কোমরেতে লাগ্‌লো বড় বাবু হোলেন কাবু,
পূজোর লুচির বদলেতে খেতে হোলো সাবু।

দ্বাদশ বর্ষ | কার্ত্তিক ১৩০২ | ৭ম সংখ্যা
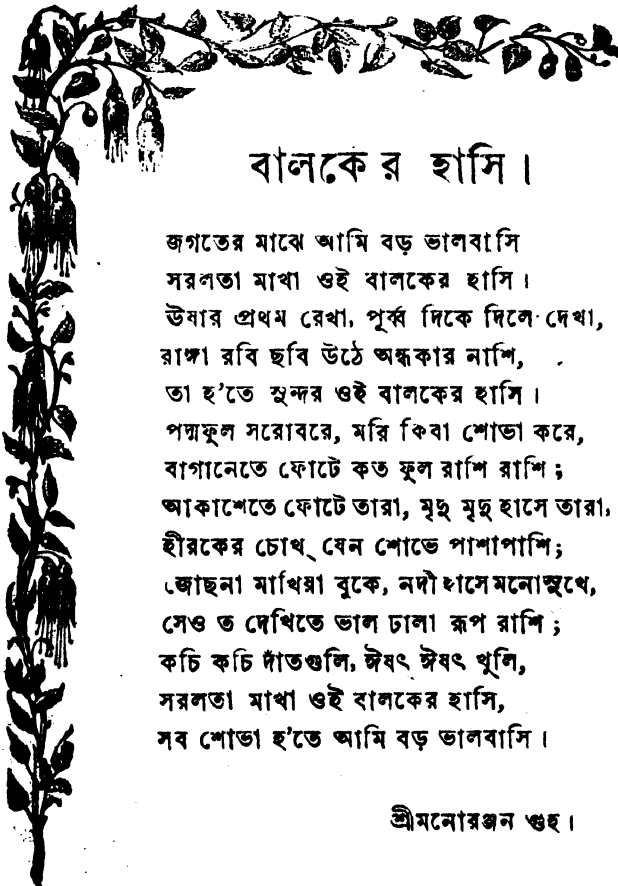
বালকের হাসি।

জগতের মাঝে আমি বড় ভালবাসি
সরলতা মাখা ওই বালকের হাসি।
উষার প্রথম রেখা, পূর্ব্ব দিকে দিলে দেখা,
রাঙ্গা রবি ছবি উঠে অন্ধকার নাশি,
তা হ'তে সুন্দর ওই বালকের হাসি।
পদ্মফুল সরোবরে, মরি কিবা শোভা করে,
বাগানেতে ফোটে কত ফুল রাশি রাশি;
আকাশেতে ফোটে তারা, মৃদু মৃদু হাসে তারা,
হীরকের চোখ্ যেন শোভে পাশাপাশি;
জোছনা মাখিয়া বুকে, নদী হাসে মনোসুখে,
সেও ত দেখিতে ভাল ঢালা রূপ রাশি;
কচি কচি দাঁতগুলি, ঈষৎ ঈষৎ খুলি,
সরলতা মাখা ওই বালকের হাসি,
সব শোভা হ'তে আমি বড় ভালবাসি।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

মহারাজা সার যশোবন্তসিংহ বাহাদুর জি, সি, এস্, আই।

কলিকাতা এবং বাঙ্গালাদেশের প্রায় সকল প্রধান প্রধান স্থানেই এখন মাড়োয়ারীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতানার মাড়োয়ার প্রদেশে ইহাদিগের বাস। যোধপুর

মাড়োয়ারের রাজধানী। মহারাজা যশোবন্ত সিংহ বাহাদুর, এই মাড়োয়ার রাজ্যের রাজা ছিলেন। গত ২৫ শে আশ্বিন ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মাড়োয়ারীরা অতিশয় রাজভক্ত। রাজার মৃত্যু সংবাদে কলিকাতার এবং অন্যান্য দূর দেশস্থ সমস্ত মাড়োয়ারীরা মাথা মুণ্ডন করিয়া রাজার প্রতি ভক্তি ও সম্মান দেখাইয়াছে।

রাজপুতানার মধ্যে মাড়োয়ার রাজ্য সকলের অপেক্ষা বড়। কিন্তু ইহার অধিকাংশ মরুভূমিময়। বৃষ্টি এ দেশে খুব কম হয় এবং লুনী নামে যে একটি নদী আছে, তাহার জলও লবণাক্ত। রাজ্য মধ্যে দুটি হ্রদ আছে, তাহা হইতে যথেষ্ট লবণ তৈয়ার হইয়া থাকে। দেশটি মরুময় ও অনুর্ব্বরা বলিয়াই বোধ হয় মাড়োয়ারীরা নানাপ্রকার ব্যবসা উপলক্ষে দেশ বিদেশে ছাইয়া পড়িয়াছে। রাজপুতানার অন্য কোন প্রদেশের এত লোক কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। মাড়োয়ারীদের ব্যবসা বুদ্ধি প্রসিদ্ধ।

মহারাজা যশোবন্ত সিংহ অতি সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে যোধপুর রাজ্যের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে। ইঁহার মন্ত্রী সার প্রতাপ সিংহ একজন বিচক্ষণ লোক। রাজপুতানায় রাজাদিগের মধ্যে এক মাত্র যোধপুরের মহারাজাই নিজ ব্যয়ে রাজ্য মধ্যে রেল বিস্তার করিয়াছেন। ইঁহার সময়ে দেশে বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে, শিক্ষা বিস্তারের জন্য উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইয়াছে এবং সুশাসনের গুণে রাজ্যমধ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

ক্রীড়া কৌতুকেও রাজার বেশ অনুরাগ ছিল। 'পোলো' নামক খেলায় রাজার খুব খ্যাতি ছিল। মহারাজা যশোবন্ত সিংহের বালক-পুত্র এখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

মুক্তা।

বানরগণের সহায়তায় রামচন্দ্র যে স্থানে সমুদ্র বাঁধিয়াছিলেন, বসন্ত কালে সেই স্থানে অতি সমারোহ ব্যাপার হয়। অল্পদিন পূর্ব্বে যে স্থানটি জনশূন্য অরণ্যের মত থাকে,এসময়ে সেখানে সহস্র সহস্র লোকের কোলাহলে কাণ পাতিবার যো থাকে না। রাত্রি নাই, দিন নাই, এই সময় হইতে ৩ মাসপর্য্যন্ত এই স্থানে এইরূপ মানুষের কোলাহল থাকে। তাহার পর পুনরায় সব নীরব হইয়া যায়, এ স্থানে আর জনপ্রাণী থাকে না।

এ কিসের সমারোহ? এই সময় হইতে ডুবুরীরা সমুদ্র-জলে ডুব দেয়; ডুব দিয়া কস্তরা (ঝিনুক) তোলে, যে কস্তরার ভিতর মুক্তা থাকে। সমুদ্র হইতে মুক্তা তোলার কাজ বার মাস চলে না। বসন্ত কালের আরম্ভে এই কাজ আরম্ভ হয়, তিন মাস কাল চলিয়া অবশেষে বন্ধ হইয়া যায়। কাজটি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দুর-দুরান্তর হইতে শত শত নৌকা, শত শত দাঁড়ি মাঝি, শত শত ডুবুরী ও শত শত দোকানি-পসারি মুক্তার ব্যাপারি আসিয়া এখানে উপস্থিত হয়। তাই আজ এস্থানে এত সমারোহ, তাই আজ এই নির্জ্জন অরণ্য জনপূর্ণ হইয়াছে।

রাত্রি দুই প্রহর হইল, দলে দলে নৌকা সব সাজিল। এক একটি দলে ৬০ কি ৭০ খানি নৌকা থাকে, প্রতি নৌকায় ১০ জন ডুবুরী ও ১৩ জন দাঁড়ি মাঝি থাকে। নৌকা সব সুসজ্জিত হইয়া সমুদ্র-বক্ষে নাচিতে লাগিল। হাঙ্গরের ওঝারা মন্ত্রপাঠ ও নানারূপ তুক্-তাক্ করিতে লাগিল। সুন্দরবনে যেরূপ বাঘের উপদ্রব, এই সমুদ্রে সেইরূপ হাঙ্গরের উপদ্রব। ওঝাদিগের মন্ত্র তন্ত্র বিনা যেরূপ সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে নাই, এখানেও সেইরূপ মন্ত্র তন্ত্র বিনা মুক্তা তুলিবার যো নাই। এইরূপ আয়োজন হইতেছে, এমন সময় 'অরিপোর' দুর্গ হইতে দুড়ুম করিয়া একটি তোপ হইল। যেই তোপের শব্দ হইল, আর নৌকা সব নক্ষত্রবেগে দূর-সমুদ্রে চলিতে লাগিল। সমুদ্রের সকল স্থানে মুক্তাবিশিষ্ট কস্তরা মিলে না। এক এক স্থানে এই কস্তরার আড্ডা আছে। সেই স্থানে গিয়া ইহাদিগকে তুলিতে হয়। সকল সময়ে ইহারা এক স্থানে থাকে না। এ বৎসর এখানে, পর বৎসর হয় তো অন্য স্থানে গিয়া ইহারা আড্ডা করে। রাত্রি দুই প্রহরের সময় যেই তোপ হইল, আর নৌকা সব সেই কস্তরার আড্ডায় বাইয়া চলিল; প্রাতঃকালে গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া ডুবুরীরা নৌকা হইতে জলে নামিল। শীঘ্র ডুবিতে পারিবে বলিয়া প্রতি ডুবুরীর নিমিত্ত আধ মণ ওজনে একখানি পাথর থাকে। পাথর খানি লম্বা ও একগাছি কাছিতে বাঁধা। পাথরটি প্রথমে জলে ফেলিয়া, সেই কাছিতে পা রাখিয়া ডুবুরী গিয়া জলমগ্ন হয়। কস্তরা রাখিবার নিমিত্ত প্রতি ডুবুরীর নিকট একটি করিয়া ঝুড়ি থাকে। একবারে দশ জন ডুবুরী জলের ভিতর যায় না। পাঁচ জন জলের ভিতর গিয়া কাজ করে, আর পাঁচ জন নৌকায় বসিয়া বিশ্রাম করে। সচরাচর ডুবুরীরা এক মিনিটের অধিক জলের ভিতর থাকিতে পারে না। ডুবুরীরা সমুদ্রের যে স্থান হইতে কস্তরা সংগ্রহ করে, সে স্থানে জল অধিক নয়, ৫০ কি ৬০ হাত গভীর হইবে। কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ডুবুরীদের দুই এক দিন শুচি থাকিতে হয়, অনেকে উপবাসও করিয়া থাকে, তবে কেহবা একটু আধটু তাড়ি খাইয়া থাকে। ডুব দিবার পূর্ব্বে ইহারা শরীরে উত্তমরূপ তৈল মাখে, শিংএর তৈয়ারী এক প্রকার যন্ত্র দ্বারা

নাকের ছিদ্র চাপিয়া রাখে, দুইটি কান তুলার দ্বারা বন্ধ করে ও তৈলে ভিজান কাপড় দ্বারা

মুখ বাঁধিয়া রাখে। ডুবুরীরা অধিকাংশ হিন্দু ও রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টীয়ান। মন্ত্র তন্ত্রে সকলেরই সমান বিশ্বাস। জলের ভিতর গিয়া ডুবুরীরা যখন ভূমি পায়, তখন সে স্থানে কস্তুরা সব বসিয়া আছে দেখিতে পায়। এক-খানি ছুরি দিয়া সেই কস্তুরা সব আলগা করিয়া লয়। তাহার পর কস্তুরা গুলিকে কুড়াইয়া ঝুড়িতে রাখিতে থাকে। এইরূপ কাজ করিতে করিতে যখন হাঁপ লাগিয়া আসে, তখন দড়ি ধরিয়া টানে। নৌকার উপরে এই কাছির নিকট যে লোক বসিয়া থাকে, সঙ্কেত বুঝিয়া সে ডুবুরীকে উপরে তুলিয়া ফেলে। সমস্ত দিন এ কার্য্য চলে না। দিবা দুই প্রহরের সময় পুনরায় আর একটি তোপ হয়। তোপ হইলেই কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। দুই প্রহরের মধ্যে এক এক জন ডুবুরী ৪০।৫০ বার জলে ডুব দিতে পারে ও প্রতি ক্ষেপে ৫০ হইতে ৮০টি কস্তুরা তুলিয়া আনে। এক এক খানি নৌকা প্রতিদিন ২০,০০০ হইতে ৩০,০০০ কস্তুরা লইয়া ফিরিয়া আসে। সমুদ্রকূলে আসিয়া কস্তুরা সব মরিয়া পচিবার নিমিত্ত ভূমির উপর গাদা করিয়া রাখিতে হয়। উত্তমরূপে পচিয়া যাইলে তাহার ভিতর হইতে মুক্তা বাহির করিয়া লইতে হয়। বলা বাহুল্য যে, সকল কস্তুরায় মুক্তা থাকে না। কখন কখনও ডুবুরীরা কস্তুরা আনিয়াই গবর্ণমেণ্টের আড্ডতে লইয়া যায়।

সেই স্থানে ইহা চারিভাগ হয়। এক ভাগ ডুবুরীরা পায়, তিন ভাগ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব। গবর্ণমেণ্ট ইহা তৎক্ষণাৎ নিলাম করিয়া ফেলেন। তাহার পর ক্রেতাদিগের যেরূপ যাহার কপালে থাকে, সেইরূপ তাহাদিগের মুক্তা লাভ হয়।

মুক্তা কি? আর মুক্তার উৎপত্তি কিরূপে হয়? একথা লইয়া চিরকাল খুব বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। শামুক ও শুক্তি জাতীয় জীবকে প্রাণিতত্ত্বে মলস্কা (Mollusca) বলে। ইহাদের শরীর অতি কোমল। এই কোমল শরীর এক প্রকার অতি কঠিন খোলায় আবৃত থাকে। এই আবরণটি চূণের দ্বারা নির্ম্মিত। এই জন্য শামুক ঝিনুকের খোলা পোড়াইলে চুন হয়। খোলার কি বাহির দিক্, কি ভিতর দিক্, দুদিকই অতিশয় কর্কশ। খোলা গায়ে লাগিয়া পাছে ইহাদের কোমল শরীর ছড়িয়া যায়, সে জন্য শামুক ঝিনুকেরা একটি আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করিয়াছে। আপনাদের শরীর হইতে ইহারা এক প্রকার রস বাহির করে। সেই রস খোলার ভিতর-পিঠে লাগিয়া শুকাইয়া যায়। আজ কাল লোহার পাত্রে যেরূপ সাদা রং এর মসৃণ 'ইনামেল' হইতেছে, এই রস শুকাইয়া তেমনি ঝিনুকের ভিতর দিক অতি পরিষ্কার মসৃণ ইনামেলের মত দেখায়, খোলার ভিতরদিকে স্বচ্ছ, শুভ্রবর্ণ, উজ্জ্বল 'ইনামেল' সঞ্চিত হয়। এই ইনামেল কখন কখনও এত পুরু হয় যে, ইহা কাটিয়া লোকে বোতাম ও নানারূপ কারুকার্য্য করিয়া থাকে। প্রাণীতত্ত্বে ইহাকে "নেকার" (Nacre) ও ব্যবসাদারগণ ইহাকে মুক্তাজননী (Mother of Pearl) বলিয়া থাকে। কস্তুরার খোলার ভিতর অনেক সময়ে এই "নেকার" নির্ম্মিত এক প্রকার উজ্জ্বল গোলাকার দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাই মুক্তা! এখন কথা এই যে, খোলার ভিতর গোলাকার পদার্থটি কি করিয়া নির্ম্মিত হয়? আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, স্বাতিনক্ষত্রের জল কস্তুরার ভিতর পড়িলে তাহা হইতে মুক্তার উৎপত্তি হয়। শুক্তির ভিতর জলবিন্দু পড়িয়া যে মুক্তা হয়, এ কথা অন্যান্য দেশেও অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না। তবে বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে মুক্তার উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব, তাহাই তোমাদিগকে বলিতে পারি। শরীরের কোনও স্থান উত্তেজিত বা প্রদাহযুক্ত হইলে সেই স্থানটি রক্তবর্ণ, স্ফীত, উত্তপ্ত ও বেদনা যুক্ত হয়, ও সেই স্থানে অধিক মাত্রায় রস নিঃসৃত হয়। যেমন ঠাণ্ডা লাগিয়া বুকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রদাহ হইলে অধিক মাত্রায় শ্লেষ্মা নিসৃত হয় এবং চক্ষে কিছু পড়িয়া প্রদাহ উপস্থিত হইলে, সেই দ্রব্যটিকে ধুইয়া বাহির করিবার নিমিত্ত অধিক মাত্রায় জল নিঃসৃত হয়। মুক্তার উৎপত্তিও এইরূপে হইবার সম্ভাবনা। কস্তুরা যখন "হাঁ" করিয়া সমুদ্র-গর্ভে বেড়ায়, তখন ইহার খোলার ভিতর বালুকা-রেণু বা অন্য কোন বাহিরের পদার্থ ঢুকিয়া যায়। কস্তুরার হাত পা নাই যে তাহা দিয়া এই বালুকা-রেণু বাহির করিয়া ফেলিবে। পাছে এই বালুকা রেণু তাহার কোমল শরীরে প্রবেশ করিয়া অধিকতর অনিষ্ট করে, সে নিমিত্ত তাড়াতাড়ি আপনার শরীর হইতে সে "নেকার" রস বাহির করিয়া সেই বালুকা-রেণুকে ঢাকা দিতে থাকে। নেকার রস স্তরে স্তরে আসিয়া সেই বালুকা-রেণুর গায়ে লাগিয়া শুকাইয়া যায়। এইরূপে কস্তুরার খোলার নিকট ক্রমে ক্রমে চমৎকার একটি উজ্জ্বল দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। ইহাই সেই মহামূল্য মুক্তা।

চীনবাসীরা বহুকাল হইতে এই মর্ম্ম অবগত ছিল। তাই অতি প্রাচীন কাল হইতে তাহারা কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিত। এক প্রকার শামুক লইয়া তাহারা পুষ্করিণীতে রাখিত। শামুকের

ভিতর তাহারা এক একটি ছিটা গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দিত। ছিটা গুলির চারিদিকে নেকারের আবরণ পড়িয়া কালক্রমে মুক্তা প্রস্তুত হইত।

বিলাতী কৃত্রিম মুক্তা আজ কাল এদেশে অনেক আমদানি হয়। বিলাতি মুক্তা প্রস্তুত করা অতি সহজ, সুতরাং এ দেশে তাহা অনায়াসে হইতে পারে। প্রথম ফুকা শিশির ন্যায় ছোট ছোট কাচের ফাঁপা 'গুলি' প্রস্তুত করিতে হয়। সাদা ও রূপার মত উজ্জ্বল মাছের আঁইস লইয়া জলে অনেকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। এই আঁইস হইতে এক প্রকার সাদা পদার্থ বাহির হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয়। তাহার পর সেই পদার্থ নীচে জমিয়া যায়। এই পদার্থের সহিত তরল আমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া সেই কাচের ফাঁপা 'গুলি'র ভিতর পিচকারি দিতে হয়। কাচের 'গুলি'র ভিতর-গা তাহা দ্বারা মাছের আঁইসের মত উজ্জ্বল হয়। তাহার পর সেই ফাঁপা কাচের 'গুলি'কে খুব সাদা মোমের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হয়। ইহাই হইল কৃত্রিম মুক্তা। ফরাশিদেশে আজ কাল অনেক কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত হইতেছে।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়. এফ্ এল্ এস্।

এস্কিমো জাতি।

গ্রীনল্যাণ্ড ও তাহার নিকটে যে সকল দ্বীপ আছে, তাহাতে এবং এসিয়া ও আমেরিকার উত্তর খণ্ডে কোন কোন প্রদেশে এক জাতি লোক বাস করে, তাহাদিগকে এস্কিমো বলে। ইহারা আকারে অন্যান্য সভ্য জাতীয় লোকদিগের অপেক্ষা খাটো। ইহাদের মুখ চেপটা, চোখ ছোট, মিটমিটে, নাক বোঁচা, গলা সরু, রং সাদা। ইহাদের পুরুষদের দাড়ি নাই, কাজেই মেয়ে পুরুষ চেনাই দায়। এই গ্রীনল্যাণ্ড ও তাহার কাছাকাছি সমুদয় দেশ প্রায় বার মাসই বরফে ঢাকা থাকে। সেখানে এত শীত যে, জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। সমুদ্রও জমিয়া প্রকাণ্ড বরফের চাপ হইয়া থাকে। চারিদিকে বরফ যেন চাপ বাঁধিয়া বাঁধিয়া উচু পাহাড় হইয়া থাকে। এই সকল দেশে গাছ পালা জন্মে না, শস্যের ত কথাই নাই; সচরাচর জলও পাওয়া যায় না। এস্কিমো মাতা সন্তানের মুখ খানি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে ইচ্ছা করিলে জলের পরিবর্ত্তে জিব দিয়া চাটিয়া মুখ খানি সুশ্রী করিয়া দেয়। স্ত্রী যখন স্বামীকে খাইতে দেয়

তখন যদি তাহার হাত হইতে মাংসের টুকরা মাটিতে পড়িয়া ধুলা কাদা লাগিয়া যায়, তবে সে তাহা তুলিয়া চাটিয়া পরিষ্কার করিয়া তবে স্বামীকে খাইতে দেয়। জল খাইবার আবশ্যক হইলে আগুনে বরফ গলাইয়া তবে খাইতে হয়। এখানকার লোকেরা কেবল মাছ মাংস খাইয়াই বাঁচে। আবার মাংসের মধ্যে পাঁঠা বা ভেড়া পাইবার যো নাই, পাইবার মধ্যে পাওয়া যায় দু এক রকম পাখী, ভালুক, সীল আর বল্গা-হরিণ। এই সকল জন্তুদের মাংস খাইয়াই এস্কিমোরা বাঁচে। এই সকল জন্তুদের চামড়া দিয়া পরিবার কাপড় বা পোষাক তৈয়ার করে,এই পোষাকে মাথা হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত সমস্তই ঢাকা থাকে,কেবল মুখ খানি বাহিরে থাকে। ইহারা হরিণ,ভালুক ও তিমির চর্ব্বি দিয়া প্রদীপ জ্বালায়, এবং তাহাতেই তাদের জ্বালানি কাঠের কাজ হয়। যে দিন একটা তিমি মারিতে পারে সেদিন ইহাদের বড় আনন্দ, গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোকের তাহাতে বহুদিনের আহারের সংস্থান হয় ও সেই চর্ব্বিতে বহুকাল ধরিয়া প্রদীপ জ্বলিতে পারে। ইহারা কাঁচা মাংস খায়,পচা মাংসেও অরুচি নাই। জন্তুদের মাথার ঘি আর চর্ব্বি ইহারা খাইতে বড় ভালবাসে, এবং পাথর দিয়া হাড় থেঁত করিয়া মজ্জা বাহির করিয়াও খায়। ইহারা অনেকেই কাঁচা মাংস খায়,এই জন্য ইহাদের নাম ‘এস্কিমো’অথবা কাঁচা-মাংসভোজী। ইহাদের রান্নার কাজটা একেবারে নাই বলিলেই হয়, তবে কখন কখনও জল ও মাংস একত্রে রাখিয়া পাথরের টুক্‌রা গরম করিয়া তাহার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই হইল ইহাদের রান্না। দক্ষিণ অঞ্চলের এস্কিমোরা মাঝে মাঝে বুনো ফল খাইতে পায়, এবং মধ্য খণ্ডের লোকেরা বন্য হরিণ মারিয়া, তাহাদের পেটের ভিতরে অর্দ্ধ-জীর্ণ পাতা ও ফল পাইলে, তাহা খুব আগ্রহের সহিত খায়। কিন্তু উত্তরাংশের এস্কিমোরা শাক সব্‌জি একেবারেই পায় না। এস্কিমোরা চর্ব্বি খুব খায়, কারণ তাহাতে শরীর বেশ গরম থাকে। আর তাহাদের যে রকম শীতে বাস করিতে হয়, তাহাতে শরীর গরম রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। এস্কিমোরা কিন্তু এমন পেটুক যে, তাহাদের খাওয়ার কথাটা শুনিলে অবাক হইতে হয়। ইহারা একসঙ্গে চার পাঁচ সের মাংস খায়। খুব খাইয়া যখন আর নড়িতে পারে না, তখন চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে, এবং চোখ বুঁজিয়া হাঁ করিয়া পড়িয়া থাকে, আর তাহাদের স্ত্রীরা মাংসের কিম্বা চর্ব্বির টুকরা মুখে পূরিয়া দেয়; যতক্ষণ পর্য্যন্ত গিলিবার শক্তি থাকে, ততক্ষণ এই রূপে খায়, তার পর মুখ আপনি একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে তবে থামে।

এখন এস্কিমোদের ছেলেদের কথা শোন। এস্কিমো ছেলেরাও সভ্য দেশের ছেলেদের মতই ছুটাছুটী ও খেলাধূলা করিয়া বেড়ায়। ছেলেরা যখন ছোট থাকে, তখন ইহাদের

মায়েরা আপনাদের পোষাকের পিঠের দিগের থলের মধ্যে ইহাদের পূরিয়া পিঠে করিয়া লইয়া বেড়ায়। ছেলেরা একটু বড় হইলেই তীর

ধনুক ছুড়িবার অভ্যাস করে। কখন কখনও এক এক খানা মাংসের টুকরা দূরে রাখা হয়, যে ছেলে দূর হইতে মাংসের টুক্‌রা খানি তীর দিয়া আগে বিঁধিতে পারে, সে সেই মাংস খণ্ড খানি পায়। এস্কিমো ছেলেরা বরফের উপর দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করে। কখন কখনও বড় ছেলেরা ছোট ছেলেদের চাকাশূন্য ছোট গাড়িতে

বসাইয়া বরফের উপর ঠেলিয়া লইয়া যায়। ইহারা কুকুরদের সঙ্গে খেলা করিতেও খুব ভাল বাসে। শীতকালে বরফের এক একটা গোল টুকরা লইয়া "বল" খেলা করে। সকলেই এক এক খানা তিমির হাড় অথবা লাঠি হাতে লইয়া বরফের বলটাকে শূন্যে ছুড়িয়া মারিতে থাকে, এই রকম করিয়া তাহাদের বল খেলা হয়। ছবিতে দেখ (১৩১ পৃষ্ঠা) কতকগুলি এস্কিমো ছেলে কেমন খেলা করিতেছে।

ল্যাপল্যাণ্ড দেশের লোকেরা বন্য হরিণের গাড়ি চড়ে আর তাহাদের দুধ খায়। এস্কিমোরা কিন্তু তাহা করে না, ইহারা হরিণের মাংস খায় আর তাহাদের চামড়া পরে। ইহারা হরিণের বদলে কুকুরের গাড়ি চড়ে। চাকাশূন্য গাড়িতে ৬টা ৮টা কখন কখনও ২০টা কুকুর জুড়িয়া দেয়, আর কুকুরেরা সেই গাড়ি বরফের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যায়। সাধারণতঃ এক এক খানা গাড়িতে ছয়টা করিয়া কুকুর জুড়িয়া দেয়। ইহারা কুকুরদের বড় যত্ন করে। খুব শীত পড়িলে কুকুরের পায়ের তলা চামড়া দিয়া ঢাকিয়া দেয়।

ইহারা গ্রীষ্মকালে সীলের চামড়া দিয়া তাঁবু বানাইয়া তাহার মধ্যে থাকে। তবে সাধারণতঃ ইহারা মাটির ভিতর খানিকটা গর্ত্ত করিয়া, চারিদিকে কাদা লেপিয়া দেওয়াল তোলে ও তাহার উপরে হাড় ও চামড়া দিয়া চালা উঠাইয়া ছোট ছোট কুঁড়ে বানায়। এই কুঁড়ে ঘরে তিমি মাছের নাড়িভুঁড়ির চামড়া দিয়া জানালা বানাইয়া লয়। কুঁড়ের ভিতরে বাতাস ঢুকিতে পায় না এবং ভিতরটা এত অপরিষ্কার ও গরম যে, অন্য কাহারও পক্ষে ভিতরে ঢোকাই দায়। শীত কালে যখন জীব জন্তু সহজে পাওয়া যায় না, তখন এস্কিমোরা স্থানে স্থানে শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়। এই সময় জায়গায় জায়গায় থাকিবার জন্য বরফের

বাড়ী তৈয়ার করিয়া লয়। শীতকালে যখন চারিদিকে বরফ রাশীকৃত হইয়া জমিয়া যায়, তখন একজন এস্কিমো সেই বরফ হইতে বড় বড় চাপ কাটিয়া দেয় এবং আর একজন গোল করিয়া দেওয়াল গাঁথিতে থাকে। ইহারা ২।৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬।৭ হাত উচু ও ৬ হইতে ২০ হাত বেড়-যুক্ত গুম্বজ বানাইতে পারে। বরফের চাপগুলিই ইটের কাজ করে। বরফের ইটগুলি সাজাইয়া গোল করিয়া গাঁথা হয়। একথাক গাঁথা হইলে তাহার উপরে ভিতর দিক ঘেঁষিয়া আর এক থাক বরফ রাখা হয়। এই রূপে স্তরে স্তরে গোলাকার করিয়া বরফ সাজাইলে উপরে অল্প মাত্র ফাঁক থাকে। সেই ফাঁক টুকুতে একখানা বড় বরফের টুক্‌রা অতি সুন্দর কৌশলে বসান হয় এবং তাহাই বাড়ীর ছাদ হয়। বরফের টুক্‌রা গুলি হালকা অথচ পাথর বা ইটের মত শক্ত ও চৌকোনা, কাজেই নির্ম্মাণ কার্য্যটা বেশ সহজেই হয়। বাড়ী তৈয়ার শেষ হইলে যদি কোন স্থানে ভাঙ্গে বা ফাঁক থাকে,তাহা হইলে কোমল তুষার লেপিয়া তাহা বুজাইয়া দেয়। পরে সেই বদ্ধ-গৃহে ছুরি দিয়া নীচু করিয়া দরজা কাটা হয়। এই বরফের ঘরের কথা শুনিয়া তোমরা আশ্চর্য্য বোধ করিতে পার, মনে করিতে পার ইহার ভিতরে মানুষ বাঁচে কি করিয়া, হিমে মরিয়া যায় না? বাস্তবিক ঘরগুলি বরফের হইলেও ইহাদের ভিতরটা খুব গরম। প্রদীপের আগুনে আর ধোঁয়াতে ঘরের ভিতরটা সর্ব্বদাই গরম থাকে।

ইহারা বড় অপরিষ্কার ও নোংরা, জন্মে কখন ত গা ধোয় না, শীতে গা ধুইতেও পারে না। ধোঁয়া ও কাদায় ইহাদের গায়ের চামড়ার রং মেটে দেখায়; গায়ের আসল রং দেখা যায় না।

এস্কিমোরা বড় অসভ্য এবং মূর্খ। ইহারা এত বোকা যে, ভাল করিয়া গণিতেও জানেনা। অনেকগুলি ছেলে মেয়ে থাকিলে, বাপ মায়ে কতগুলি সন্তান আছে তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারে না।

পুরুষেরা মৃগয়া করিতে বড় ভালবাসে এবং সে বিষয়ে খুব পটু। ইহারা তীর ধনুক, হাড় বা পাথরের কোঁচ, বর্শা, ছুরি ও বঁড়সি দিয়া শিকার করিয়া থাকে। ইহাদের গৃহস্থালীর জিনিস পত্র সব পাথর বা হাড়ের তৈয়ারী।

শুনা যায়, পৃথিবীর মধ্যে কেবল এই জাতিই আপনাদের মধ্যে বা অন্য কোন জাতির সঙ্গে যুদ্ধ

বিহগ্র করে না। আমাদের দেশে সোনা রূপা যে রূপ বহুমূল্য ও লোকে তাহা পাইতে যে রূপ আগ্রহ প্রকাশ করে, ইহাদের দেশে কাঠও সেই রূপ দুষ্প্রাপ্য ও তাহা পাইতে লোকে যার পর নাই আগ্রহ প্রকাশ করে। একখণ্ড ভাঙ্গা নৌকার হাল বা বৈঠা বা একখণ্ড ভাঙ্গা তক্তা ইহাদিগকে দিলে ইহারা যত উপকৃত ও আনন্দিত হয়, আমাদের দেশে কাহাকেও দশ হাজার টাকা দিলেও সে ততটা হয় কি না সন্দেহ।

আমাদের দেশে যেমন নমস্কার করিয়া অভিবাদন করে বা ইউরোপীয়েরা যেরূপ হাত ধরিয়া অভিবাদন করে, ইহারা সে রূপ কিছুই করে না। ইহাদের দুজনে দেখা হইলে, পরস্পর নাক ঘর্ষণ করে, ইহাই ইহাদের অভিবাদন প্রথা।

স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা ইহাদের অদ্ভুত। ইহারা বিশ্বাস করে মরিয়া স্বর্গে যাইবে। স্বর্গে অনন্ত বরফ রাশি, তার মধ্যে ভালুক, শীল ও হরিণ বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। ইহারা অক্লেশে তাহাদের মারিয়া খাইবে। ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে না, চর্ব্বির অভাবও জানিবেনা। চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধেও ইহাদের ধারণা অদ্ভুত। ইহারা বলে চাঁদ এক দুষ্ট ছোক্‌রা, কোন সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করিতে যায়; তাতে মেয়েটি চটিয়া তার এক গালে তেল-কালী মাখিয়া দেয়; চাঁদ লজ্জায় পলাইয়া যায়। সে তেল-কালী কিন্তু আজও উঠিল না, যখন সেই কালী মাখা গাল আমাদের দিকে ফিরায়, তখনই আমরা গ্রহণ দেখি।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু বি, এ।

কাহাকে প্রণাম করিয়াছিল?

এক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে চারিটি ছাত্র পড়িতেন। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহারা চারিজনে একত্র হইয়া গঙ্গাতীর মুখে যাইতেছিলেন; সেই সময়ে গঙ্গার দিক হইতে রামা নাপিত সেই পথে আসিতেছিল; সে ঐ চারিজন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া 'প্রাতঃ প্রণাম' বলিয়া, প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে একজন ছাত্র বলিলেন, "আমরা চার-জন, কিন্তু রামা একটি বই প্রণাম কর্‌লে না, ও আমাদের মধ্যে কা'কে প্রণাম কর্‌লে?" ইহার উত্তরে অপর একজন ছাত্র বলিলেন, "ও আমার কাছ দিয়ে গেছে, আমাকেই প্রণাম করেছে।" তখন আর এক জন বলিলেন, "না, ও আমাকেই বিশেষ চেনে, আমার সঙ্গেই ওর বিশেষ আলাপ আছে, আমাকেই প্রণাম করেছে।" তৃতীয় ছাত্র কহিলেন, "তা নয়, আমিই তোমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়, মাথায়ও লম্বা আছি, ও আমাকেই প্রণাম করেছে।" এইরূপে সেই প্রণা-মটি লইয়া ক্রমে বিবাদ বাড়িয়া গেল। তখন প্রথম যিনি কথাটা তুলিয়াছিলেন. তিনি বলিলেন, "আচ্ছা চল, রামাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক ও কাকে প্রণাম করেছে।" রামা তখন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ছাড়ি-বার পাত্র নন; তাঁহারা 'রামা রামা' করিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার পিছনে দৌড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে রামার হুঁস হইল তাহাকে কে পিছন হইতে ডাকিতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল. সেই চারিজন ছাত্র দ্রুত-গতিতে তাহার দিকে আসিতেছেন। কাছেআসিয়া প্রথম যিনি প্রশ্নটি তুলিয়াছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু, আমরা চারিজন ব্রাহ্মণ ছিলাম, কিন্তু তুমি একটি বই প্রণাম কর নাই, সে প্রণামটি কা'কে করেছ?" রামা তাহাঁ-

দের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া অবাক হইল, একটু ভাবিয়া বলিল, "আপনাদের মধ্যে যিনি সকলের চেয়ে বোকা তাঁকেই প্রণাম করেছি।" ছাত্র চারিটি এই কথা শুনিয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। তখন তর্ক উঠিল, "আমাদের মধ্যে কে সকলের চেয়ে বোকা?" কেহই ঘাড় পাতেন না, প্রণামটা বুঝি বা মাঠে মারা যায়! শেষে এক জন বলিলেন, "চল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট যাওয়া যাউক, তিনি আমাদের সকলেরই বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছেন, তিনিই মীমাংসা ক'রবেন, আমাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা কে বোকা।" রামা তাঁহাদের বিবাদের সুযোগে চলিয়া গিয়াছিল; ছাত্রগণেরও আর গঙ্গাতীরে যাওয়া হইল না, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার পর সকলে বিনীত ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন সেই প্রথম ছাত্রটি বলিলেন, "মহাশয়, এই বিষয়টি আপনাকে মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে যে আমাদের মধ্যে কে সকলের অপেক্ষা বোকা; এই কথা লইয়া আমাদের বিবাদ হইয়াছে, আপনি আমাদের সকলেরই বুদ্ধি বিদ্যা অবগত আছেন, মীমাংসা করিয়া দিন।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তোমাদিগকে এক মাসের ছুটি দিলাম, সকলে বাড়ী যাও, বাড়ী গিয়া এই এক মাসে তোমরা যে যাহা করিবে, আমাকে আসিয়া বলিও, আমি মীমাংসা করিয়া দিব।" পরদিনই ছাত্রগণ আপন আপন বাড়ী যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সকলেরই বিবাহ হইয়াছিল; বাড়ীতে দুই চারিদিন থাকিয়া তাঁহারা শ্বশুরবাড়ী যাইবার ইচ্ছা করিলেন। একজনের পিসিমা, যাইবার সময় একটি টাকা তাঁহার হাতে দিয়া বলিয়া দিলেন, "বাড়ীর কাছ বরাবর হ'লে একটা দোকান থেকে কিছু কিনে নিয়ে যেও।" ভ্রাতুষ্পুত্র উপদেশ বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া বাহির হইলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে মধ্যাহ্ন হইল; ক্রমে বোধ হইল শ্বশুর বাড়ীর নিকটে আসিয়াছেন। তখন দোকানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; দেখিলেন একটা দোকানে ছোট বড় অনেক রকমের তক্তপোষ বিক্রয়ের জন্য রহিয়াছে; তখন ভাবিলেন, "এই ত শ্বশুর বাড়ীর কাছের দোকান, এই দোকান হইতেই কিছু কিনিয়া লওয়া যাক।" এই ভাবিয়া একখানি তক্তপোষ চাহিলেন, দোকানদার সে খানির বার আনা দাম চাহিল; তিনি বলিলেন, "পিসিমা আমায় এক টাকার মত জিনিস কিন্‌তে বলেছেন, তুমি একখানা এক টাকার মত বড় দেখে তক্তপোষ দাও।" দোকানদার তাহাই করিল; ব্রাহ্মণ সন্তান সেই তক্তপোষ খানি মাথায় তুলিয়া লইয়া গলদঘর্ম্ম হইয়া, পিসিমার বিবেচনার নিন্দা করিতে করিতে শ্বশুর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং তক্তপোষ খানি নামাইয়া লইবার জন্য শ্বশুর বাড়ীর লোকদিগকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তাঁহার এই কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়াছিলেন কি কাঁদিয়াছিলেন, কি দুইই করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা ভাবিয়া দেখ।

আর এক জন যাইবার সময় তাঁহার পিসিমা উপদেশ দিয়াছিলেন, "সোজা পথে চলিও, উঁচু দেখিয়া বসিও।" পাড়াগাঁয়ের সরু রাস্তা, রাস্তার মধ্যে হয়ত একটা অশ্বত্থগাছ রহিয়াছে, কোথাও বা যাইতে যাইতে সম্মুখে পুষ্করিণী পড়ে, পাড়ের উপর দিয়া রাস্তা ঘুরিয়া গিয়াছে; কিন্তু ছাত্রটি পিসিমার উপদেশ মত বাঁকা পথে কিছুতেই চলিলেন না। সম্মুখে গাছ পড়িলে তিনি এধার দিয়া গাছে উঠিয়া ওধার দিয়া নামিতে লাগিলেন, পুষ্করিণীর পাড় ঘুরিয়া বাঁকা পথে চলিলেন না, সাঁতার দিয়া ঠিক সোজা পার হইতে লাগিলেন; এই রূপে শ্বশুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মেজেতে বসিবার আসন দেওয়া

হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বাক্স পেঁট্‌রার উপর চড়িয়া একবারে আড়কাটায় গিয়া বসিলেন। শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা অবাক!

আর একজনের পিসিমা ছিলেন না; তিনি আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াই শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাহাঁর স্ত্রী ও একটি চার বৎসরের পুত্র ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া বালকটি বলিল, 'মা, এ কে?' ছেলের এই কথায় ব্রাহ্মণ চটিয়া লাল হইলেনএবং বলিলেন, "কি! ও আমাকে চেনে না?" তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "বড় হ'য়ে ত তোমাকে দেখেনি, কেমন ক'রে চিন্‌বে, কেউত ওকে চিনিয়ে দেয় নি? স্ত্রীর কথায় ব্রাহ্মণ আরও রাগিয়া বলিলেন, "বাপকে দেখেই চিন্‌বে, তার আবার চিনিয়ে দেবে কি?"

চতুর্থ ছাত্রটি নিরাপদে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিয়া আহারাদি শেষ করিয়া পান খাইতে খাইতে স্ত্রীকে বলিলেন, "আমায় আর একটা পান সেজে দাও"; স্ত্রী উত্তর করিলেন, "আমি আর সাজতে পারি না, তুমি সেজে খাও।" ছাত্রটি বলিলেন, "সাজতেই হবে"—স্ত্রী বলিলেন, "আমি পারবনা।" ক্রমে বিবাদ বাধিয়া গেল; স্ত্রী পান না সাজিয়াই শয়ন করিলেন। ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন, আচ্ছা থাক্ সেজে কাজ নাই, কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা রইল, যে আগে কথা বল্‌বে তাকেই পান সাজ্‌তে হবে।" সেই রাত্রে সেই ঘরে চোরে সিঁদ কাটিল। দুই জনেই জানিতে পারিলেন, চোর ঘরে ঢুকিল, এক এক করিয়া থালা, ঘটি, বাটি, কাপড়, বাক্‌স সমস্ত বাহির করিয়া লইয়া গেল; কিন্তু পান সাজিবার ভয়ে একটি কথাও কেহ বলিলেন না। চোর চলিয়া গেল, রাত্রিও ক্রমে শেষ হইল, দুই জনের কেহই কিন্তু বিছানা হইতে উঠিলেন না। বেলা হইল; বাড়ীর লোকে ভাবিতে লাগিল, ব্যাপার কি? শেষে তাহারা ব্যস্ত হইয়া দ্বার ভাঙ্গিল। তখনও কোন কথা নাই, অনেক ডাকাডাকিতেও কেহ একটি কথার উত্তর পাইল না। শেষে অনেক বিবেচনা ও তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, রাত্রে সিঁদের গর্ত্ত দিয়া সাপ আসিয়া ইহাদের দুইজনকেই কামড়াইয়া মারিয়াছে। তখন শ্মশানে লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। খাট তৈয়ারি হইল, দুইজনকেই খাটে চড়ান হইল। তখনও কথাটি মাত্র নাই। শ্মশানে লইয়া গিয়া দুই জনকেই চিতায় চড়ান হইল; তখনও কথা নাই। চিতায় আগুন দেওয়া হইল, খুব জ্বলিয়া উঠিল। তখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ লাফ দিয়া দৌড়! দাহকারীরা 'দানো' পাইয়াছে বলিয়া কোদাল লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইল; ব্রাহ্মণ, "আমি মরি নাই, আমি মরি নাই" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন তাঁর স্ত্রী চিতা হইতে নামিয়া তাঁর পশ্চাতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন, "সাজ পান, তুমিই আগে কথা কয়েছ।" সঙ্গের লোক সকল অবাক, ব্যাপার কি!

এখন বল দেখি ভাই রামা কাহাকে প্রণাম করিয়াছিল?

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম, এ।

হরিণ।

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। হরিণ নানা জাতীয় হয়। কোন কোন জাতীয় হরিণ খুব ছোট হয়, আবার কোন কোন জাতীয় হরিণ গোরু অপেক্ষাও বড় হয়, এমনকি ছোট খাট হাতীটির মত দেখিতে হয়। ইহাদের আকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হরিণের শিংও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়; কোনটার শিং সোজা ও ছোট, কোনটার

শিং খুব লম্বা অথচ পাকান, কোনটার বা শিং খুব বড় ও অনেক ডালপালা-যুক্ত, কোনটার আবার শিং খুব বড় বটে, কিন্তু হাতের পাতা বা তেলোর মত চেপ্‌টা।

আমাদের দেশে, বনে অনেক রকম হরিণ আছে। সচরাচর যে হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা বাছুরের মত বড় হয়। গায়ের রং লাল্‌চে, তাতে সাদা সাদা ফোঁটা ও পিঠের দাঁড়ার উপরটা কাল।

হরিণের চোখ্ গোল, বেশ বড় ও খুব উজ্জ্বল।

ঘায়ী-শৃঙ্গ মৃগ—কৃষ্ণসার জাতীয়।

আমাদের দেশের এবং আরব ও পারস্য দেশের কবিরা হরিণের চোখকে বড়ই সুন্দর দেখিতেন। যে সকল স্ত্রীলোকের চোখ দেখিতে বেশ সুন্দর হইত, কবিরা হরিণের চোখের সহিত তাঁহাদের চোখের তুলনা করিতেন।

হরিণের পা লম্বা এবং সরু সরু। খুর গুলি ছোট ছোট। এই জন্য ইহারা খুব দৌড়াইতে পারে এবং দৌড়িয়া সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মহা বলবান জন্তুর হাত হইতেও রক্ষা পায়। হরিণেরা প্রায়ই দলবদ্ধ হইয়া বাস করে।

কোন কোন জাতীয় হরিণের দলে ৫।৭টা বা ১৫।২০টা করিয়া হরিণ থাকে, আবার কোন কোন জাতীয় হরিণের দলে ১০০ কখনও বা ২০০ করিয়া হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিণের দলে কয়েকটা বড় হরিণ প্রহরীর কাজ করে ও বিপদের আশঙ্কা দেখিলে ভয়-সূচক শব্দ করিয়া সমস্ত দলকে সতর্ক করিয়া দেয়। সঙ্কেত করিবামাত্র সমস্ত দলটি গোল হইয়া দাঁড়ায়। হরিণীরা ও হরিণ শিশুরা মাঝখানে থাকে, আর পুরুষ হরিণগুলি শত্রুর দিকে মুখ করিয়া, শিং বাঁকাইয়া দলটিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। এইরূপে তাহারা আপনাদিগকে হিংস্র জন্তুদিগের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

হরিণ দুই শ্রেণীর হয়। এক শ্রেণীর হরিণের শিং ফাঁপা এবং গোরু বা ছাগলের শিংএর ন্যায় একই শিং আজন্ম কাল থাকে। এই শিং মাথার হাড়ের সহিত এক হইয়া জন্মে না। অপর শ্রেণীর হরিণের শিং নিরেট এবং মাথার হাড়ের সহিত এক হইয়া জন্মে। মাথার হাড়ই ঐরূপ বাড়িয়া শিংএর আকার ধারণ করে। এই শিং প্রায়ই শাখা-যুক্ত হয় এবং তাহা প্রতি বৎসর পড়িয়া যায় ও আবার নূতন উঠে। ইহাদের শিংএ অনেক ডালপালা বাহির হয়। অস্থায়ী-শৃঙ্গ মৃগের মধ্যে এক বলগা-হরিণ ছাড়া আর কোন জাতীরই হরিণীর শিং থাকে না, কিন্তু স্থায়ী-শৃঙ্গ মৃগের অনেক জাতীরই স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই শিং থাকে, ও লম্বা শিং দুটিতে প্রায়ই অনেক গাঁইট থাকে। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর অনেক রকমের হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের দু চারিটার বিষয় বলিতেছি।

এক রকম হরিণ ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের গায়ের রং কাল, কেবল চোখের চারিদিকে সাদা গোল রেখা থাকে ও পেটের তলা সাদা হয়। ইহাদের শিং দুটি "স্ক্রুর" মত পাকান ও এক হাত হইতে দেড় হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহাদের পুরুষ হরিণের শিং যত বড় হয় হরিণীর শিং তত বড় হয় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, রাজপুতানায় এবং দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে ইহাদিগকে বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা খুব দ্রুত দৌড়ায় এবং দৌড়িবার সময়ে মধ্যে মধ্যে খুব উচ্চ লম্ফ দিয়া চলিয়া যায়। ইহাদিগকে এণ, কৃষ্ণমৃগ বা কৃষ্ণসার বলে। আফ্রিকা দেশে এই জাতীয় মৃগ অনেক প্রকারের আছে।

আমাদের দেশে "গ্যাজেল" (Gazelle) নামে এক প্রকার ছোট মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের গায়ের রং বাদামী, লেজ কাল। পা হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত দেড় হাত উচ্চ। উহাদের শিং সোজা হইয়া উঠিয়া আগাটা একটু বাঁকিয়া যায়। শিং এক ফুট লম্বা হয়, তাহাতে ১৫। ১৬টা গাঁইট থাকে। ইহারা ৬।৭টা হইতে ২০টা পর্য্যন্ত একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহারা এত দ্রুত দৌড়ায় যে, শিকারী কুকুর দৌড়িয়া ইহাদিগকে ধরিতে পারে না। ইহারা ঘাস ও ছোট ছোট গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে এবং জলপান করে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ সচরাচর এমন স্থানে বাস করে, যেথানে গভীর কূপ ভিন্ন অন্য কোথায়ও জল পাওয়া যায় না। গাছের পাতা হইতে যে রস পায়, তাহাতেই ইহাদের তৃষ্ণা

নিবারণ হয়। আফ্রিকা, আরব ও পারস্য দেশে নানা প্রকারের "গ্যাজেল" মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের চোখ বড় সুন্দর।

চৌশিঙ্গা বা চতুঃশৃঙ্গ মৃগ হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে এবং দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য ও বনপ্রদেশে বাস করে। ইহাদের গায়ের রং মেটে। ইহারা খুব ক্ষুদ্রকায় মৃগ, দুই ফুটের বেশী উচ্চ হয় না। ইহাদের মাথায় দুই জোড়া অর্থাৎ চারিটা শিং জন্মায়, এইজন্য ইহাদিগকে চৌশিঙ্গা বলে। হরিণের মাথায় যেখানে শিং জন্মে, সেখানে ত দুটা শিং আছেই, তা ছাড়া চোখের উপর কপালে আরও দুটা শিং জন্মায়। ইহাদের শিং ছুঁচল ও মসৃন, গাঁইটযুক্ত নহে।

আমাদের দেশে "নীলগাই" নামে এক প্রকার খুব বড় মৃগ আছে। ইহারা পাহাড়ে' জায়গায় ও খোলা মাঠে বাস করে। ইহাদের শিং দুটি কিন্তু খুব ছোট এবং লেজ, ঘাড় ও গলার তলা লোমযুক্ত হয়। ইহাদের কেবল পুরুষ গুলিরই শিং হয়, হরিণীদের শিং হয় না। ইহাদের গায়ের রং গাঢ় ধূসর বর্ণ, একটু নীল্‌চে, সেই জন্য ইহাদিগকে "নীলগাই" বলে।

আফ্রিকা দেশে কৃষ্ণসার ও গ্যাজেলের ন্যায় মৃগ, ছোট বড় নানা প্রকারের আছে; কিন্তু এক অতি অদ্ভুত মৃগ আছে তাহার নাম "নু"। ইহারা কিম্ভূত—কিমাকার, দেখিলে হরিণ বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয় যেন শিং-ওয়ালা ঘোড়া। ঘাড়ের নিকট হইতে মহিষের শিংএর মত বাঁকা দুটি শিং বাহির হয়। ঘোড়ার মাথায় মহিষের শিং বসাইয়া দিলে যেমন দেখায়, সেই রকম দেখিতে হয়। লেজও ঘোড়ার মত। ঘাড়ে ঘোড়ার মত কেশর আছে। ছবিতে দেখ কেমন চেহারা।

অস্থায়ী-শৃঙ্গ মৃগ বা যে হরিণের শিংএ ডাল পালা হয়, তাহাদের পুরাতন শিং পড়িয়া গেলে, শিংএর মূলদেশে সুপারির মত উঁচু দুটি হাড় চামড়া ঢাকা থাকে। ক্রমে এই গোল হাড়ের উপর, মখমলের ন্যায় কোমল লোমযুক্ত চর্ম্মে ঢাকা দুটি গুটী জন্মে। এই দুটি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া শিং হয় ও শাখা-প্রশাখা যুক্ত হইয়া বড় হইতে থাকে। তখনও সমস্ত শিং নরম থাকে ও আগাগোড়া এই মখমলে ঢাকা থাকে। ভিতরে শিং শক্ত হইলে এই মখমলের আবরণটা মাথার চামড়া হইতে পৃথক হইয়া পড়ে ও ক্রমে শুকাইয়া যায়। হরিণ তখন গাছের গুঁড়িতে শিং ঘসিয়া এই শুষ্ক মখমলের আবরণটি তুলিয়া ফেলে। শিং পাকিয়া উঠিলে হরিণ লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া বেড়ায়, ও বড় ভীষণ হয়। অপর হরিণের সহিত শিংএ শিংএ ঢু মারিয়া লড়াই করে।

এই লড়াইয়ের ঠক্‌ঠকানি শব্দ অনেক দূর পর্য্যন্ত শুনা যায়। লড়াই করিতে করিতে শিং কখন

কখনও এমন আটকাইয়া যায় যে, তাহারা বহু টানাটানি করিয়াও কোন মতে তাহা ছাড়াইয়া লইতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে তাহাদিগকে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়।

এই শ্রেণীর হরিণকে অস্থায়ী-শৃঙ্গ মৃগ বলে। এই শ্রেণীর কয়েক জাতীয় হরিণের কথা বলিতেছি।

শীত প্রধান দেশে "রেন্‌ডিয়ার" বা বল্‌গা-হরিণ নামে এক প্রকার বড় হরিণ পাওয়া

যায়। সাইবিরিয়া, ল্যাপল্যাণ্ড ও নরওয়ের লোকেরা, বরফের উপর চালাইবার চাকা-শূন্য গাড়িতে ইহাদিগকে জুতিয়া গাড়ি টানায়; ঘোড়ার পরিবর্ত্তে ইহার পিঠে চড়িয়া যাতায়াত করে ও ইহাদের দুধ এবং মাংস খায়। ইহার চর্ব্বিতে তাহারা প্রদীপ জ্বালে এবং চামড়াতে পোষাক তৈয়ার করে। বল্‌গা-হরিণ না হইলে ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড দেশের লোকের এক মুহূর্ত্তও চলে না। আমাদের দেশে গোরু যেমন উপকারী, তাহাদের দেশে বল্‌গা-হরিণ তার চেয়ে অধিক উপকারী।

এই শ্রেণীর হরিণের মধ্যে "এল্ক্‌" হরিণই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা আকারে একটা ছোট হাতীর সমান হয়। উচ্চে ৭।৮ ফুট হয়। উত্তর আমেরিকা, আসিয়া ও ইউরোপের শীত প্রধান প্রদেশে ইহাদের বাস। ইহাদের শিং হাতের তলার মত চেপ্‌টা। ইহারা লতা পাতা ও কচি পল্লব খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের ঘাড় খুব ছোট বলিয়া চরিয়া ঘাস খাইতে পারে না। তবে লম্বা লম্বা ঘাসের আগা ছিঁড়িয়া খায়। ইহাদের গায়ের রং গাঢ় ধূসর বর্ণ। ইহাদের শিং জানুয়ারি মাসে পড়িয়া যায়। ৫।৬ সপ্তাহে নূতন শিং উঠিয়া

আগষ্ট মাসে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এস্কিমো জাতিরা ইহার মাংস খায়।

এক হরিণ।

অস্থায়ী-শৃঙ্গ হরিণের মধ্যে আমাদের দেশে শংবর হরিণ খুব বড়। ইহাদের গায়ের লোম খস্‌খসে। গায়ে ও গলায় বড় বড় লোম জন্মে। লেজ মোটা, কান বড় ও চৌড়া এবং রং মেটে। ইহারা ৪।৫ ফুট উচ্চ হয়। এক একটা বড় হরিণের ওজন প্রায় ৯ মন হইবে। ইহাদের শিং বহুশাখা-যুক্ত ও লম্বায় দুই হাত আড়াই হাত হইবে। এক শিংএর আগা হইতে অপর শিংএর আগা আড়াই হাত তফাৎ হইবে। ভারতবর্ষের জঙ্গলা পাহাড়ে' জায়গায় ইহারা বাস করে। কিন্তু সিন্ধু,পঞ্জাব ও রাজপুতনার বালুকাময় প্রদেশে ইহাদিগকে দেখা যায় না। ইহারা রাত্রে চরিয়া বেড়ায়, দিনের বেলায় ছায়াময় নির্জ্জন স্থানে বিশ্রাম করে। ১৪০ পৃঃ ১ম চিত্রের হরিণের ন্যায় ইহাদের আকৃতি।

আর এক জাতীয় হরিণ আমাদের দেশে পাওয়া যায়, ইহাদের গায়ের রং লাল্‌চে। সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় সাদা সাদা গোল গোল দাগ। এই জন্য ইহাদিগকে চিত্র মৃগ, চিতা হরিণ, বা চিতেল বলে।

এই শ্রেণীর নানা জাতীয় হরিণের মধ্যে ভারতবর্ষে "মণ্টজাক" হরিণ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে হিন্দুস্থানে "কাকার" বলে।

কস্তুরীমৃগ খুব ছোট, ২০ ইঞ্চ উঁচু। ইহাদের শিং হয় না তা ছাড়া মুখের দুপাশে দুটি লম্বা লম্বা দাঁত বাহির হয়। এই দাঁত তিন ইঞ্চলম্বা হয়। পুরুষ হরিণদের পেটের তলায় নাভির কাছে চামড়ার একটা থলে জন্মে, তাহা হইতে এক প্রকার তীব্র গন্ধ-যুক্ত রস নির্গত হয়। এই রস যখন টাট্‌কা ও তরল থাকে, তখন গন্ধটা বড় উগ্র ও খারাপ লাগে। রস ক্রমে শুকাইলে গন্ধ মনোরম হইয়া উঠে। যাহারা কস্তুরী সংগ্রহ করিতে যায়, তাহারা হরিণ মারিয়া চামড়া শুদ্ধ থলেটা কাটিয়া লয় এবং সেই রসটা ইহাতেই শুকাইয়া থাকে। এই শুষ্ক থলেটা মৃগনাভী। কস্তুরিমৃগ কাশ্মীর আসাম ও হিমালয়ের অন্যান্য প্রদেশে বাস করে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ বসু।

ইতর জন্তুর বুদ্ধি।

ইতর জন্তুর মধ্যে দুষ্টামি ও কু বুদ্ধিতে বানর ও হনুমান মহাশয়দের কাছে অন্যান্য আর সকলকেই হার মানিতে হয়। কু বুদ্ধিতে ইহাদিগকে কেহ বড় একটা আঁটিতে পারে না; তবে, হাঁসটা কি ছাগলের ছানাটা চুরি করিতে গিয়া শিবরাম পণ্ডিত কখনো কখনো একটু পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। যাঁহারা পশ্চিমে অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে গিয়াছেন, বানর ও হনুমানের দুষ্টামি বুদ্ধির পরিচয় তাঁহারা যথেষ্ট পাইয়াছেন। তাঁহাদের কাছে ঘাট স্বীকার না করিয়া এবং তাহাদিগকে খাবার জিনিস ঘুস ঘাস না দিয়া সেখানে চলা ফেরাই ভার। এমন কি হাতের কাছ থেকে গাড়ুটি ঘটিটি নিয়াও সময় সময় ইহারা টানাটানি করে। কিছু ঘুস্ দিলে, অন্ততঃ যোড়হাতে কিছু ঘুস্ কবুল করিলে তবে ইহাদের হাত এড়ান যায়। এদের অত্যাচারে সে সব দেশের লোকের যত কষ্ট হউক না হউক, তীর্থযাত্রীরা ত ঝালাপালা হয়। আমাদের দেশের কাছের একটি ঘটনার কথা বলিতেছি, ইহাতে বানরের দুষ্টামি বুদ্ধির কথা শুনিয়া সকলে অবাক হইবে।

বর্দ্ধমানে এক সময়ে অত্যন্ত বানরের উপদ্রব ছিল। তাদের অত্যাচারে লোকে অস্থির হইত। এক সময়ে এখানে এক ভদ্রলোকের বাড়ীর কাছে একখানি বাগানে একদল বানরের

আড্ডা হইয়াছিল। তাদের অত্যাচারে নিকটের কোন বাড়ীর জিনিসপত্র রক্ষা পাইত না। উপরোক্ত ভদ্রলোকের বাড়ী একটি বড় পোষা কুকুর ছিল। কুকুরটির নাম ছিল 'বাঘা'। বাঘার জন্য বানর মহাশয়রা ঐ ভদ্রলোকটির বাড়ীতে বিশেষ উপদ্রব করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে বাড়ীর চতুঃসীমানায় আসিতে দেখিলেই বাঘা একেবারে গিয়া খা খা করিয়া পড়িত। কাজেই প্রাণের ভয়ে বানর মহাশয়দের লেজ গুটাইয়া পলাইতে হইত। কিন্তু বানরের জাত, সহজে হার মানিবার নয়। অনেক ভাবিয়া অবশেষে এক পরামর্শ আঁটিয়া তাহারা ঐ বাড়ীর কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক দিন হঠাৎ তাহাদের মতলব সিদ্ধির সুযোগও উপস্থিত হইল। ঐ বাড়ীর কুকুরটি দুই প্রহরের পর একটি কূয়ার কাছে ছায়ায় চিৎপাত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। সুযোগ দেখিয়া দুইটি বানর গাছ হইতে নিঃশব্দে নামিয়া আসিল এবং কুকুরের কাছে গিয়া একটিতে তাহার পিছনের এক পা এবং অপরটিতে সামনের এক পা ধরিয়া

বাঘার গঙ্গাযাত্রা।

শূন্যে টানিয়া তুলিল। কুকুরটি তখন খেউ খেউ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পাতকূয়াটি খুব কাছে ছিল। বানরেরা কুকুর বেচারীকে কূয়ার উপর তুলিয়া, আস্তে তাহার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া সেখানেই তাহার গঙ্গাযাত্রা করাইল। সেই কুকুরটির মত আর একটি রক্ষক যোগাড় না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীর জিনিসপত্রের উপর বানরদের উপদ্রবের পথ পরিষ্কার হইল। দেখ ইহাদের দুষ্টামি বুদ্ধির দৌড়টা!

ইতর জন্তুর একটা সুবুদ্ধির কথাও শুন। বিলাতের লোকে কুকুর অতি যত্নে পোষে এবং সেই সব কুকুরের মধ্যে প্রভুভক্তির নানারূপ পরিচয় পাওয়া যায়। একবার এক গৃহস্থের দুইটি ছেলে বাড়ীর পুকুরে মাছ ধরিতেছিল। মাছ ধরিতে ধরিতে উহাদের মধ্যে একজন কি রকমে পা হড়কাইয়া গভীর জলে পড়িয়া যায়। ছেলেটি ভালরূপ সাঁতার জানিত না। কাপড় চোপড় জড়াইয়া সে জলের মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছিল। তাহার ভাই তাহা দেখিয়া বাড়ীর লোকজনদের খবর দিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। বাড়ী হইতে লোকজন আসিয়া ঐ ছেলেটিকে জল হইতে তুলিয়া বাঁচাইবে তখন আর সে সময় ছিলনা; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে যে আর এক বন্ধু সেখানে ছিল, তাহারই বুদ্ধি ও সাহসে সেবার ছেলেটির প্রাণে বাঁচিল। বাড়ীর কুকুরটি তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, এবং পুকুরের পাড়ে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। এ বিপদের সময়ে তাহার কাছে কেহ কোন সহায়তার প্রত্যাশা করে নাই; কিন্তু বালকের চিৎকারে তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে সে যখন দেখিতে পাইল যে, তাহার এক খেলিবার সাথী ডুবিয়া মরিতেছে, তখন সে দৌড়িয়

সেই পুকুরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং সাঁতরাইয়া গিয়া সেই ছেলেটির গায়ের কাপড় খুব জোরে কামড়াইয়া ধরিল। তাহার পর সেই প্রভুভক্ত কুকুর ধীরে ধীরে সাঁতরাইয়া প্রভু পুত্রকে কূলে আনিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইল। গৃহস্থ লোকজন লইয়া বাড়ী হইতে আসিয়া কুকুরের সেই সৎকার্য্য দেখিয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন; এবং নিতান্ত ইতর জন্তু হইলেও সেই প্রভুভক্ত কুকুরের মুখে বারংবার স্নেহ-চুম্বন দিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

ইতর প্রাণীদের সম্বন্ধে এইরূপ সুন্দর সুন্দর গল্প অনেক শুনা যায়। ক্রমশঃ তাহা তোমাদিগকে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅন্নদা চরণ সেন, বি, এ।

পূজার ছবি।

চারু। দাদা মশায়—অ দাদামশায়!

দাদা। কি দাদা!

চারু। এই সময় লুকিয়ে গোটা দুই সন্দেশ দাওনা! মুটু খুকী না আস্‌তে টপ্‌ করে খেয়েনি!

দাদা। আরে তার জন্যে ভাবনা কি দাদা!—এই যে, অ মধু! দাও ত হে, আমার দাদাকে দুটো খুব ভাল সন্দেশ দাও ত! হাঃ হাঃ।

মধু। (সন্দেশ আনিয়া) এই নাও খোকা বাবু।

দাদা। কি দাদা! এখন ত হ'ল?

চারু (নৃত্য করিতে করিতে) হাঁ দাদা মশায়; বাঃ বেশ সন্দেশ। (অপর বাড়ীর একটি বালককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া) দেখেছ! ব্যাটাদের মাথায় টনক্‌ পড়ে নাকি!

বালক। চারু দাদা! তোমাদের বাড়ী পুজো দেখতে এলাম!

চারু। (তাড়াতাড়ি সন্দেশ খাইতে খাইতে) হুঁ। বেশ।

বালক। (সন্দেশের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া) চারু দাদা, ও কি খাও!

চারু। কৈ?

বালক। ঐ যে-হ্যাঁ!

চারু। আরে ও-ঐ, ও একটা সন্দেশ।

বালক। চারু দাদা, আমায় একটু দেবে! অ্যাঁ—দাওনা?

চারু। (গম্ভীর ভাবে) সন্দেশ ত খায় না ভাই!

বালক। কেন?

চারু। কি জানিস্‌, এ গুলো আমার এঁটো হয়েছে। এঁটো জিনিষ কি খেতে আছে, ছি!

বালক। না দাদা আমি তোমার এঁটো খেতেই ভাল বাসি!

চারু। (রাগিয়া) তা তোদের বাড়ী যা কিছু খাবার আছে, সে সব নিয়ে আসিস্‌, আমি এঁটো ক'রে দেব, তখন খুব খা'স্‌, এখন পালা!

দ্বাদশ বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩০২ { ৮ম সংখ্যা।
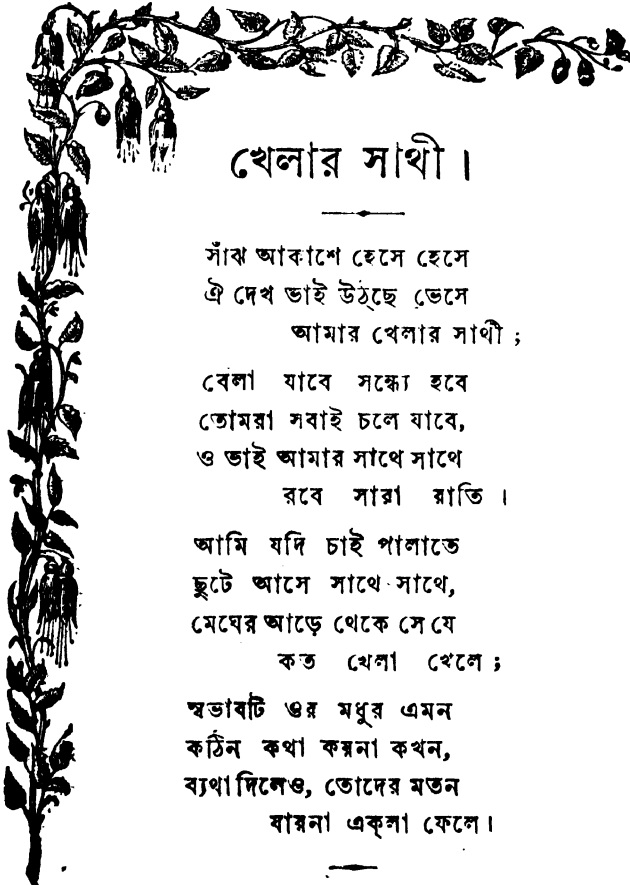
খেলার সাথী।

সাঁঝ আকাশে হেসে হেসে
ঐ দেখ ভাই উঠ্‌ছে ভেসে
আমার খেলার সাথী ;

বেলা যাবে সন্ধ্যে হবে
তোমরা সবাই চলে যাবে,
ও ভাই আমার সাথে সাথে
রবে সারা রাতি ।

আমি যদি চাই পালাতে
ছুটে আসে সাথে সাথে,
মেঘের আড়ে থেকে সে যে
কত খেলা খেলে ;

স্বভাবটি ওর মধুর এমন
কঠিন কথা কয়না কখন,
ব্যথা দিলেও, তোদের মতন
যায়না একলা ফেলে।

গ্লাড্‌ষ্টোন্।

চারু—দাদামশায়, ইংরেজের মধ্যে সবার চেয়ে বড়লোক কে?

দাদামশায়—কেন রে, এ খেয়াল আবার তোর মনে কি করে উঠল।

চারু—না এই সেদিন আমাদের মধ্যে এই নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। তা কেউ বল্লে যে আমাদের লাট সাহেব সবার চেয়ে বড়, আর কেউ আর এক জনার নাম কল্লে, কত নামই হ'ল। তা বল না দাদামশায়, সাহেবদের মধ্যে আজ কাল সবার চেয়ে বড় লোক কে?

দাদামশায়—আরে জানিস্ কি, সাহেবদের দেশে দুটো দল আছে। একটা দলের লোকের ইচ্ছা যে, কোনও রকমে বড় লোকদের পান থেকে যেন চুণটুকু না খসে। বড় লোক যেমন দুধ ভাত খায়, বড় বড় বাড়ীতে থাকে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে, তারা তেমনি করুক, আর ছোট লোকেরা যেমন তাদের বোঝা বয়, কল টানে তারাও তেমনই ক'রতে থাকুক। আর এক দলের ইচ্ছা যে সবারই ভাল হউক। ছোট লোকে যে মজুরি করেই খাবে তাই বা কেন? তাদেরও অবস্থা ভাল হোক; আর বড় লোকের, রাজারাজড়ার, তা তাদেরও জয় জয়কার হউক। এই দুই দলে সে দেশে সর্ব্বদাই ঝগড়া চলেছে। এখন এক দলের লোক যাকে বড় লোক বলে, অন্য দলের লোকে তাকে গালাগালি দেয়, কাজেই সবারই মতে যে কে বড়, তা স্থির করা কিছু শক্ত; তবে মোটের উপর বল্‌তে পারা যায় যে, ইংরেজদের মধ্যে গ্লাডষ্টোন সাহেবের চেয়ে বড়লোক আর নাই। এ কথাটায় প্রায় সকল ইংরেজই সায় দিয়ে থাকে।

চারু—গ্লাডষ্টোন কে দাদামশায়, তাঁর দু একটা গল্প বলনা?

দাদামশায়—গল্প আর কি বল্‌ব। যত বড় লোক সকলের সম্বন্ধেই এক রকম কথা। ছেলে বেলা বাপ মায়ের কথা শুন্‌ত, লক্ষ্মী ছেলের মত পড়া শুনায় মন দিত; পথে ঘাটে ছুটোছুটি করে সময় নষ্ট করত না। বস্, কালক্রমে তারা বড় হয়ে উঠল। তুমিও তাই কর, তুমিও বড় লোক হবে। এই দেখ গ্লাডষ্টোনের যখন ১১ বৎসর বয়স, তখন তিনি ইটন্ স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। সব ক্লাসেই ভালছেলে ও দুষ্ট ছেলের দল থাকে। গ্লাডষ্টোন ভাল ছেলের দলে মিশ্‌তে লাগলেন। মন দিয়ে পড়া শুনা করতেন। খেলার মধ্যে ছিল, ভাল ছেলেদের সঙ্গে বেড়ান আর পুকুরে নৌকা চালান। তারপর যখন তিনি কলেজে গেলেন, তখন তাঁর বাবাকে লিখে পাঠালেন যে, আঁকে তাঁর মোটে মন বসেনা, সুতরাং তিনি কলেজে আঁকের জন্য মাথা বকাবেন না। তাঁর বাবা এই চিঠি পেয়ে অমনি স্নেহভরে প্রত্যুত্তরে লিখলেন যে, তাঁর বড় সাধ যে তাঁর ছেলে আঁকটা ভাল করে শেখে, কারণ আঁকে যার মাথা খেলে না, তার দ্বারা এ পৃথিবীর কোনও

গ্লাডষ্টোন।

বড় কাজ হয় না। গ্লাডষ্টোন বাপের চিঠি পেয়ে একমনে আঁক শিক্ষায় মন দিলেন। তার পর যখন পরীক্ষা হল, দেখা গেল যে তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সুধু আঁকেতেই যে তিনি এইরূপে আপন অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুব উন্নতি করেছিলেন তা নয়। তিনি যে বিষয়েই হাত দিয়েছেন তাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিলে সে সময়কার প্রধান লোকেরা তাঁর প্রতিভা দেখে বলেছিলেন যে, কালে তিনি এক জন দেশের প্রধান লোক হবেন! আসামান্য প্রতিভাবলে গ্লাডষ্টোন প্রধান মন্ত্রীর পদে মনোনীত হলে, তাঁদের সে কথা সফল হয়েছিল। রাজনীতি, হিসাবে ও বক্তৃতায়, তাঁর সমকক্ষ লোক বিলাতে আর নাই। তিনি কিরূপে এত বড় হয়েছেন তার সন্ধান জান? সকলেই তা জানে, তবে অতি অল্প লোকেই তেমন ভাবে কাজ করে থাকে। ঐ যে পড়েছ—*

"One thing at a time and that done well,
Is a very good rule as many can tell.

এক সময়ে একটার অধিক কাজ কখনও করিবে না, তাহা হইলেই সেকাজ বেশ সমাধা করিতে পারিবে।"—গ্লাডষ্টোন এই নিয়মটা প্রাণপণে কাজে লাগিয়েছেন। তাই তিনি যে বিষয়েই হাত দিয়েছেন, সে বিষয়েই বড় হয়েছেন। গ্লাডষ্টোন যখন খুব ছেলেমানুষ, তখন তাঁর একবার অসুখ হয়। অসুখ সামান্য হলেও তার জন্য তাঁকে ঔষধ ব্যবহার করতে হয়েছিল। কথিত আছে যে, একদিন প্রাতে যখন তিনি পড়ায় মন দিয়ে বসেছেন, তখন তাঁদের বাড়ীর এক ঝি ঔষধের পাত্র হাতে নিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলে। গ্লাডষ্টোন ঝিকে দেখেই বল্লেন, "এখন যাও, এখন যাও, দুটো কাজ আমি এক সময়ে করতে পারব না। আমার পড়া হোক্ তার পরে ওষুধ খেয়ে আসিব।" ঝি ওষুধ নিয়ে ফিরে গেল। গ্লাডষ্টোনের পড়া শেষ হলে পর তিনি ঔষধ খাবার জন্য মার কাছে গেলেন।

দেখলে কেমন একাগ্রতা। এমন না হলে কি কখনও কোনও কাজ ভাল হয়। এ অবস্থায় তুমি কি করে থাক বল ত? অসুখ করলেত পড়া শুনো শিকেয় ওঠে, তার পর যখন পড়া শুনো কর, তখনও এটা ওটা পাঁচটা কাজে অকাজে সময়টা কাটিয়ে দাও, কেমন না? পড়তে পড়তে বই ফেলে ঝাঁ করে অমনি একবার মা কি কচ্চে দেখে এলে, বা কিছু খাবার নিয়ে স'রে পড়লে, কিম্বা খাতা বাঁধবার জন্য কাগজের তাগাদা করে এলে; বস্—দশ, পনের মিনিট কেটে গেল। তার পর হয়ত ঘুমন্ত বইএর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দুটো কথা আবার মুখস্থ করলে। তোমার ছোট ভাই হরি, তাকে ত ইংরেজী পড়তে ডাক্‌লে সে আঁকের খাতা খুঁজ্‌তে আরম্ভ করে, আঁক কস্‌তে বল্লে ব্যাকরণের খোঁজ পড়ে। আবার তোমার পড়ার সময়েই বল, আর যখনই বল, কাণটিত সর্ব্বদা রাস্তার দিকেই যেন পড়ে আছে। কে হাতে তালি দিলে, কে শিশ্ দিলে, ফিরিওয়ালা কি ডেকে যাচ্ছে;—অমনি বই পড়ে রইল, তুমি কোন একটা ছল করে, পেছনকার সিঁড়ি দিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে, দেশলাইর ছবির জন্য সেই তালিদাতা বন্ধুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এলে। এতে কি পড়া হয়? তাই তোমার এমন দশা। ক্লাসে দাঁড়িয়ে পড়া শিখ্‌তে হয়, কি লজ্জার কথা। যদি পড়ার সময় মন দিয়ে পড়াটা করে ফেল, তবে পড়াটা হয়ত এক ঘণ্টায় হয়ে যায়, তার পর ছবির বন্দোবস্ত বল, আর খেলা বল, সবই বেশ চল্‌তে পারে। তা করনা বলে পড়াও ভাল হয় না, খেলাও ভাল হয় না।

তার পর গ্লাডষ্টোন সাহেবের সম্বন্ধে আর একটা কথা তোমায় বল্‌ব। দেখ, যত বড়লোক সকলেরই এক একটা ভাল বইএর প্রতি ভাল-

বাসা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আলেক্‌জাণ্ডারের নাম শুনেছ ?

চারু—হঁ। শুনেছি বই কি, যিনি ভারতবর্ষ দখল করতে এসেছিলেন, তাঁরই কথা বলছ ত ?

দাদামশায়—হঁা। তিনি হোমরের ইলিয়াড নামক বই খানি বড়ই ভালবাসতেন। শুনা যায় যে, ঘুমাবার সময় হোমরের এই বই-টাকে বালিশের নীচে রেখে তিনি শুতেন। তারপর যখন পারস্যদেশের রাজা দারা তাঁর নিকট যুদ্ধে হেরে যান, তখন তিনি তাঁর রাজ-ধানী লুট করে খুব মনি মুক্তা খচিত একটি ছোট বাক্স পেয়েছিলেন। সেই বাক্সে তিনি তাঁর সেই ইলিয়াড খানি খুব যত্ন ক'রে রাখতেন এবং একটু অবসর পেলেই বইখানি খুলে পড়্‌তেন। যুদ্ধের সময়েই হ'ক বা অন্য সময়ে হউক, হাতে কাজ না থাকিলেই ইলিয়াড খুলে তিনি পড়্‌তে বস্‌তেন, একই স্থান হাজার বার পড়েও তাঁর তৃপ্তি হ'ত না।

গ্লাডষ্টোনেরও এইরূপ একখানি বই আছে। তিনি ইটালীয় কবি 'দান্তের' পুস্তক বড়ই ভাল বাসেন। এখন তাঁর বয়স ৮৩। ৮৪ বৎসর হয়েছে। এখনও হাতে অন্য কাজ না থাক্‌লে তিনি দান্তের বই পড়্‌তে বসে যান। দান্তের বই ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। গ্লাডষ্টোন যে এত ঈশ্বর ভক্ত তা অনেকটা এই বইএর জন্য। আলেক্‌জাণ্ডার যে এত বড় বীর হ'তে পেরেছিলেন, তাহা অনেকটা হোমরের প্রভাবে। কিন্তু আমাদের দেশে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁরা কোনও একটা বইকে এতদূর আদর করতে জানেন। আর সেই জন্য কোন একটা বিষয়ে আপনাদেরকে ডুবিয়ে রেখেছেন এমন লোক এ দেশে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্লাডষ্টোন বড় হয়ে কি কি কাজ করেছিলেন, তা তোমরা বড় হয়ে জান্‌তে পারবে। তাঁর সম্বন্ধে আর দু একটা কথা বলে আজ শেষ করবো। তিনি যখন যে কাজে হাত দিতেন, একমনে সেই কাজই করতেন,কিন্তু তাঁহার এমন আশ্চর্য্যক্ষমতা ছিল যে,ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সে কাজের কথা, সে কাজের চিন্তা একেবারে ভুলে যেতে পারতেন। আয়র্লণ্ডের লোকেরা বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টের অধীন না থেকে নিজেদের দেশের আইন কানুন নিজেরা করতে পারে, এজন্য গ্লাডষ্টোন প্রাণ পণে পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টে তা নামঞ্জুর হল। গ্লাডষ্টোনের এত দিনের চেষ্টা পরিশ্রম বৃথা হ'ল। এতে তাঁর মনটা খুব চঞ্চল হবার কথা। কিন্তু দেখা গিয়েছিল যে, পার্লিয়ামেণ্ট থেকে বাড়ী ফিরে গিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে নিদ্রা দিচ্ছেন। গ্লাডষ্টোন বাড়ী ফিরিবার সময় রাজ্যের সমস্ত ভাবনা চিন্তা বাইরে রেখে বাড়ী যেতেন।

বাড়ীতে নাতী নাতিনীদের সঙ্গে তিনি ছেলে মানুষের মত খেলা করতেন। শুধু খেলা নয়, প্রতিদিন বেড়ান এবং কুড়ালি দিয়া গাছ কাটা তাঁর একটা প্রধান আমোদ ছিল।

শ্রীকালীশঙ্কর শুকুল এম, এ।

কয়েকটি অদ্ভুত পাখী।

কেরাণী পাখী।

আগে যখন হাঁসের পালকের কলমের খুব চলন ছিল, তখন অনেক কেরাণীকে কাণে কলম গুঁজিয়া রাখিতে দেখা যাইত। তোমরাও অনেকে হয়ত অনেক আফিসের লোককে কাণে কলম গুঁজিয়া যাইতে দেখিয়া থাকিবে। পর পৃষ্ঠায় যে পাখীর ছবিটি দেখিতেছ, উহার মাথায় কাণের কাছে, অনেকগুলি লম্বা লম্বা পালক বাহির হইয়া রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন পাখীটিকে অনেক লিখিতে হয়, তাই

কেরাণী বাবুটির মত কাণে কলম গুঁজিয়া রহিয়াছে। এই জন্য ইহার নাম "কেরাণী পাখী," রাখা হইয়াছে।

কেরাণী পাখী।

আফ্রিকার দক্ষিণ প্রদেশে ইহাদের বাস। ইহারা চিল ও বাজপাখীর জাত। ইহাদের পা দুখানি খুব লম্বা, ঠোঁট বাঁকা, শক্ত ও ধারাল। ইহারা সাপ ধরিয়া খায়। সাপ দেখিলে ডানার ঝাপটে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। সাপ যেই ফোঁস করিয়া তাড়া করিয়া আসে, অমনি কেরাণী পাখী এমনি ডানার বাড়ি মারে যে, সাপ ঘুরিয়া মাটিতে লুটাইতে থাকে। তখন কেরাণী পাখী তাহাকে ধরিয়া গিলিয়া খায়। আফ্রিকার লোকেরা এই পাখী পোষে। ইহারা গৃহস্থের হাঁস মুরগী প্রভৃতিকে ইন্দুর ও সাপের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা করে।

ফ্লামিঙ্গো।

আর নীচে যে অদ্ভুত পাখীটির চিত্র দেখিতেছ উহাকে "ফ্লামিঙ্গো" বলে। ইহারা হাঁসজাতীয় পাখী। ইহাদের শরীর রাজহাঁসের শরীরের মত বড়, কিন্তু লম্বা লম্বা দুখানি ঠ্যাং আর সাপের মত লম্বা গলা থাকায় মানুষের চেয়ে উঁচু হয়। আমেরিকা দেশে ও আসিয়ার দক্ষিণদিকে ইহাদের বাস। ইহারা বিল ও জলা ভূমিতে বাস করে। ইহারা শামুক, গুগ্‌লি, পানা ও কাদা খায়। হাঁস যেমন কাদার মধ্যে ঠোঁট গুঁজিয়া তাহা হইতে সার ভাগ বাছিয়া লইতে পারে, ইহারাও সেই রূপ করে। তবে হাঁস যখন কাদা খায়, তখন তাহার নীচের ঠোঁট নীচের দিকে, অর্থাৎ মাটির দিকে থাকে, আর উপরের ঠোঁট উপর দিকেই থাকে। কিন্তু ফ্লামিঙ্গো যখন কাদা খায়, তখন লম্বা

ফ্লামিঙ্গো

ঘাড়টি একেবারে পায়ের তলায় চালাইয়া দেয়, সুতরাং মাথার তেলোটা মাটির দিকে হইয়া যায়। উপরের ঠোঁট মাটিতে লাগিয়া যায়, আর নীচের ঠোঁট উপরের দিকে হইয়া যায়। এইরূপে খাইবার জন্য ইহাদের ঠোঁট মাঝখান হইতে বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ইহাদের গায়ের রং লাল টুক্‌টুকে। কেবল ডানার বড় বড় পালকগুলি কাল। ইহারা দলবদ্ধ

লায়ার পাখী।

হইয়া বিচরণ করে। এবং সেই দলের দুইধারে দুটি পাহারা রাখে, তাহারা চতুর্দ্দিকে দেখিতে থাকে। কোন বিপদের আশঙ্কা বুঝিলে সকলকে আগেই সতর্ক করিয়া দেয়।

ইহারা এক হাত দেড় হাত পরিমাণ উচু মাটির ঢিবি তৈয়ার করিয়া লইয়া, তাহার উপর ডিম পাড়ে এবং "টুল" বা মোড়ার উপর যেমন করিয়া বসিতে হয়, তেমনি করিয়া তাহার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ডিমে তা দেয়। বোম্বায়ের নিকটে, সিন্ধুপ্রদেশে, পারস্য উপসাগরের তীরে, মান্দ্রাজের 'পুলিকট' হ্রদের ধারে অনেক ফ্লামিঙ্গো বিচরণ করিতে দেখা যায়।

লায়ার পাখী।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় আর একটি অদ্ভুত পাখীর চিত্র দেখ। ইহার লেজের কি বাহার! লেজের দুই পাশের দুইখানি চওড়া পালক উপরদিকে উঠিয়া ক্রমে বাঁকিয়া সাপের ফণার মত হইয়াছে। ভিতরের পালক গুলি খুব সরু সরু, দেখিতে তারের মত। লেজটি দেখিলে বেহালার পেটটির কথা মনে পড়ে। এই লেজের আকার সারঙ্গী বা বীণা জাতীয় "লায়ার" নামক বাদ্য যন্ত্রের ন্যায় বলিয়া ইহাকে ইংরাজীতে "লায়ার বার্ড" বলে।

অষ্ট্রেলিয়া দেশে লায়ার পাখীর বাস। পুরুষ পাখীদের লেজই এই রূপ খুব বাহারে হয়। লেজের পাশের পালক দুখানি সাদা, মধ্যে মধ্যে কাল কাল দাগ, ও ধারটা ঈষৎ লাল। পাখীর গায়ের রং মেটে, পাখা ও গলার তলা লাল। ইহারা ময়ুরের ন্যায় লেজ গুটাইয়া রাখিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলেই খাড়া করিয়া ছড়াইয়া বাহার দিতে পারে। লায়ার পাখী বনের মধ্যে ঝোপে গোপনে থাকে। ইহারা বড় ভীরু, কোন প্রকারের সামান্য শব্দ শুনিলেই লুকায়, সেই জন্য ইহাদিগকে ধরা বড় কঠিন।

ইহারা পুরাতন গাছের কোটরে অথবা পর্ব্বত গহ্বরে বাসা নির্ম্মাণ করে এবং বাসাগুলি শুক্না ঘাস ও পাতা দ্বারা তৈয়ার করে।

উড়িবার সময়ে বা মাটিতে দৌড়াদৌড়ি করিবার সময়ে ইহারা লেজটা গুটাইয়া রাখে। ইহাদের স্বর বড় মিষ্ট এবং ইহারা অন্যান্য পাখীর স্বর ও কুকুরের ডাকেরও নকল করিতে পারে। শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ বসু।

বড়দিনের গল্প।

সাহেবদের খৃষ্টমাসের বাঙ্গালা নাম হইয়াছে 'বড়দিন'। বড়দিন নামটি কেন হইল বলিতে পারিনা. তবে বাঙ্গালা নাম যখন একটা হইয়াছে, তখন আমরাও ইহাকে বড়দিন বলিব।

একবার এই বড়দিনের ছুটিতে আমি এলাহাবাদে বেড়াইতে যাই। এলাহাবাদে আমার বন্ধু রাজকুমার বাবুর খুব বড় কারবার ছিল। এই কারবার উপলক্ষে তাঁহাকে এলাহাবাদেই থাকিতে হইত, সেই খানেই বাড়ী ঘর করিয়াছিলেন, দেশে আসা প্রায় তাঁহার ঘটিত না।

ছেলেবেলায় রাজকুমার বাবুর পিতার মৃত্যু হয়। সংসারের অবস্থাও বড় ভাল ছিল না এবং সহায় সম্বলও বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও সততার গুণে কালে তিনি একজন প্রধান ধনী হইয়াছিলেন। কিন্তু ধনী হইয়াও তিনি নিজে অতি সাধারণ ভাবেই থাকিতেন। ছেলেবেলায় টাকা কড়ির অভাবে নিজে যে কষ্ট পাইয়াছেন তাহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া গরীব দুঃখী দিগকে তিনি অকাতরে দান করিতেন। অনেক গরীব ছেলে তাঁহার আশ্রয় পাইয়া, লেখা পড়া

শিখিয়া মানুষ হইত। তাঁহার বাড়ীতে একটি ছোট খাট স্কুলের মত ছিল। একটি খুব বড় ঘরে এই সকল ছেলেরা পড়িতে বসিত। রাজকুমার বাবুর ছেলেও সেই ঘরে বসিয়া পড়িত, এবং যে শিক্ষক রাজকুমার বাবুর ছেলেকে পড়াইতেন, ইহাদিগকেও তিনিই পড়াইতেন। রাজ কুমার বাবু নিজের ছেলে, ও তাঁর আশ্রিত গরীব ছেলেদের মধ্যে কোন প্রভেদ করিতেন না। তাঁর নিজের ছেলে যাহা খাইত, যাহা পরিত, অন্য ছেলেরাও তাহাই খাইত ও পরিত।

রাজকুমার বাবুর ছেলেটির নাম সুধীর কুমার। ছেলেটি তাঁহার নিজেরই মত ধীর শান্ত হইবে এই আশা করিয়াই বোধ হয় নামটি সুধীরকুমার রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয় নাই। সুধীরকুমার একদিনের জন্য আপন নামের গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই। অমন অশিষ্ট ছেলে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজকুমার বাবু নিজে অতিশয় ভালমানুষ ছিলেন; শত অপরাধ করিলেও তিনি কাহাকেও শাস্তি দিতে পারিতেন না, কঠিন কথাটি পর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও কহিতে পারিতেন না। শাসন ছিল না, কাজেই ছেলে ভারি অশিষ্ট হইয়া উঠিল, সে কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। ছেলের স্বভাব প্রকৃতি দেখিয়া রাজকুমার বাবু মনে বড়ই কষ্ট পাইতেন এবং তাহাকে কত বুঝাইতেন, কত উপদেশ দিতেন; কিন্তু তাহা ছেলের মনে স্থানও পাইত না।

বাপের অত টাকা কড়ি, এবং সে তাঁর একমাত্র ছেলে, তাহাকে আর কে পায়? পড়া শুনায় তাহার মন ছিল না; অন্য ছেলেদিগকে সে বলিত, "তোদের মত কি আমার চাকরি ক'রে খেতে হবে যে আমি অত কষ্ট ক'রে লেখা পড়া শিখ্‌তে যাব? আমার কিসের ভাবনা, খালি মজা করে বেড়াই, তোরা প'ড়ে প'ড়ে মর।" রাজকুমার বাবু অন্য ছেলেদের সঙ্গে যে তাকে সমান করিয়া রাখিতেন, এটা তাঁহার উপর তার একটা মস্ত আক্রোশের কারণ হইয়াছিল। সে বড় মানুষের ছেলে, সে কেন গরীব ছেলের মত খাইবে পরিবে!

এই সকল ছেলেদের মধ্যে নিরঞ্জন নামে একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি নিতান্ত অনাথ, মা বাপ কেহই ছিল না, থাকিবার মধ্যে একটি মাত্র ছোট বোন। নিতান্ত অনাথ দেখিয়া রাজকুমার বাবু তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। নিরঞ্জনের স্বভাবগুণে রাজকুমার বাবু তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। অমন ছেলে প্রায় দেখা যায় না। অমন ধীর নম্র অমন শিষ্ট শান্ত, অমন সৎ ছেলে তাহাদের মধ্যে একটিও ছিল না। কিন্তু সুধীর কুমার ইহাকে মোটেই দেখিতে পারিত না। রাজকুমার বাবু তাহাকে ভাল বাসেন, যত্ন করেন দেখিয়া তাহার রাগ হইত। সে মনে করিত, তিনি তার চেয়ে নিরঞ্জনকে অধিক ভাল বাসেন ও যত্ন করেন। যত বয়স বাড়িতে লাগিল, নিরঞ্জনের উপর সুধীরের এই রাগ ও আক্রোশ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। প্রথমে সে কিছু কহিত না, ক্রমে সে দু এক কথা কহিতেও আরম্ভ করিল। সুযোগ পাইলেই সে নিরঞ্জনকে দু কথা শুনাইয়া দিত। নিরঞ্জন গরীব, তাদের আশ্রয় না পাইলে তাহাদিগকে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত ইত্যাদি অনেক কথায় সে নিরঞ্জনকে ব্যথা দিয়া নিজের আক্রোশ মিটাইতে চেষ্টা করিত। কিন্তু আক্রোশ বড় মিটিত না। নিরঞ্জনের এমন স্বভাবই নয় যে, সে কাহারও সহিত ঝগড়া বিবাদ করিবে। তাহাকে অন্য কেহ গালি দিলেও সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত, আর এ ত তাহার আশ্রয় দাতার ছেলে। ইহার কথাটির জবাব দেওয়া কি তাহার সাজে? সুধীর যাহাই কেন বলুক না, সে চুপ করিয়া শুনিয়া যাইত। কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করিতে

গেলে সে যদি কথার জবাব না করে তাহা হইলে আরও রাগ হয়, কাজেই সুধীর আরও চটিয়া যাইত। শেষে হয়ত নিরঞ্জন ধীরে ধীরে বলিত, "তা সে ত সত্য কথাই, তোমাদের খেয়েই ত বেঁচে আছি, তোমরা আশ্রয় না দিলে ত ভিক্ষে ক'রেই খেতে হ'ত!" তখন সুধীর বলিয়া উঠিত, "তুমি যে খুব খোষামোদ ক'ত্তে জান, তা আমার বেশ জানা আছে, ঐ খোষামোদেই ত বাবাকে বশ করেছ। কেন, এখন ত বড় হয়েছ, এখন আর কেন পরের গলগ্রহ হয়ে রয়েছ, পরের খোষামোদ করে খাওয়ার চেয়ে খেটে খাওনা কেন? না তাতে বুঝি কষ্ট বোধ হয়; এ দিব্বি বসে বসে আরামে দিন কাট্‌ছে!"

সুধীরের এই সকল কথায় নিরঞ্জন সময়ে সময়ে বড় ব্যথা পাইত, কিন্তু কোন উত্তর করিত না। সে যে টুকু লেখা পড়া শিখিয়াছিল, তাহাতে নিজের দু মুঠা অন্ন সংস্থান করিতে পারিত এবং এক এক সময় মনে করিত, লেখা পড়া ছাড়িয়া দিয়া সে সেই চেষ্টাই করিবে। কিন্তু সে ত একা নয়, তার যে একটি অনাথা বোন আছে, তার দশা কি হইবে? এক দিকে যেমন এই কথা ভাবিত, অন্য দিকে আবার রাজকুমার বাবুর কথাও তার মনে জাগিত। পড়া শুনায় তাহার মনযোগ দেখিয়া রাজকুমার বাবু তাহাকে খুব উৎসাহ দিতেন এবং সে যতদিন পড়িবে, তিনি তাহার ব্যয় দিবেন এমন আশা দিয়াছিলেন। সুতরাং লেখা পড়া শিখিয়া বি, এ, এম এ পাশ করিয়া সে মানুষ হইবে সে আকাঙ্ক্ষাটিও তাহার ছিল।

ছেলেরা যে ঘরে বসিয়া পড়িত, তাহারই পাশের একটি ঘরে রাজকুমার বাবু বসিতেন, লেখা পড়া, কাজ কর্ম্ম সমস্তই সেই ঘরে বসিয়া করিতেন।

একদিন রাজকুমার বাবু নিরঞ্জনকে ডাকিয়া একখানি চিঠি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "নিরঞ্জন এই চিঠি খানি নিয়ে একবার ব্যাঙ্কে যাও, ব্যাঙ্কের দেওয়ান মুরলীধর বাবুর হাতে দিও, আর কারও হাতে দিও না এবং পথে কোথাও দেরী ক'রো না; চিঠির জবাব নিয়ে আস্‌বে, খুব দরকারী চিঠি।" চিঠি খানি লইয়া নিরঞ্জন তখনই ব্যাঙ্কে চলিয়া গেল। সে মুরলীধর বাবুকে চিনিত; সুতরাং তাঁহাকে খুঁজিয়া লইতে তাহার বড় বিলম্ব হইল না, তাঁহার ঘরে গিয়া চিঠি খানি তাঁর হাতে দিল। মুরলীধর বাবু তাহাকে বসিতে বলিয়া চিঠি খানি খুলিলেন। চিঠি খানি পড়িয়া তিনি কাগজ খানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন, লেপাফা খানার ভিতরটাও একবার দেখিলেন, তার পর একটু ব্যস্ত হইয়া এদিক ও দিক দেখিতে লাগিলেন, যেন কি খুঁজিতেছেন। তার পর নিরঞ্জনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ চিঠিতে কি ছিল তা তুমি জান?" নিরঞ্জন বলিল, "না আমি তা কিছুই জানিনা।" মুরলীধর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ চিঠি নিয়ে অন্য কোথাও গিয়েছিলে বা আর কারও হাতে দিয়েছিলে?" নিরঞ্জন বলিল, "না, চিঠি নিয়ে বরাবর আমি আপনার কাছেই আস্‌ছি, অন্য কোথাও যাইনি, এবং আর কারও হাতেও দি নাই।" মুরলীধর বাবু তখন চিঠি খানা নিরঞ্জনের হাতে দিয়া বলিলেন, "পড় দেখি চিঠিতে কি লেখা আছে।" নিরঞ্জন চিঠি খানা লইয়া পড়িয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে চিঠি খানা মুরলীধর বাবুর হাতে দিয়া বলিল, "মহাশয় আমি এর কিছুই জানি না, আমি ঘরে ব'সে পড়ছিলাম, রাজকুমার বাবু আমাকে ডেকে চিঠি খানা আপনার কাছে নিয়ে আস্‌তে বল্লেন, আমি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে চিঠি খানা নিয়ে বরাবর আপনার কাছে আস্‌ছি, এতে হাজার টাকার নোটের কথা লেখা দেখ্‌ছি,

কিন্তু আমি ত তার কিছুই জানি না, চিঠির ভিতরে সে নোট থাক্‌লে তা কি ক'রেই বা যাবে! মুরলীধর বাবু বলিলেন, "আমিও ত তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, নোট কোথায় গেল? তিনি চিঠির ভিতরে নোট পূরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তুমি নিজেই বল্‌ছ, তুমি আর কারও হাতে এ চিঠি দাওনি, তবে এ নোট তুমি ছাড়া আর কে নেবে?" মুরলীধর বাবুর এই কথা শুনিয়া নিরঞ্জন একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল. তাহার মুখে আর কথা সরিল না; অতি কষ্টে একবার বলিল, "মহাশয় আমি ইহার কিছুই জানি না।"

মুরলীধর বাবু তাহাকে সেই খানে বসিতে বলিয়া এক খানি চিঠি লিখিয়া তৎক্ষণাৎ একজন লোক রাজকুমার বাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। রাজকুমার বাবু সেই চিঠি পাইয়া আমাকে দেখাইলেন এবং আমাকে ও আমাদের আর একটি বন্ধু সেখানে ছিলেন, তাঁহাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ ব্যাঙ্কে গেলেন।

আমরা একেবারে মুরলীধর বাবুর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাজকুমার বাবুকে দেখিয়া নিরঞ্জন একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। রাজকুমার বাবু নিরঞ্জনকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, তাহাকে অতিশয় সৎ বলিয়াই জানিতেন এবং তাহার উপর তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল। ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই কারবার করিতে হইত এবং মধ্যে মধ্যে নিরঞ্জনের হাতে ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাইতেন, এ বিষয়ে তিনি তাঁর ছেলেকে বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু নিরঞ্জনের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। রাজকুমার বাবু তাহাকে এত স্নেহ করেন, এত বিশ্বাস করেন, আজ তাঁর সে বিশ্বাস চলিয়া যাইবে, তিনি তাহাকে চোর মনে করিবেন, এই চিন্তায় তাহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল; তাই সে তাঁহার আশ্রয়দাতাকে দেখিয়া যাতনায় কাঁদিয়া ফেলিল। রাজকুমার বাবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নিরঞ্জন তোমাকে আমি আমার ছেলের চেয়ে অধিক স্নেহ ক'রতাম, তোমাকে অতিশয় সৎ ও সাধু ব'লে আমার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তুমি আমার সে বিশ্বাস রাখ্‌তে পারিলে না। যা হ'ক, তুমি ছেলে মানুষ, লোভ সাম্‌লাতে না পেরে যা ক'রেছ, সে জন্য তোমাকে আমি ক্ষমা কচ্ছি, এখন নোট খানা বের ক'রে দাও।" নিরঞ্জন রাজকুমার বাবুর পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমি আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি. আমি এর কিছুই জানি না, চিঠির ভিতরে যে নোট ছিল, তাও আমি জান্‌তাম না। আমি আপনার আশ্রয়ে থেকে আপনার অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে এমন কাজ কেন করবো? আর আমার কিসেরই বা অভাব; আপনি আমায় যে যত্ন করেন, আমার মা বাপ থাক্‌লেও ত এত যত্ন ক'রতেন না।" রাজকুমার বাবু বলিলেন, "নিরঞ্জন আমি এখনও সে বিশ্বাস কত্তে পাচ্ছিনে যে তুমি একাজ করেছ, কিন্তু যা ঘটনা দেখ্‌ছি তাতে বিশ্বাস না করেই বা কি করি? আর আমার কাছে গোপন ক'রো না, তা হ'লে আমায় বাধ্য হ'য়ে তোমাকে পুলিশের হাতে দিতে হবে।" নিরঞ্জন তখন চক্ষের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অতি কাতর ভাবে রাজকুমার বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি এ নোট নি নাই, কিন্তু যদি সে কথায় আপনি বিশ্বাস না করেন, যদি আমার উপর আপনার বিশ্বাসই চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে পুলিসের হাতে দেন, তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই।" রাজকুমার বাবু বলিলেন, "তুমি ছেলে মানুষ, বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, ভাল ক'রে বুঝে দেখ, নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ক'রো না।" নিরঞ্জন বলিল, "আমি এ নোট নি নাই তা আমি আগেই বলেছি, এখন আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন।"

(আগামী বারে শেষ হইবে)

সীলের ভালবাসা।

সীল ও তিমিকে অনেকে মাছ বলেন। কিন্তু উহারা মাছ নয়। ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের জলজন্তু। সীলেদের চারিখানি ছোট ছোট পা আছে, তার দু খানি নৌকার দাঁড়ের মত। এই

দু খানি পা দিয়া ইহারা জলে খুব দ্রুত সাঁতরাইতে পারে। পায়ের আঙ্গুল গুলি চামড়া দিয়া জোড়া। ইহাদের গায়ে লোম আছে। সীলকে পুষিলে পোষ মানে এবং কুকুরের মত প্রভুকে ভালবাসে।

একবার বিলাতের কোন পশুশালায় একটা সীল রাখা হইয়াছিল। একজন নাবিক প্রায়ই এই পশুশালা দেখিতে যাইত এবং সীলটিকে খাবার দিত। সীলটির সহিত ইহার ক্রমে এত বন্ধুত্ব হইয়া উঠিল যে, দূর হইতে দেখিলেই সে মুখ বাড়াইয়া দিত এবং আনন্দে এক রকম শব্দ করিত। দিন দিন যেন তাহাদের বন্ধুত্ব বাড়িতে লাগিল। নাবিক আসিয়াই তাহার পিঠে হাত বুলাইত এবং বলিত "বাচ্চা কেমন আছিস।" সীলটাও তাহার কোলে উঠিবার চেষ্টা করিত। নাবিক তাহাকে ঘাড়ে লইত, পিঠে লইত, আদর করিয়া তাহার মুখে চুমো খাইত। সীলটাও তাহাকে এমন ভাল বাসিত যে, সে নিকটে আসিলেই মুখ বাড়াইয়া তাহার চুমো লইতে যাইত।

সীলের ভালবাসার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। যাঁহারা পুরাতন 'সখা' পড়িয়াছেন তাঁহাদের হয়ত 'একটি অন্ধ সীলের কথা' মনে থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের হয়ত আর এখন "সখা ও সাথী" পড়িবার বয়স নাই। এখনকার পাঠক পাঠিকারা অনেকেই হয়ত সে গল্পটা জানেন না। তাঁহাদের জন্য আমরা সেই গল্পটা সংক্ষেপে আবার বলিতেছি।

একবার একজন ভদ্রলোক একটা সীল ধরিয়া আনিয়াছিলেন। সীলটা অল্প দিনের মধ্যেই বেশ পোষ মানিয়াছিল। সে পোষা কুকুরের মত ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইত, বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিত এবং রাত্রে উনানের ধারে শুইয়া থাকিত। ভদ্র লোকটির বাড়ী ছিল সমুদ্রের ধারে, সীলটা রোজ মাছ ধরিয়া আনিয়া প্রভুকে দিত।

এই রকম করিয়া ক্রমে সে বাড়ীর সকলেরই আদুরে হইয়া উঠিল। অনেক দিন এই রকমে কাটিয়া গেল। চারি পাঁচ বৎসর পরে ভদ্রলোকটির গোয়ালে মড়ক উপস্থিত হইল। ভাল ভাল গোরু গুলি একে একে মরিতে লাগিল। ভদ্রলোকটি পাড়ার এক বুড়ী ওঝাকে ডাকিয়া আনিল। সে গোরুর চিকিৎসা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার বিদ্যায় কুলাইল না। সে বেগতিক দেখিয়া বলিল "ঐ যে জানোয়ারটা পুষেছ, ওরই জন্যে তোমার এত অমঙ্গল হচ্ছে; ওকে না তাড়ালে আমি গোরুগুলোকে ভাল করতে পারবো না।" ভদ্রলোকটি আর কি করেন, সীলটাকে নৌকা করিয়া লইয়া গিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া আসিলেন। তাহার পর দিন বিকাল বেলায় ঝি আগুন জ্বালিতেছে, এমন সময় দরজাটা কে যেন আঁচড়াইতেছে শুনিতে পাইল। সে দ্বার খুলিয়া দেখে সীলটি আসিয়া হাজির। সে তাহার পুরাতন বন্ধুদের দেখিয়া ভারি খুসী হইল এবং আনন্দে আটখানা হইয়া একরকম শব্দ করিতে লাগিল এবং রাত্রে আস্তে আস্তে সেই উনানের ধারে গিয়া শুইয়া রহিল। বাড়ীর কর্ত্তা সেই সীলটা ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়াই ভয়ে অস্থির। তখন আবার বৃদ্ধার পরামর্শ চাহিলেন। সে বলিল "ইহাকে একেবারে মারিয়া ফেলিয়া কাজ নাই, ইহার চোখ দুটি অন্ধ করিয়া আবার সমুদ্রে ফেলিয়া দিন।" কর্ত্তা মড়কের ভয়ে এই নিষ্ঠুর প্রস্তাবেই রাজি হইলেন। সেই পুরাতন উপকারী বন্ধুর চোখ দুটি অন্ধ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইল।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আটদিনের দিন ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল; ঝড় বৃষ্টির সময় শুনা গেল, কে যেন বাহিরে দরজার কাছে ধীরে ধীরে কাঁদিতেছে। সকাল বেলায় যখন বাড়ীর সদর দরজা খোলা হইল, তখন দেখা গেল সেই সীলটি সিঁড়ির উপর

মরিয়া রহিয়াছে। বেচারি আগে বেশ মোটা সোটা ছিল, কিন্তু এই কদিনের অনাহারে একেবারে রোগা হইয়া গিয়াছে, অন্ধ হইয়া আর মাছ ধরিয়া খাইতে পারে নাই। কিন্তু এই জন্তুর কি আশ্চর্য্য প্রভুভক্তি ও ভালবাসা। যাহারা তাহার প্রতি বিনা দোষে এমন ভয়ানক নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছে, সে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গ ছাড়ে নাই।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু বি, এ।

মৃগ শিশুর প্রতি।

পথভুলে আসিলি হেথায়
ছায়াময় সন্ধ্যালোকে
কোন্ তারকায় তোকে
দেখাইল এ শূন্য আশ্রয়?

পথ হারা পথিক এখানে
আসে না, কুটীর দ্বারে
প্রাতে সন্ধ্যা দ্বিপ্রহরে
স্তব্ধতা ঘুমায় নিরজনে।

গৃহস্থের স্বজন আশ্রম
হারাইয়া, দিক্ ভ্রান্ত
দুধের-শাবক শ্রান্ত
হেথা এলি লভিতে বিশ্রাম?

সযতনে পালিত কাহার
মৃগ শিশু, তুই ওরে
মার কোল খালি করে
হৃদি গেহ করিলি আঁধার?

বিলাপের মৃদুল নিশ্বাসে
সকরুণ নেত্রে কেন
মুখ পানে চাস্ হেন
কিবা ভিক্ষা আমার সকাসে?

বালিকার সুকর-কমল
কচি নব তৃণ দল
স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী জল
মমতায় যোগায় কেবল।

তাহে হয়ে পরিতৃপ্ত হিয়া
সদানন্দে কর খেলা
শৈশবের সারাবেলা
একুটীরে জীবন ঢালিয়া।

শ্রীনীহারিকা রচয়িত্রী

খাবার।

খাবার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ভিন্নতা দেখা যায়। কিন্তু কতকগুলি জিনিষ প্রায় সকল দেশেই সকল জাতির মধ্যে ব্যবহৃত হয়। লুণ, চিনি, ঘি, তেল না হইলে কোন জাতির এক দিনও চলিতে পারে একথা আমাদের বিশ্বাস হয় না। অথচ এ সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিস্তর বিভিন্নতা দেখা যায়। কোন জাতি হয়ত ভাত খায়, রুটী খায় না; কোন জাতি হয়ত রুটী খায়, ভাত খায় না। কেহ মাছ খায়, মাংস খায় না; কেহ মাংস খায়, মাছ খায় না। আবার কোন জাতি এক রকমের মাছ বা মাংস খায়, কিন্তু অন্য রকমের খায় না। কতকগুলি জিনিনের এখন খুব প্রচার থাকিলেও আগে এত প্রচার ছিল না।

(১) এখন বিলাতের ধনী দরিদ্র সকলেই চা খায়। তিন শত বৎসর আগে বিলাতে কেহ চার নামও শুনে নাই। এখন এক টাকায় আধসের ভাল চা পাওয়া যায়। বিলাতে যখন প্রথম চার আমদানী হয়, তখন পঞ্চাশ ষাট টাকা করিয়া আধসের চা বিক্রয় হইত।

(২) এখন তামাক ঘরে ঘরে। কি যুরোপে কি আসিয়ায়, অধিকাংশ লোক তামাক খায়। এ তামাক প্রথমে আমেরিকা হইতে আমদানী হইয়াছিল। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যুরোপে এবং পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ইহার ব্যবহার ছিল না।

(৩) তেঁতুল বড় উপকারী। শুনা যায় বিলাত হইতে একজন ডাক্তার এদেশে আসিয়া তেঁতুল গাছ দেখিয়া বিলাতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, যে দেশে তেঁতুল গাছ আছে সেখানে কোন রোগ থাকিতে পারে না। তেঁতুল সজিনা প্রভৃতি বৃক্ষ আগে আমাদের দেশে ছিল না। সিংহল ও ভারত সাগরের দ্বীপ হইতে ইহারা আমাদের দেশে আসিয়াছে। তেঁতুলের এখন এত প্রচার যে, কবিতায়ও ইহার সুখ্যাতি গান করা হয়

"তিন্তিড়ী ঘ্রাণ মাত্রেণ
অন্নং চলতি পঙ্কবৎ"

(৪) আয়র্লণ্ডের লোকের প্রধান খাদ্য গোল আলু। আমাদের দেশে আগে আলু ছিল না। এজন্য সাত্ত্বিক হিন্দু ও বিধবাগণ আজ পর্য্যন্ত আলু খান না ও দেবতার ভোগে আলু দেওয়া হয় না। পূর্ব্বে যুরোপেও আলুর ব্যবহার ছিল না। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আলুর প্রথম আমদানী হয়। তখন লোকে ইহা শূকরকে খাইতে দিত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোক কপি চিনিত না।

(৫) চিনির ব্যবহার আমাদের দেশ হইতে যুরোপের লোকেরা শিখিয়াছে। যুরোপ, পশ্চিম এসিয়া ও আমেরিকার লোকে মিষ্টতার জন্য মধু ব্যবহার করিত। বাইবেলে চিনির জায়গায় বরাবর মধুর উল্লেখ আছে।

(৬) এখনও ভারতবর্ষে অনেক অসভ্য জাতি আছে যাহারা দুধ খায় না। রাজসাহী অঞ্চলে প্রাচীন কালে পৌণ্ড্র বা পোঁড়া নামে এক অসভ্য জাতি বাস করিত, তাহারা দুধের ব্যবহার জানিত না। ইহাদের অনেকে এখন জলপাইগুড়ি জেলায় ও নেপালের তরাইএ বাস করে। চট্টগ্রামের লুসাই জাতি গোমাংস খায়, করে কিন্তু গরুর দুধ খায় না।

(৭) লবণ বড় উপকারী। পশু পক্ষীরা পর্য্যন্ত লবণ খাইতে ভালবাসে। কিন্তু কোন কোন দেশে ইহা এত দুষ্প্রাপ্য যে অসভ্য

জাতির অনেক লোক ইহা কখন চক্ষেও দেখে নাই। মঙ্গো পার্ক আফ্রিকার জঙ্গলে ভ্রমণ-কালে দেখিয়াছিলেন যে, লবণ একটি বিলাস দ্রব্য বলিয়া তথায় পরিগণিত হয়। যে লুণ খায়, তাহাকে সকলে বড় ধনী বলিয়া জানে।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ।

টাকার তোড়া।

সে আজ প্রায় চল্লিশ বছরের কথা। তখন আমি দিল্লীর কমিসনার ফ্রেজার সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিতাম। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়, এ সেই সময়ের কথা।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে সোমবার খুব ভোরে আমরা সংবাদ পাইলাম যে, মিরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া সেখানকার ইংরাজ দিগকে হত্যা করিয়াছে এবং ইংরাজদিগের সমস্ত গৃহে আগুণ দিয়া ও লুটপাট করিয়া নগরটি একেবারে উৎসন্ন দিয়াছে।

কমিসনার ফ্রেজার সাহেব আমাকে একটু ভাল বাসিতেন এবং যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন। মিরাটের সংবাদ পৌছিলে তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং আমি উপস্থিত হইলে আমাকে বলিলেন, "মিরাটের সংবাদ শুনেছ?" আমি বলিলাম "হাঁ শুনেছি; বিদ্রোহী সিপাহীদের এখন এ দিকে আসাও আশ্চর্য্য নয়।" সাহেব বলিলেন, "সে আশঙ্কা খুবই আছে, আর সেই জন্যই তোমাকে আমি ডেকেছি। আজ হউক, কাল হউক সিপাহীরা দিল্লীতে আস্‌বে এবং হয়ত এখানকার সিপাহীরাও তাদের সঙ্গে জুঠ্‌বে। কিন্তু দিল্লী রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা কর্ত্তে হবে। মিরাটের যে রকম সংবাদ শুনলাম, তাতে স্ত্রীলোক ও ছেলে পিলেদের এখানে রাখা কোন মতেই উচিত নয়। আমি অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সে বিষয়ে বন্দোবস্ত কর্ত্তে বলে দিয়েছি। তোমাকেও একটি কাজ কর্ত্তে হবে। সিপাহীরা বিদ্রোহী হলে আমায় যে কি রকম ব্যস্ত থাকৃতে হবে তা তুমি বুঝ্‌তেই পাচ্ছ; তখন আমি আর কোন দিকই দেখ্‌তে অবসর পাব না। তোমাকে আমি বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসী বলে জানি. আমার স্ত্রীর রক্ষার ভার আমি তোমার উপর দিলাম। কিসে দিল্লী রক্ষা হইবে সেই চিন্তাই এখন আমার প্রধান, অন্য কোন চিন্তার অবসর আমার এখন নাই; কোন বিপদ হলে তুমি তাঁকে রক্ষা করবে, আমি তোমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।" সাহেব নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু আমি সাহেবের কথায় চিন্তিত হইলাম। যে রূপ ব্যাপার তাহাতে সিপাহীরা দিল্লীতে একটা গোলযোগ নিশ্চই ঘটাইবে, তখন কি উপায়ে মেম সাহেবকৈ রক্ষা করিব? সিপাহীদের শাসনে না রাখিতে পারিলে তাহারা ত ইংরাজ দেখি-লেই হত্যা করিবে। সুতরাং মেম সাহেবকে রক্ষা করা সহজ হইবে না। সিপাহীরা আমাকে হয়ত কিছু বলিবে না, কিন্তু মেম সাহেবকে আমার সঙ্গে দেখিলে আমাকে ছাড়িবে না। মেম সাহেবকেও রক্ষা করিতে পারিব না, আমারও প্রাণ যাইবে। কিন্তু দেখিলাম সে কথা ভাবিয়া কোন ফল নাই। সাহেব যখন আমার হাতে এক জনের প্রাণ রক্ষার ভার দিলেন, তখন যে প্রকারেই হউক আমাকে সে চেষ্টা করিতে হইবে; এখন আর নিজের

প্রাণের মমতা করিলে চলিবে না। তখন আমি সাহেবকে বলিলাম "প্রাণপণে আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে চেষ্টা করব, কিন্তু এ গুরুতর ভার আপনি অতি অনুপযুক্ত লোকের হাতে দিলেন।" সাহেব বলিলেন, "আমি অনেক বিবেচনা করেই তোমার হাতে এ ভার দিচ্ছি। সিপাহীরা যদি বিদ্রোহী হয়েই ওঠে, তাহা হলে সে সময়ে গায়ের জোরের চেয়ে বুদ্ধির জোরেই বেশী কাজ হবে।" সাহেবের কথা শেষ না হইতেই একজন চাপরাসী আসিয়া সাহেবের হাতে একখানি পত্র দিল, সাহেব পত্র খানি খুলিয়া পড়িয়া বলিলেন, "যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হল, মিরাট থেকে বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লীর দিকে ছুটেছে। আমার এখন আর কথা বলবার সময় নাই, তোমারও আর এখানে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই। আমার কাছে আর কোন কথা বা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করবারও দরকার নাই, তুমি যা ভাল বুঝ্‌বে তাই করবে, আমাকে জানাবারও দরকার নাই।" এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া মেম সাহেবের কাছে লইয়া গেলেন, এবং সংক্ষেপে তাঁহাকে সমস্ত বলিয়া কিছু টাকা আমার হাতে দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। টাকা গুলি মেম সাহেবের কাছে রাখিয়া একবার আমি বাসার দিকে গেলাম।

আমার বড়ই ভাবনা হইল। বিদ্রোহী সিপাহীরা ত এখনই আসিয়া পড়িবে, কি করিয়া মেম সাহেবকে রক্ষা করিব! পথে যাইতে যাইতে একটা বুদ্ধি যোগাইল। আমি অকস্মাৎ একটা দোকানে গিয়া একটি পুরুষের ও একটি স্ত্রীলোকের মুসলমানী পোষাক কিনিলাম। তার পর বাসায় গিয়া টাকা কড়ি যাহা ছিল কেবল তাহাই মাত্র লইয়া, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মেম সাহেবের কাছে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি সাহেব ঘরে রহিয়াছেন, তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "আর বিলম্ব করো না, সিপাহীরা এখনই আস্‌বে।" আমি বলিলাম, "আমি প্রস্তুত হয়েছি, এই মুসলমানের পোষাকটি মেম সাহেবকে পরতে বলুন এবং আমাকে একটি উট দিতে আজ্ঞা করুন।" সাহেব বলিলেন, "উট কেন, তার চেয়ে ঘোড়া লও।" আমি বলিলাম "যখন আমার উপর সমস্ত ভার দিয়েছেন, তখন আমি যা চাই আমাকে তাই দেন, ঘোড়ায় আমার কাজ হবে না।" সাহেব আর কোন কথা না বলিয়া, আস্তাবল হইতে একটি উট আমাকে আনাইয়া দিলেন। আমি পাশের এক ঘরে গিয়া কাপড় বদ্‌লাইয়া মুসলমানী পোষাক পরিলাম, মেম সাহেবও মুসলমানী পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইলেন। আর অধিক বিলম্ব করিবার সময় ছিল না, সাহেবের কাছে বিদায় লইয়া আমরা বাহির হইলাম।

যদিও আমরা মুসলমান সাজিয়া বাহির হইয়াছিলাম, তথাপি আমার আশঙ্কা দূর হইল না। আমাদের কাছে অনেক গুলি টাকা ছিল, এই টাকার তোড়া লইয়া পথে চলিতে আমার সাহস হইল না। আমির খাঁ নামে তখন দিল্লীতে একজন ধনী মহাজন ছিলেন; তাঁর মত সৎলোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল। টাকা গুলি তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখিয়া যাওয়াই আমার ভাল বোধ হইল। সুতরাং আমরা প্রথমেই আমির খাঁর বাড়ী গেলাম। মেম সাহেব উটের উপর রহিলেন, আমি উট হইতে নামিয়া টাকা গুলি লইয়া, আমির খাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া টাকা গুলি তাঁহার কাছে গচ্ছিত রাখিতে চাহিলাম। তিনি আমাকে আদর করিয়া বসাইয়া বলিলেন, "কি বাবু সাহেব, খাঁ সাহেব হ'লেন কবে!" আমি বলিলাম, "এই আজই, খাঁ সাহেব হয়েই আপনার কাছে

প্রথম এসেছি। কিন্তু সে কথা যাক্, আমার দেরী করবার সময় নাই, আপনি এই টাকার তোড়াটি রেখে আমাকে একখানা রসিদ দেন।” গণিয়া লইয়া আমাকে এক খানি রসিদ দিলেন, আমিও সেলাম করিয়া বাহির হইলাম।

দিল্লীর তিন ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে আমার
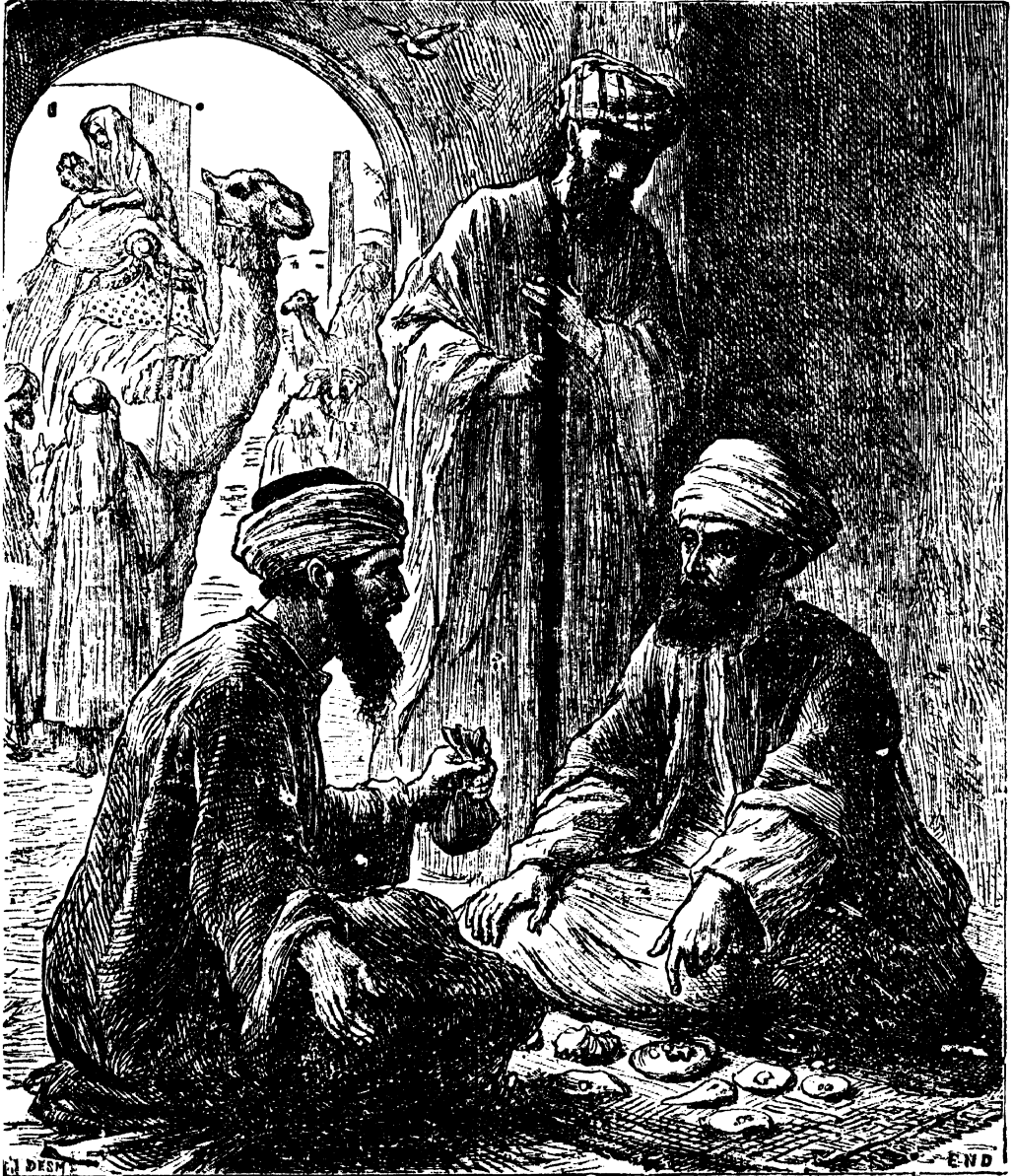
আমির খাঁ আমাকে ব্যস্ত দেখিয়া আর বেশী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। টাকা গুলি এক হিন্দুস্থানী বন্ধুর বাড়ী। মেম সাহেবকে আমি সেই থানে লইয়া যাইতেছিলাম।

সেখানে একবার পৌঁছিতে পারিলে মেম সাহেবের কোন বিপদ হইবে না আমি জানিতাম। কিন্তু সে গ্রামে যাইতে হইলে মিরাটের পথে যাইতে হয়। বিদ্রোহী সিপাহীরাও সেই পথে দিল্লীর দিকে আসিতেছে, সুতরাং আমার বড়ই চিন্তা হইল। কিন্তু যাহাই হউক, ভগবানের নাম লইয়া বাহির হইলাম; মনে করিলাম বিদ্রোহী সিপাহীরা পৌঁছিবার পুর্ব্বেই আমরা চলিয়া যাইতে পারিব। আমরা নির্বিঘ্নে দুক্রোশ চলিয়া গিয়াছি, ইহার মধ্যে সিপাহীদের কোন সাড়া শব্দ পাই নাই। তখন ভরসা হইল বুঝি রক্ষা পাইলাম। কিন্তু আর খানিকটা গিয়াই দেখিতে পাইলাম, অনেকগুলি লোক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ভয়ঙ্কর চিৎকার করিতে করিতে দিল্লীর দিকে আসিতেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম, ইহারাই বিদ্রোহী সিপাহী। মেম সাহেব তাহাদিগকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছা যাইবার মত হইলেন, আমি তখন কোন দিক দেখি! যাহা হউক মেম সাহেবকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম "একটু স্থির হয়ে থাকুন, নতুবা এখনি সিপাইদের হাতে মরতে হবে, ওড়না খানা মাথায় বেশ করে টেনে দিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকুন, সিপাহীরা চিন্‌তে পারলে আর রক্ষা থাকবে না।" তার পর আমি দেখিলাম যদি কোন দিকে পলাইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে সিপাহীদের মনে সন্দেহ হইবে এবং তৎক্ষণাৎ ধরিয়া কাটিয়া ফেলিবে। তার চেয়ে যেমন যাইতেছিলাম তেমনি যাওয়াই ভাল, এই মনে করিয়া আমি সোজা চলিতে লাগিলাম।

দেখিতে দেখিতে সিপাহীরা আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে একজন তলোয়ার ঘুরাইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিল, "কোন হ্যায় তোমলোক?" আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, আমি ধীরে ধীরে বলিলাম "মোছাফির।" দলের মধ্যে হইতে তখন একজন বলিয়া উঠিল, "যানে দেও।" তখন সিপাহীরা আমাদিগকে একটু পাশ দিল, আমরা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলাম; সিপাহীরাও ভয়ঙ্কর চিৎকার করিতে করিতে দিল্লীর দিকে ছুটিল।

অল্পকাল পরেই আমি সেই বন্ধুর বাড়ীতে পৌঁছিলাম এবং তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলাম। তিনি তখনই মেম সাহেবকে একটি ঘরে লইয়া গিয়া তাঁহার থাকিবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এবং আমাকেও থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার একান্ত অনুরোধে সেদিন সেই স্থানেই থাকিতে হইল।

পরদিন আমি দিল্লী ফিরিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম সিপাহীরা দিল্লীতে যে ইংরাজকে পাইয়াছে তাহাকেই হত্যা করিয়াছে, লুটপাট করিয়া এবং আগুন দিয়া ইংরাজদের সমস্ত গৃহ ছার খার করিয়াছে। কমিসনার ফ্রেজার সাহেব দুর হইতে বিদ্রোহীদিগকে দেখিয়া নগরের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়া বগী চড়িয়া চারিদিক দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন, বিদ্রোহীরা তাঁহাকেও হত্যা করিয়াছে।

ফ্রেজার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া আমার আর দিল্লীতে থাকিবার ইচ্ছা হইল না। আমি তখন একবার আমির খাঁর বাড়ী গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, সিপাহীরা আমির খাঁর বাড়ী লুটপাট করিয়া সমস্তই লইয়া গিয়াছে, আমির খাঁও বাড়ীতে নাই। আমি ত একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। এতদিন বসিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, সে সত্তই গেল; তা ছাড়া আবার ফ্রেজার সাহেবের মেমেরও প্রায় দু হাজার টাকা ঐ সঙ্গে ছিল তাহাও গেল। ফ্রেজার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে, মেম সাহেব এখন নিঃসহায়; যে কিছু টাকা ছিল তাহাও গিয়াছে, এখন তাঁহারই বা কি উপায় হইবে?

একটু স্থির হইয়া আমি সেখান হইতে উঠিলাম এবং তখন দিল্লীতে থাকিয়া কোন

লাভ নাই বরং বিপদ ঘটিতে পারে এই মনে করিয়া, সেই বন্ধুর বাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম। মেম সাহেব আমাকে দেখিয়া সাহেবের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমাকে বাধ্য হইয়া সকল কথাই বলিতে হইল। সাহেবের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তিনি চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছা গেলেন। সেই অবধি মেম সাহেব শয্যাগত হইলেন, অনেক চিকিৎসা করান গেল, কোন ফলই হইল না। প্রায় একমাস রোগ ভোগের পর মেম সাহেবের মৃত্যু হইল।

এই ঘটনার ছয়মাস পরে আমি পুনরায় দিল্লী যাই। আমার পৌঁছিবার পর দিনই, কোথা হইতে সংবাদ পাইয়া, আমির খাঁ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। অন্যান্য কথার পর আমির খাঁ বলিলেন, "আমি আপনার কাছে বিশেষ অপরাধী আছি।" আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "আপনার অপরাধ কি? আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে সিপাহীরা আপনার যথা সর্ব্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে; আপনি কি করবেন? যা হবার হয়েছে ও কথা আর তুলবেন না।" আমির খাঁ বলিলেন "আমার সমস্তই সিপাহীরা লুটে নিয়েছিল সত্য, তবে আপনি যে টাকা আমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন, সে টাকাটা যায় নাই। আপনারা যেতে যেতেই সিপাহীরা এসে পড়লো, আমি আর টাকার তোড়াটা তখন সাম্‌লাতে পারলাম না, কাছেই একটা ভাঙ্গা বাক্স ছিল, তার ভিতরেই ফেলে রাখ্‌লাম। এখন দেখ্‌ছি ভাল করে বাক্সে বা সিন্দুকে সাম্‌লে রাখ্‌লেই টাকাটা যেত, ভাঙ্গা বাক্সে ছিল বলে, সিপাহীরা সে দিকে মনোযোগ করে নাই। আমার যথা সর্ব্বস্ব গেলেও আপনার গচ্ছিত টাকাটা যায় নাই। আমি সে টাকা নিয়ে এসেছি; কিন্তু একটি অপরাধ আমি করেছি, সে জন্য আমাকে ক্ষমা কত্তে হবে। আপনি জানেন সিপাহীরা আমার যথা সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছিল; একটি পয়সা আমার সম্বল ছিল না। তখন নিরুপায় হয়ে আপনার ঐ টাকা নিয়ে আমি আবার ব্যবসা আরম্ভ করি। ভগবানের অনুগ্রহে আমার ব্যবসার অবস্থা এই ছমাসের মধ্যেই পূর্ব্বের মত হয়েছে। আমি আপনাকে না বলে যে টাকা নিয়েছিলাম, তার সুদ হিসাব করে সমস্ত টাকাই নিয়ে এসেছি, আপনি টাকা গুলি নিয়ে আমাকে দায়মুক্ত করুন।" আমির খাঁর সততায় আমি অবাক হইয়া গেলাম। তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব গিয়াছিল, তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন যে, আমার গচ্ছিত টাকাও গিয়াছে। কিন্তু দুর্দ্দশায় পড়িয়াও তিনি সৎপথ পরিত্যাগ করেন নাই। শুধু তাহাই নয়, তাঁর কাছে যে টাকা গচ্ছিত ছিল, তার ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া, তাহার সুদ পর্য্যন্ত লইয়া আজ উপস্থিত হইয়াছেন।

আমি টাকাগুলি ফিরাইয়া লইলাম, কিন্তু সুদের টাকা লইতে অস্বীকৃত হইলাম। আমির খাঁ আমার কোন আপত্তি শুনিলেন না, বলিলেন "আমাকে আপনি কেন ঋণী রাখতে চান? আপনার ন্যায্য প্রাপ্য আপনাকে নিতেই হবে," এই বলিয়া টাকার তোড়াটি রাখিয়া চলিয়া গেলেন। সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও কেবল সাধুতার গুণে তিনি অত অল্পকাল মধ্যে পুনরায় পূর্ব্বের অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। সততাই আমির খাঁর সৌভাগ্যের মূল।

যদু ও বিধু।

এক আছে যদু
আর এক আছে বিধু,
দু ভায়েতে ঠিক্ হোলো খেতে হবে মধু,
যদু বলে আমি যাবো তুই থাক্ বিধু।

যদু তখন বাড়ী গেলো
বিধু যায় পিছু,
বাড়ী গিয়ে বলেনিকো
কাহাকেও কিছু।

চুপি চুপি ঘরে গিয়ে
নিয়ে কিছু কানি
জড়ালে সে আঙুলেতে
সেই গুলি আনি।

তার পরেতে দুই ভায়েতে
বাগান পানে ধায়
যেতে যেতে ভয়ে ভয়ে
এদিক্ ওদিক্ চায়।

যদু তখন এগিয়ে গেল
মৌচাকের কাছে,
বিধু হল জড় সড়
বড় ভায়ের পিছে।

কিন্তু যেমন মৌচাকেতে
হাতটি দিলে যদু,
তেমনি সেটি উল্‌টে গেল
ছড়িয়ে গেল মধু।
মৌমাছিরা ছুটে এল
গুন্ গুন্ রবে,
যদু বিধুর মুখে চোকে
কামড়াতে যায় সবে
দেখ্‌লে তারা বিপদ ভারি
করে কি উপায়,
দুই ভায়েতে চৌচাপটে
বাড়ীর দিকে ধায়।

বাড়ী গিয়ে মায়ের কাছে
তখন গেল ছুটে,
দুটি ভায়ের চীৎকারেতে
আকাশ গেল ফেটে।

এরি মধ্যে গোটাকতক
কামড়ানি না খেয়ে,
মুখটি তাদের ফুলে গেছে
চেনা যায় না চেয়ে।
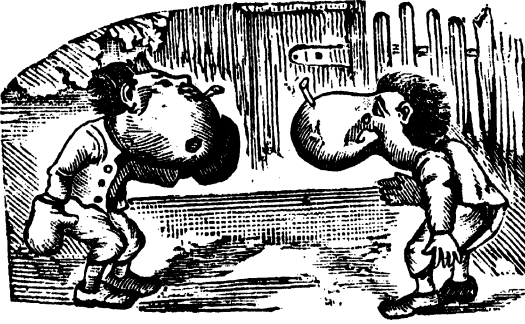
মায়ের কাছে হোলো খানিক
বিশেষ তিরস্কার,
ওষুধ বেটে লাগিয়ে দিলেন
মুখে দুজনার।

বিছানেতে শুতে হোলো
খেতে গিয়ে মধু,
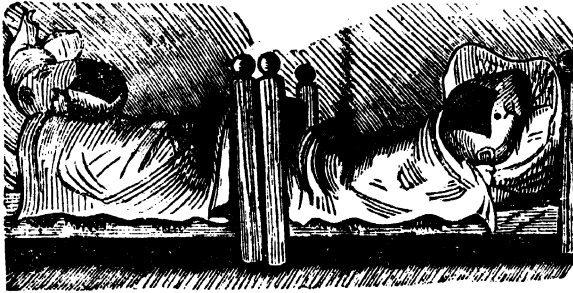
জব্দ হোলো ছেলে দুটি
যদু আর বিধু।

দ্বাদশ বর্ষ | পৌষ ১৩০২ | ৯ম সংখ্যা

চলে আয়।

তোরা হাতে হাতে ধরা ধরি, আয়চলে ধীরি ধীরি—
যাইব জীবন পথে—বেলা ব'হে যায় ;
ঐ যে হিমাদ্রি শিরে, দেবপুর রাজে দূরে
ছাড়িব না, ফিরিব না, না পশি' হোথায়।
এক(ই) চন্দ্র এক(ই) তারা, একই শ্যামলা ধরা
করিতেছে প্রীতিদান আমা সবাকার ;
ভুলিব কলহ দ্বেষ, ধরিব একই বেশ,
ছাড়িবনা এক প্রাণ না হ'লে সবায়।
একতায় বাঁধি প্রাণ, হব সবে আগুয়ান,
নিজে যম এলে পথে করিবনা ভয় ;
বিজয় নিশান নিয়ে, ছুটে যাব গান গেয়ে,
সম্মুখ সমরে পাপে করে পরাজয়।
যে দেশে লক্ষ্মণ বীর, যে দেশেতে যুধিষ্ঠির
আমরাও জন্মেছি সে ভাগ্যবান দেশে ;
এ বড় লজ্জার কথা, সেই রক্ত আছে যেথা,
সে হৃদি পাপের স্রোতে যাবে চলে ভেসে।
অজ্ঞান আঁধার নাশি, হেরিব জ্ঞানের হাসি
উড়াইব বিমানেতে বিদ্যার নিশান ;
এ দেশে জন্মেছে খনা, লীলাবতী, সত্যভামা,
মূর্খ হ'য়ে রহিবেনা তাদের সন্তান।
আয় তবে ধীরি ধীরি, হাতে হাতে ধরা ধরি
পর্ব্বতে উঠিবি কে গো এই বেলা আয় ;
রজনী হয়েছে শেষ, দেখা যায় দেবদেশ,
ফিরিবনা ছাড়িবনা, না পশি' হোথায়।

শ্রীবিজয় কুমার সেন এম, এ।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

অনেক দিন পূর্ব্বে মালবদেশে পদ্মগর্ভ নামে এক সরোবর ছিল। এই সরোবরের ধারে এক বুড়া বক আহারের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইত। বকটা বুড়া হইয়াছিল, চখেও কম দেখিত, কাজেই আর পূর্ব্বের মত মাছ ধরিয়া খাইতে পারিত না। সে কেবল মুখ খানি ভার করিয়া জলের ধারে বসিয়া থাকিত, মাঝে মাঝে লম্বা গলাটা গুটাইয়া চুপ করিয়া চোখ বুঁজিয়া থাকিত। ছোট ছোট মাছগুলি তাহাকে দেখিয়া মনে করিত—

"সরসীর কূলে থাকে ধবলিত কায়
পরম ধার্ম্মিক বক, কভু নিদ্রা যায়,
কভু বা সে মন্দ মন্দ করে বিচরণ।"

বুড়া বক মাঝে মাঝে চোখটা খুলিয়া চাহিয়া দেখিত কোন মাছ নিকটে আসে কি না; আসিলেই এক ঠোকরে তাহাকে ধরিতে পারে। কিন্তু অনেকদিন আর বেচারার কিছুই জুটিলনা; সে অনাহারে দিন দিন একেবারে রোগা হইয়া যাইতে লাগিল।

এক দিন বক কাঁদ কাঁদ হইয়া জলের ধারে বসিয়া আছে, এমন সময় একটা ছোট মাছ তাহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বলিতে লাগিল, "কি মামু, বসে বসে, কি ভাবছ, তোমার মুখে যে আর হাসি নাই, একেবারে রোগা হয়ে গেছ যে।" বক বলিল—"আর বাবাজী তোমাদের দুর্দ্দশা দেখে প্রাণ ফেটে যায়। এই আজ তিন মাস ধরে বৃষ্টির নাম নেই, আর দিন কয়েক পরে এখানকার জল শুকিয়ে যাবে, তখন তোমাদের কি হবে তাই ভাব্‌ছি।" এই কথা শুনিয়া ছোঠ মাছটির বড় ভয় হইল, সে তাড়াতাড়ি গিয়া অন্য মাছদের এই কথা জানাইল। মাছদের মধ্যে একটা ভয়ানক গোলমাল বাধিয়া গেল।

তাহারা সকলে ব্যস্ত হইয়া বকের পরামর্শ লইতে আসিল। সকলে মিলিয়া বাঁচিবার অনেক রকম উপায় স্থির করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই ভাল একটা পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। অবশেষে বক তাহাদিগকে বলিল, "দেখ, এই সরোবর হতে কিছু দূরে একটা খুব বড় হ্রদ আছে; তোমাদের এক এক জন করে যদি আমার সঙ্গে যাও তাহা হলে আমি তোমাদিগকে সেখানে রেখে আস্‌তে পারি। সে হ্রদে অনেক জল আছে, সেখানে তোমরা স্বচ্ছন্দে অনেক কাল কাটাতে পারবে।" মাছেরা প্রাণের দায়ে সেই কথায় রাজি হইল। বক তাহাদিগকে মুখে করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এবং সেই হ্রদে না রাখিয়া তাহার নিকটে এক বড় গাছের উপর রাখিয়া এক একটিকে রোজ মারিয়া খাইতে লাগিল। এই রূপে অনেক দিন ধরিয়া সে যে কত মাছ খাইল তাহার আর সংখ্যা নাই। দেখিতে দেখিতে সেই গাছের তলায় অসংখ্য মাছের কাঁটা স্তূপাকার হইয়া গেল।

ক্রমে এক ধূর্ত্ত কাঁকড়ার যাইবার দিন আসিল। কাঁকড়াটার সেই পুরাতন ধার্ম্মিক বকের উপর কিছু কিছু সন্দেহ হইতেছিল, তবু সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আচ্ছা গিয়েই ত দেখা যাক্।" বকটাও এত বুড়া হইয়াছে, কিন্তু কাঁকড়া কখনও তাহার খাওয়া হয় নাই। সে ভাবিল, "এবার কাঁকড়া খেয়ে দেখ্‌তে হ'বে কেমন লাগে।" কাঁকড়া বলিল, "দাদা, আমার পা টা বড় পেছল, কোথায় সেই মেঘের ওপর থেকে তোমার ঠোঁট পিছ্‌লে প'ড়ে যাব আর অমনি দফাটি নিকেশ্ হবে; দাঁড়াও আমার সাম্‌নের একটা ঠ্যাং দিয়ে তোমার গলাটা আঁক্‌ড়ে ধরি, তা না হ'লে পড়ে যাব।" এই বলিয়া সে বকের

গলাটা ভাল করিয়া ধরিল, বকও তাহাকে মুখে লইয়া উড়িয়া চলিল। কাঁকৃড়া দেখিল

বক তাহাকে হ্রদের মধ্যে না লইয়া একটা গাছে গিয়া বসিল। সেই গাছ তলায় মাছের কাঁটা পর্ব্বতের মত উঁচু হইয়া রহিয়াছে; দেখিয়াই ত তার চক্ষু স্থির। সে তখন মনে মনে ভগবানের নাম করিতে লাগিল। কাঁকড়া বলিতে লাগিল, "কই দাদা, তোমার সে হ্রদ কই, এখানে আন্‌লে যে?" বক মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "এখানে কেন আনলাম তা এখনও বুঝলে
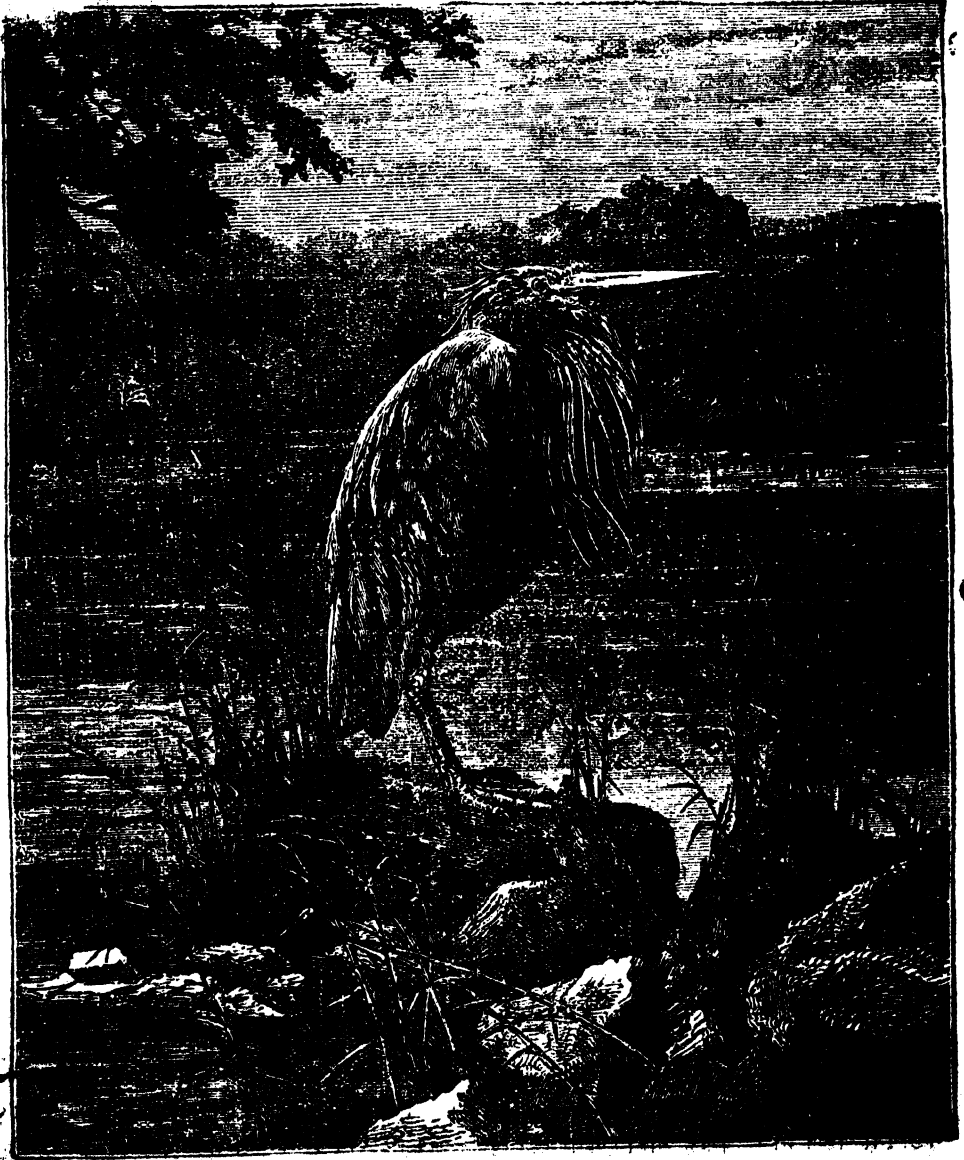
না?” কাঁকড়া তখন সময় বুঝিয়া তাহার গলাটি এমন টিপিয়া ধরিল যে বকের প্রাণ যায়, তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া চোখ দিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। বক বলিতে লাগিল—‘বাবাগো, বাবাগো, গিইছি, ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও, শিগ্‌গির নিয়ে চল।” বক তাড়াতাড়ি তাহাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। কাঁকড়াও তখন বলিল—“যেমন আমাদের সকলকে ফাঁকি দিয়ে মেরেছ, তেমনি তোমায়ও দেখাচ্ছি।” এই কথা বলিয়া তাহার গলাটি এমন টিপিয়া

ভাই, তোমায় মারব না।” কাঁকড়া বলিল, “আমায় যেখান থেকে এনেছ, সেই খানে ধরিল যে, তখনি তাহার মৃত্যু হইল। কাঁকড়াও তখন লাফ দিয়া জলের ভিতর ডুব দিল।

বড়দিনের গল্প।

(শেষ)

ঘটনা যেরূপ তাহাতে নিরঞ্জনই নোট নিয়াছে, নতুবা অন্য কোন প্রকারে এ নোট হারাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহার কথা বার্ত্তায় এবং মুখের ভাব দেখিয়া আমাদের বোধ হইতেছিল সে নির্দ্দোষী। আমাদের বন্ধুটি এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া কেবল নিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, শেষে রাজকুমার বাবুকে বলিলেন, “ওর যদি কোন বাক্স পেট্‌রা থাকে, তবে তাহার চাবি আপনি চেয়ে নিয়ে ওকে বাড়ী যেতে বলুন এবং ওকে বলে দেন যেন কাকেও এ সকল কথা কিছু না বলে। আমি বোধ হয় এ নোটের কিনারা ক’রে দিতে

পারবো।" রাজকুমার বাবু বন্ধুর কথামত কাজ করিলেন। নিরঞ্জনের কোন বাক্স পেট্‌রা ছিল না, পড়িবার ঘরে একটা ডেক্স ছিল, তাহার চাবি চাহিয়া রাখিলেন, সে বাড়ী চলিয়া গেল। আমরাও কিছুকাল পরে বাড়ী পৌছিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। আমাদের সেই বন্ধু রাজকুমার বাবুকে বলিলেন, "আমার বোধ হচ্ছে নিরঞ্জন নির্দ্দোষী, কিন্তু আমি এখনও ঠিক কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। আর যে ছেলেরা আছে, তাদেরও ডেক্সের চাবি আপনি আনান।" চাবি গুলি আনান হইল। তার পর যখন ছেলেরা পড়াশুনা করিয়া শুইতে গেল, তখন সেই বন্ধু আমাদিগকে লইয়া ছেলেদের পড়িবার ঘরে গেলেন, সেখানে গিয়া প্রথমেই নিরঞ্জনের ডেক্স খোলা হইল। খুলিয়া যাহা দেখা গেল, তাহাতে তখন আর কোন সন্দেহই রহিল না; নোট খানি ডেক্সের ভিতরে পাওয়া গেল। আমরা তখন নিরঞ্জনের যথেষ্ট নিন্দা করিলাম। সে যে এই অসৎ কার্য্য করিয়াও বার বার অস্বীকার করিয়াছে, এবং নির্দ্দোষীর ভাব দেখাইয়াছে, তাহাতে সে যে কালে একজন ভয়ানক লোক হইয়া দাঁড়াইবে তাহা বেশ বুঝিলাম। কিন্তু সেই বন্ধুটি আমাদিগকে বলিলেন, "প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত তোমরা বেচারিকে চোর ব'লো না।" আমি বলিলাম, "আর কি প্রমাণ চাও? এইত তার ডেক্স থেকে তুমিই নোট বের কল্লে।" বন্ধু উত্তর করিলেন, "তবে রায়টা তুমি না দিলে, আমার জন্যই কেন অপেক্ষা কর না?"

সে রাত্রিতে নিরঞ্জন ঘুমাইতে পারিল না। রাত্রিতে সে শুইতে গেলে প্রতিদিন তার বোন দৌড়াইয়া আসিয়া যেমন তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যায়, সে দিনও তেমনি করিয়া সে দৌড়াইয়া আসিল, কিন্তু দাদার মুখের দিকে চাহিয়া সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। প্রতিদিন দাদার মুখে যে হাসি দেখিত, আজ আর সে তাহা দেখিতে পাইল না। বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া সে সাহস করিয়া তাহার হাত ধরিতে পারিল না; তাহার চক্ষু ছল্‌ ছল্‌ করিয়া আসিল। নিরঞ্জন তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল, এবং মনের কষ্ট চাপিয়া রাখিয়া হাসিয়া বলিল, "হেম, তোমার চোখ ছল্‌ ছল্‌ কচ্ছে কেন।" দাদার হাসি দেখিয়া বালিকার চোখের জল তখনই যেন শুকাইয়া গেল, দাদার হাসিতে সে ভুলিয়া গেল, মনে করিল, ও কিছু নয়। অল্পকাল মধ্যে বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু নানা চিন্তায় নিরঞ্জনের আর ঘুম হইল না। তার মা মৃত্যুর সময় শেষ কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, "নিরঞ্জন, আমি ত চল্লাম, বোন্‌টিকে নিয়ে তুমি আজ পথে ভাস্‌লে। কিন্তু এই কথা সর্ব্বদা মনে রেখো যে, যাদের কেউ নাই, পরমেশ্বর তাদের রক্ষা করেন। কখনো কিছুতেই অসৎপথে যেও না। সৎপথে থেকো, সৎপথে থাক্‌লে কোন বিপদ হয় না। তিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের রক্ষা করবেন, তিনিই তোমাদের দেখ্‌বেন।" সে দিন মার এই শেষ কথা নিরঞ্জনের মনে বার বার উঠ্‌তে লাগলো। সে ত প্রাণপণে মার কথা পালন করিয়াছিল, সে ত কখনও অসৎপথে যায় নাই, তবে এ বিপদে সে কেন পড়িল? এ চুরির অপবাদ তাহার নামে কেন হইল? রাজকুমার বাবুকে সে পিতৃতুল্য ভক্তি করে, তিনিও তাহাকে ছেলের মত দেখেন, আর সে কেমন করিয়া তাঁহাকে মুখ দেখাইবে? এই সকল চিন্তায় ও যাতনায় সমস্ত রাত্রি সে ছট্‌ ফট্‌ করিয়া কাটাইল।

পরদিন প্রাতঃকালে ছেলেরা যে যার ডেক্সের কাছে গিয়া পড়িতে বসিয়াছে, এমন সময় আমাদের সেই বন্ধু, রাজকুমার বাবু ও আমাকে লইয়া সেই ঘরে গেলেন। ছেলেদেরকে দু চারটি পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে বলিলেন, "একখানি ইংরাজি বইএ পড়-

ছিলাম যে, হাতের আঙ্গুলের দাগ দেখে, কোন্ ছেলে পড়া শুনায় কেমন হবে তা বলতে পারা যায়। আমার সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখবার ইচ্ছা আছে। এখানে অনেক গুলি ছেলে আছে, এক খানা কাগজে এদের আঙ্গুলের দাগ তুলে নিয়ে আমার সেইটে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে হবে।" এই বলিয়া একখানি কাগজ লইয়া তিনি ছেলেদের হাতের আঙ্গুলে একটু কালী মাখিয়া প্রত্যেককে সেই কাগজে হাত দিতে বলিলেন এবং প্রত্যেকের আঙ্গুলের দাগের নীচে তাহার নাম লিখিয়া লইলেন। তার পর আমরা রাজকুমার বাবুর ঘরে চলিয়া গেলাম। সে খানে গিয়া বন্ধু সেই নোট খানি বাহির করিলেন এবং সেই আঙ্গুলের দাগ যুক্ত কাগজ খানি লইয়া একত্র করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কয়েকটি দেখিয়াই তিনি অবাক হইয়া রাজকুমার বাবুর দিকে চাহিলেন, রাজকুমার বাবুও একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে?" বন্ধু বলিলেন, "কি আর বল্‌বো, নিরঞ্জন চোর নয়, তোমার ছেলেই এ কাজ করেছে!" আমরা ত অবাক্। বন্ধু তখন আমাদিগকে, নোটে সুধীরের আঙ্গুলের দাগ দেখাইলেন এবং বলিলেন, "আমি যা মনে ক'রেছিলাম তাই হয়েছে। নিরঞ্জন চুরি করে নাই, যে কোন প্রকারে হউক সুধীরের হাতে এ নোট পড়ে, সেই ডেস্কের ভিতরে রেখেছে। ডেস্ক বন্ধ ছিল, তাই ডালার ফাঁক দিয়ে ঠেসে ভিতরে দেওয়াতে, নোটে আঙ্গুলের দাগ লাগে। আমি সেই দাগ দেখে এ চুরির কিনারা করবো ঠিক ক'রে, সকাল বেলা ছেলেদের আঙ্গুলের দাগ নিয়েছিলাম। তোমরা এখন মিলিয়ে দেখ, সুধীরের ভিন্ন আর কারও আঙ্গুলের দাগের সঙ্গে এ দাগ মেলে না।" আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বন্ধুর কথাই সত্য। তখন রাজকুমার বাবু অত্যন্ত রাগিয়া সুধীরকে ডাকিলেন। ইহার আগে কেহ কখনও তাঁহাকে রাগিতে দেখে নাই। সুধীর আসিবা মাত্র তাহাকে তিনি মারিতে গেলেন; কিন্তু আমরা তাঁহাকে বাধা দিলাম। তখন যার পর নাই তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুই দূর হ, এত চেষ্টা এত যত্ন করেও তোকে আমি ভাল কর্ত্তে পারলাম না। আমার বিষয় সম্পত্তি তুই কিছুই পাবি না।" সুধীরকে বাহিরে যাইতে বলিয়া আমরা রাজকুমার বাবুকে অনেক বুঝাইলাম। এ ব্যাপারে তাঁর মনে বড়ই ব্যথা লাগিয়াছিল, তিনি অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কোন কথাই বলিলেন না। কেবল দুই চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তার পর তিনি নিরঞ্জনকে ডাকিলেন। কিন্তু পড়িবার ঘরে তাহাকে দেখা গেল না। হয়ত তার বোনের কাছে গিয়া থাকিবে মনে করিয়া সেখানে একজন তাহাকে ডাকিতে গেল, কিন্তু সেখানে তাহাকে বা তাহার বোনকে, কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন বাহিরে খোঁজ করা হইল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। এই সময় একজন লোক একখানা চিঠি আনিয়া রাজকুমার বাবুর হাতে দিল। তিনি চিঠিখানা খুলিয়া পড়িলেন;—

"শ্রীচরণেষু,

আপনার ঋণ আমি এ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। আপনি দয়া করিয়া আশ্রয় না দিলে এত দিনে আমাদের দুটি ভাই বোনের কি দশা হইত জানিনা। ছেলে বেলায় পিতৃ মাতৃহীন হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনার আশ্রয় পাইয়া পিতা মাতার অভাব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পুত্রের ন্যায় সেবা করিয়া যদি আপনার ঋণ তিল মাত্রও পরিশোধ করিতে পারি, প্রাণ পণে সেই চেষ্টা করিব, এই বড় আশা ছিল; কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা আমার পূর্ণ হইল না। আমি আপনার অন্নে লালিত পালিত হইয়া, আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া মানুষ হইয়া,

এখন অকৃতজ্ঞের ন্যায় আপনার সহিত দেখা পর্য্যন্ত না করিয়া চলিয়া যাইতেছি।

আপনি আমাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন, সেই দুঃখে যে আমি চলিয়া যাইতেছি তাহা নয়। আমার জন্য আপনার সুখের সংসার অসুখের হইয়া উঠিয়াছে, সুধীরকে দিয়া আপনি দিন দিন অসুখী হইতেছেন এবং এ অসুখের একমাত্র কারণ আমি, সেই জন্যই আমি চলিয়া যাইতেছি।

আমার উপর আপনার অগাধ স্নেহই আমার কাল হইয়াছে। আপনি যে আমাকে অত স্নেহ করিতেন, সুধীর তাহা দেখিতে পারিত না। মার মৃত্যুর পর আপনি যখন দয়া করিয়া আমাদের দুটিকে আশ্রয় দিলেন, তখন যে সুধীর আমাকে একটু ভাল না বাসিত তা নয়। কিন্তু যত আপনি আমাকে একটু অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন, সে যেন ততই আমার উপর বিরক্ত হইতে লাগিল। সে দেখিত আপনি আমাকে তার চেয়েও অধিক বিশ্বাস করেন, কাজেই সে মনে করিত আমাকে তার চেয়ে অধিক স্নেহও করেন। দিন দিনই আমার উপর সে নানা প্রকার কুব্যবহার করিতে লাগিল। অনেক দিন হইতেই আমি ইহা দেখিয়া আসিতেছি। আপনি আমাকে অত বিশ্বাস করেন, অত স্নেহ দেখান, তাহাতে সুধীর বিরক্ত হয়, এ কথা এক এক সময়ে আপনাকে জানাইবার জন্য আমার ইচ্ছাও হইয়াছে, কিন্তু তাহা শুনিয়া যদি আপনি তাহাকে তিরস্কার করেন, সেই ভয়ে আমি জানাই নাই। সুধীর যে এত অবাধ্য ও এত অশিষ্ট হইয়াছে সে অপরাধ তার নয়, আমার। সে মনে করিয়াছিল, তাহার প্রাপ্য স্নেহ আমি আপনার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতেছি, সেই জন্যই সে অমন অশিষ্ট ও অবাধ্য হইয়াছিল। আমি তাহার ভুল বিশ্বাস দূর করিতেও অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই এবং এখন দেখিতেছি তাহা কখনও পারিব না। বরং দিন দিনই তাহার সে বিশ্বাস দৃঢ় হইবে এবং সে ক্রমে আরও অশিষ্ট ও অবাধ্য হইয়া আপনাকে অসুখী করিবে।

এই সকল কথা ভাবিয়াই আমি চলিয়া যাইতেছি। আমি এখানে না থাকিলে হয়ত সে আবার যেমনটি ছিল তেমনটি হইবে। আপনার আশ্রয়ে আসিয়া, আপনার অন্নে লালিত পালিত হইয়া আমি কি আপনাকে চিরদিনের জন্য অসুখী করিব?

আমাকে আপনি যেরূপ স্নেহ করেন, তাহাতে আমার একাজে আপনি খুব দুঃখিত হইবেন তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু আমার জন্য আপনার সুখের সংসারে অসুখ আসিয়াছে, ছেলেকে দিয়া আপনি অসুখী হইতেছেন, ইহা দেখিয়াও আমি কেমন করিয়া চুপ করিয়া থাকিব? আমি এ জন্মে আপনার ঋণ ত পরিশোধ করিতে পারিবই না, কিন্তু তার উপর আবার আপনাকে অসুখী কেন করিব!

আপনি আমার জন্য চিন্তা করিবেন না। আপনার অনুগ্রহে যে টুকু লেখা পড়া শিখিয়াছি, তাহাতে দু ভাই বোনের সংস্থান করিতে পারিব। দুঃখ এই রহিল যে, আমি আপনার কোন উপকারেই আসিলাম না। আপনার সেবা করিয়া যে কৃতজ্ঞতা, জানাইব সে আকাঙ্ক্ষাও আমার পূর্ণ হইল না।

সেবক
শ্রীনিরঞ্জন।"

সিন্ধুঘোটক ও জলহস্তী।

সিন্ধুঘোটক।

সিন্ধুঘোটক সীল জাতীয় জন্তু। ইহারা আট হাত লম্বা হয়। ইহাদের শরীর প্রকাণ্ড মহিষের ন্যায় বৃহৎ। ইহাদের মাথা খুব ছোট এবং উপরের মাড়ি হইতে দেড় হাত লম্বা দুটি দাঁত বাহির হয়। এই দাঁত বরফে বাধাইয়া

সিন্ধুঘোটক।

দিয়া ইহারা জল হইতে আপন শরীর টানিয়া লইয়া বরফের উপর উঠে এবং এই দাঁত দিয়া বালি ও কাদা খুঁড়িয়া সামুক, পোকা প্রভৃতি বাহির করিয়া খায়। ইহাদের চামড়া কাল ও মসৃণ এবং অল্প লোমে আবৃত। ইহারা উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশের বরফময় সমুদ্রে বাস করে। তথায় ইহারা অনেকে একত্রে দলে দলে বরফের উপর বিচরণ করে, সে দৃশ্য দেখিতে অতিশয় সুন্দর। এই প্রকাণ্ড জন্তুসকল বরফে গড়াগড়ি করিতে থাকে, একটি অপরটির গায়ে গিয়া পড়ে এবং ষাঁড়ের মত শব্দ করিতে থাকে। ইহাদের হাত ও পা হাঁসের পায়ের মত জোড়া, সেই জন্য অতি সহজে সাঁতার দিতে পারে। অন্যান্য জন্তুদের ন্যায় ইহারা পায়ের ভরে চলিতে পারে না। পেটের ভরে ও হাতে পায়ে শরীরটাকে টানিয়া চলিতে থাকে। ভয় পাইলে বা শত্রু দেখিলে লাফাইতে লাফাইতে জলে পলায়ন করে। মেরু প্রদেশের শ্বেত ভল্লুক ইহাদিগের প্রধান শত্রু।

এস্কিমো জাতিরা ইহাদের চর্ব্বি ও মাংস খায়। চর্ব্বি প্রদীপে জ্বালায়। দাঁত ও হাড়ে অস্ত্র ও নানা প্রকার দ্রব্য নির্ম্মাণ করে, চামড়ায় জুতা ও পোষাক প্রস্তুত করে।

জলহস্তী।

জলহস্তী কেবল আফ্রিকা দেশেই পাওয়া যায়। ইহারা নদী ও হ্রদের তীরে বাস করে। ইহাদের শরীর খুব বৃহৎ কিন্তু পা গুলি খুব ছোট ছোট বলিয়া ইহাদের পেট মাটীতে ঠেকে। ইহারা আট হাত লম্বা ও মানুষের সমান উঁচু হয়। ইহাদের মুখ চ্যাপ্টা ও দেখিতে কদাকার। মুখের মাড়িতে প্রায় এক হাত লম্বা দুটি দাঁত আছে। এই দাঁতে সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত হয়। ইহাদের চোখ ও কান খুব ছোট, গায়ের রং গাঢ় ধূসর। ইহাদের চামড়া অত্যন্ত পুরু। এই চামড়ায় অসংখ্য ছিদ্র আছে, সেই সকল ছিদ্র হইতে এক প্রকার তেল বাহির হয়, সেইজন্য ইহাদের গায়ে জল লাগে না ও অধিকক্ষণ জলে থাকিলেও ইহাদের কোন অনিষ্ট হয় না। ইহারা অধিকাংশ সময়ই জলে থাকে। কেহ আক্রমণ করিলে জলে এমন ভাবে ডুবিয়া থাকে যে, কেহ দেখিতে পায় না। ইহারা নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য নাকটি কেবল জল হইতে বাহির করিয়া রাখে। কাদায় গড়াইতে ইহারা অত্যন্ত ভালবাসে।

ইহারা ঘাস ও নানা প্রকার শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে ও নিকটস্থ শস্য ক্ষেত্রের অত্যন্ত ক্ষতি করে। ইহারা সাঁতরাইবার সময়ে ছানাদিগকে পিঠে করিয়া লয় এবং এইরূপে তাহাদিগকে সাঁতার দিতে ও জলে ডুবিয়া থাকিতে শিখায়।

আফ্রিকাদেশের অসভ্য জাতিরা ইহাদের মাংস খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে। যে পথে জলহস্তী সর্ব্বদা যাওয়া আসা করে, সেখানে ইহারা একটি বিষাক্ত বল্লমে ভারী পাথর বাঁধিয়া কোন গাছের ডালে সরু দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া দেয় ও সেই দড়ির অপর প্রান্ত পথের মাঝখানে কোন স্থানে বাধাইয়া দেয়। জলহস্তী সে পথ দিয়া গমন করিবার সময় তাহার প্রকাণ্ড শরীরের ঘর্ষণে বা পায়ের চাপে দড়ি ছিঁড়িয়া যায়, আর উপর হইতে সেই বল্লম পড়িয়া তাহার শরীরে বিঁধিয়া যায় ও বিষ শরীরে

প্রবেশ করাতে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। কখন কখন অসভ্য জাতিরা নৌকায় চড়িয়া বল্লম দিয়া জলহস্তী শিকার করে। ঐ ছবিতে দেখ অসভ্য জাতিরা কিরূপে জলহস্তী শিকার করিতেছে। এইরূপে শিকার করিতে গিয়া তাহারা অনেক বিপদে পড়ে। জলহস্তী কখন কখন শিকারীদের নৌকা উল্টাইয়া দেয় ও কামড়াইয়া চূর্ণ করিয়া দেয়। তখন শিকারীদের সাঁতরাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে হয়, নতুবা জলে ডুবিয়া মরিতে হয়।

জলহস্তী সাধারণতঃ বড় নিরীহ, কিন্তু আঘাত পাইলে বা বিপদে পড়িলে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।

শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ।

একটা সোজা কথা।

বিনয়, তেজু, নির্ম্মলা, কমলা ও চারু পাঁচ ভাই বোনে একদিন ভাত খাইতে বসিয়াছে। মা পরিবেশন করিতেছেন ও যার যা দরকার দেখিয়া শুনিয়া দিতেছেন, ইতিমধ্যে নির্ম্মলা বলিয়া উঠিল, "তেজুকে অত দিচ্ছ, আর আমায় এত কম দিলে কেন? যাও আমি খাব না।" বিনয় বলিল, "আমি সব চেয়ে বড়, আর আমায় সব কম ক'রে দিচ্ছ।" তেজু বলিল, "বিনয়কে চারুকে এত মাছ দিলে, কেন? তুমি ওদেরকে আমার চেয়ে বেশী ভাল বাস।" চারু বলিল, "আমার অম্বল কৈ? দিদিকে অম্বল দিলে, আমায় অম্বল?" বলিয়া

শেষকালে কান্না আরম্ভ করিল। এই রকমে কয়জনাতে মিলিয়া এমন গোলযোগ আরম্ভ করিল যে, আর কান পাতিবার যো রহিল না। মাকে ত জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। মা দেখিলেন যে, ধমকধামকে এ গোলমাল থামান তাঁহার কাজ নয়। মারিলে কি ধমকাইলে কাঁদাকাটিতে বাড়ী আরও 'মাতং' করিয়া তুলিবে। তিনি তখন এক গল্প ফাঁদিলেন। ছেলেরা গল্প প্রিয়, গল্পের নাম করিলে এখনি ক্ষান্ত হইবে।

গল্পের কথা শুনিয়া সকলে একেবারে নিস্তব্ধ হইল। আর কাহারও মুখে কথাটি পর্য্যন্ত নাই। সকলে "হাঁ" করিয়া মার দিকে তাকাইয়া রহিল। মা তখন আরম্ভ করিলেন—"একদিন বিধাতা-পুরুষ শুন্‌তে পেলেন, পৃথিবীতে একটা ভারি গোলযোগ হচ্ছে, পৃথিবীটা যেন রসাতলে যাবার যো হয়েছে। বিধাতা-পুরুষ আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না। ব্যাপারটা কি জান্‌বার জন্যে, যে দিকে গোলযোগটা হচ্ছিল সেই দিকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গিয়ে দেখেন যে, পৃথিবীর যত পশু পক্ষী সব এক জায়গায় জড় হ'য়ে ভারি চিৎকার আরম্ভ করেছে। তাঁকে দেখে তাদের চ্যাচানি আরও বেড়ে গেল। বিধাতাপুরুষ দেখ্‌লেন, তাদের থামান দায়। যতই চেঁচিয়ে কথা কন না কেন, সে গোলযোগের ভিতর তাঁর কথা কেউ শুনতেই পায় না। যা হ'ক, অনেক কষ্টে কোন রকমে একবার তাদের নিরস্ত ক'রে বল্‌লেন, "তোমরা সকলে মিলে এত গোলযোগ করছ কেন? যদি তোমাদের কিছু বল্‌বার থাকে, তাহলে একে একে বল। সকলে এক সঙ্গে বল্‌লে আমি কিছুই শুন্‌তে পাব না। তোমাদের চেঁচানই সার হবে, কাজ কিছুই হবে না"। এই কথা শুনেই হরিণ এগিয়ে এসে বল্‌লে, "আমি খুব দৌড়তে পারি সত্য, কিন্তু পাখীরা আমার চেয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় কত শীগ্‌গীর যায়, আর যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যেতে পারে। আমার প্রার্থনা যে পাখীদের মত আমারও দুটো ডানা ক'রে দিন, আমি আর কিছু চাই না।" হরিণের কথা শেষ হ'তেই, 'হালুম হালুম' ক'রে বাঘ এগিয়ে এসে বল্লে, আমার শক্তি সামর্থ্য সমস্ত আছে সত্য; কিন্তু আমি হরিণকে দৌড়ে ধরতে পারি না। আমার প্রার্থনা যে, আমি যেন হরিণের মত দৌড়তে পারি।" তার পর মাছ চল্‌বার জন্যে পা চাইলে। গাধা, কোকিলের স্বর চাইলে। এই রকম ক'রে সকলে নিজের নিজের অসন্তোষের কারণ বিধাতা পুরুষকে বলতে লাগল। বিধাতাপুরুষ সকলের কথাই শুনলেন। তার পর বল্লেন, "আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমাদের যার যা দরকার, আমি বেশ ভাল জানি। যাকে যা কর্‌লে ও যা দিলে মানায়, আমি তোমাদের তাই দিইছি। কিন্তু আজ দেখ্‌ছি তোমরা তাতে অসন্তুষ্ট। আচ্ছা তোমরা যে যা চাচ্ছ তা যদি দিই, তাহলে কি তোমরা সন্তুষ্ট থাক্‌বে?" যাই এই কথা বলা, আর অমনি সব জীবজন্তু—"নিশ্চয়ই থাক্‌বো, বরং একবার দিয়ে দেখুন," বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। বিধাতা পুরুষ তাদের উত্তর শুনে বল্লেন, "কখনই নয়। এখন ঐ রকম বল্‌চ বটে, কিন্তু এই প্রার্থনাটি পূর্ণ হলেই, দুদিন পরে আবার চেঁচামেচি আরম্ভ করবে। তখন আবার হরিণ বলবে, "আমায় ডানা দিয়েছেন, তাতে অনেকটা আরামে আছি সত্য, কিন্তু এই শিংগুলো ভারি অসুবিধে করে, গাছের ডাল পালায় আট্‌কে গেলেই মহা বিপদে পড়ি, অতএব আমার প্রার্থনা শিং গুলো তুলে নিন।" এই রকম একটি হলেই আর একটির জন্য তখনই ব্যস্ত হ'য়ে পড়বে, তৃপ্তি আর কিছুতেই হবে না। তাই বলি এ সকল আকাঙ্ক্ষাকে মনের মধ্যে স্থান দিয়ে কেন নিজেকে অসুখী করছো। যার যা হলে সুখ ও সুবিধা হয়, আমি তাঁকে

তাই দিয়েছি। তবে যে খারাপ হয়, নিজেকে অসন্তুষ্ট ক'রে তোলে, তার উপর আমি কখনই সন্তুষ্ট নই। কারণ জানি যে, তাকে যা দিয়েছি তা নিয়েই যখন সে সন্তুষ্ট হ'তে পারছে না, তখন সে কিছুতেই কোন কালে সন্তুষ্ট হ'তে পারবে না। তোমাদের যার যা আছে, যাকে যা দিয়েছি, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাক. মিছামিছি মনকে অসন্তুষ্ট ক'রে অসুখী হইওনা। বিধাতা পুরুষের কথা শুনে জীব জন্তুদের বুদ্ধি ঘরে এলো, এবং তখন তারা যে যার কাজে চলে গেলো। বল দেখি কেমন গল্পটি? তোমরা যে সব কটিতে মিলে "আমায় এ দিলে না, আমায় ও দিলে না," বলে চেঁচিয়ে আমায় একেবারে পাগল করে তুলেছ, আমি কি কাকে কি দিতে হবে তা বুঝি না? আমি বিনয়কে মাছের ঝোল দিইছি, আর তোমাকে দিই নাই, ওকে অম্বল দিইছি, আর চারুকে দিই নাই, এর কারণ আছে। বিনয়ের পেটের অসুখ হয়েছে, তাই ওকে মাছের ঝোল আর ভাত দিয়েছি। চারু সম্প্রতি জ্বর থেকে উঠেছে, তাই ওকে অম্বল দি নাই। আমি ত তোমাদের মা? তোমাদের কার কি রকম কখন দরকার, তা আমি যত বুঝ্‌তে পারি তোমরা তা পার না। আজ না হয় তোমরা বড় হয়েছ, কথা কইতে শিখেছো, যার যা দরকার না দরকার বল্‌তে পার। কিন্তু যখন তোমরা কোলের ছেলে ছিলে, কথাটিও কইতে পারতে না, তখন কি হ'ত? তখন আমি তোমাদের যখন যা খাওয়ার দরকার বুঝে তাই খাওয়াতাম। এখনও তোমাদের যার যেটি দরকার, তা আমি যেমন বুঝি তোমরা তা বোঝ না।

পরমেশ্বর যেমন করুণাময়, মাও তেমন করুণাময়ী। ছেলে মেয়েদের ভাবনা মা যেমন ভাবেন, এমন এ পৃথিবীতে আর কেউ ভাবে না। চারু অম্বল চাইলে, আমি দিলাম না। অমনি তার রাগ হল, আমায় দুটো কথা শুনিয়ে দিলে। আচ্ছা বল দেখি, আমি কি ওর ভাগের অম্বলটা নিজে খাবার জন্যে রেখেছি, না অম্বল খেলে ওর অসুখ হবে, বলে, ওকে অম্বল দি নাই? তোমাদের অসুখী ও অসন্তুষ্ট দেখ্‌লে আমার কি কষ্ট হয় না? তোমাদের মুখে হাসি দেখতে পেলে, তোমাদের সুখী দেখলে আমার কত আহ্লাদ হয়, তা কি তোমরা জান? আর আমি না হয় সুখী নাই হ'লাম। তোমরাই বা কেন মিছে কষ্ট পাও? আমি বুঝে যাকে যা দিচ্ছি, যে যা পাচ্ছ, যার যা আছে, তা নিয়ে যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকৃতে পার, তা হলেই সুখে থাকৃতে পারবে, নতুবা কখনও সুখী হ'তে পারবে না। তাই বলি, তোমরা আর যেন কখন অবুঝের মতন অমন করে চেঁচিও না। পশু পক্ষীরা যে কথা বুঝ্‌তে পারলে, তোমরা সে কথাটা বুঝ্‌তে পারবে না?

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

লিভিংষ্টোনের গল্প।

তোমরা অনেকে আফ্রিকা ভ্রমণকারী লিভিংষ্টোন সাহেবের নাম শুনিয়াছ। যাহারা ভূগোল পড়িয়াছ, তাহারা সকলেই জান যে, লিভিংষ্টোন সাহেব আফ্রিকার নীল নদের উৎপত্তি স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। এই লিভিংষ্টোন সাহেব পৃথিবীর মধ্যে একজন

খুব বড় লোক ছিলেন। টাকা কড়িতে বড় লোক ছিলেন তা নয়, ইনি দয়ালু, পরোপকারী

ও অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। ইঁহার মত সাহসী লোক বড় দেখা যায় না। কোথায় তাঁর বাড়ী স্কটল্যাণ্ড, আর কোথায় সেই অফ্রিকা দেশ। সেই সাত সমুদ্র তের নদী পারে, বিদেশে বনে জঙ্গলে, আত্মীয় স্বজন হীন হইয়া কতকগুলি দুর্দ্দান্ত, বুনো, ঘোর অসভ্য মানুষের মধ্যে তিনি গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি একটুও ভীত হন নাই। তিনি যে আফ্রিকাদেশে বেড়াইতে বা কোন রং তামাসা দেখিতে গিয়াছিলেন তা নয়। সাতাইশ বৎসর বয়সে গ্লাসগো নগরে ডাক্তারী পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি ডাক্তার হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁর আফ্রিকাদেশের অসভ্য জাতিদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিবার খুব প্রবল ইচ্ছা হয়। কিসে এই অসভ্য জাতিরা লেখা পড়া শিখিতে পারে, ধার্ম্মিক হইতে পারে, মানুষ নামের উপযুক্ত হইতে পারে, সেই দিকেই তাঁর মনোযোগ ছিল। সেই জন্যই তিনি আফ্রিকা দেশে গিয়াছিলেন এবং যে আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে ছিল, তাহা সাধ্যমত কাজেও করিয়াছিলেন। তিনি একজন খুব কাজের লোক ছিলেন। এই সকল গুরুতর কাজের মধ্যেও তিনি আফ্রিকা দেশ সম্বন্ধে নানা রকম জ্ঞানলাভ করিতে ক্রটী করেন নাই এবং গুরুতর পরিশ্রমে আফ্রিকার অসভ্যদের মধেই শেষে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সদ্‌গুণ রাশি ও তাঁহার অসাধারণ পরহিতৈষিতা দেখিয়া আফ্রিকার লোকেরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি একজন শিক্ষিত, সভ্য ইংরেজ হইয়াও যে অসভ্য বুনো আফ্রিকা বাসীদের ঘৃণা করেন নাই, এই কথা বুঝিতে পারিয়া তাহারা তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। লিভিংষ্টোনকে নিগ্রোরা যে কত ভালবাসিত একটা ঘটনায় তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্য আফ্রিকার অন্তর্গত ব্যাঙওয়েওলো হ্রদের নিকট তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁহার নিকট ম্যাজওয়ারা, সুসি ও চুমা নামে তিন জন প্রিয় নিগ্রো ছিল। ইহাদের সঙ্গে আরও পঞ্চাশ ষাট জন নিগ্রো ছিল। এই নিগ্রোদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে ক্রীতদাস ছিল, কিন্তু লিভিংষ্টোনের চেষ্টায় তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। সাহেবের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তাহারা কাঁদিতে লাগিল। কি করিয়া লিভিংষ্টোনের মৃতদেহ তাঁহার স্বদেশে পাঠাইবে, এই কথা ভাবিতে লাগিল। অবশেষে জাঞ্জিবার নগর হইতে জাহাজে পাঠান সুবিধা হইবে মনে করিয়া, লিভিংষ্টোনের মৃত দেহ তাহারা জাঞ্জিবার নগরে লইয়া যাইবে স্থির করিল। জাঞ্জিবার নগর সেখান হইতে প্রায় তিন শত ক্রোশ দূরে। সেই ৫০।৬০ জন লোক লিভিংষ্টোনের মৃত দেহ কাঁধে লইয়া, দুর্গম পর্ব্বত, বন জঙ্গল ও মরুভূমির মধ্য দিয়া কয়েক দিন চলিয়া জাঞ্জিবারে উপস্থিত হইল। লিভিংষ্টোনের উপর তাহাদের কত খানি ভক্তি ও ভালবাসা ছিল!

লিভিংষ্টোনের যে খুব অধ্যবসায় ছিল তাহা বাল্য কাল হইতেই জানা যায়। তিনি খুব

গরিবের ছেলে ছিলেন। বাপ মা তাঁহাকে বেশী দিন স্কুলে পড়াইতে পারেন নাই। এজন্য দশ বৎসর বয়সে তাঁহাকে এক কাপড়ের কারখানায় কাজ করিতে যাইতে হইত। কিন্তু এই কারখানায় কাজ করিতে করিতে যে টুকু অবসর পাইতেন, তাহাতেই পড়া শুনা করিতেন। কলের ঘড় ঘড়ানিরে মধ্যেও তিনি মন দিয়া বই পড়িতে পারিতেন, তাঁহার এমনি অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের বাড়ীর কাছে রাত্রিতে একটি স্কুল বসিত, তিনি সমস্ত দিন কারখানায় কাজ করিয়া আসিয়া আবার রাত্রিতে ২ঘণ্টা করিয়া এই স্কুলে পড়িতেন। বাড়ী আসিয়াও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িতেন।

আফ্রিকায় বাস কালে ত্রিশবৎসর বয়সে লিভিংষ্টোন্ একবার সিংহের হাতে পড়িয়াছিলেন। সে সময় তিনি যে গ্রামে থাকিতেন, সেই গ্রামের কাছে বড় সিংহের উৎপাৎ আরম্ভ হইয়াছিল। লিভিংষ্টোন কয়েকজন সেই দেশীয় লোক সঙ্গে লইয়া সিংহ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। সিংহটাকে নিকটে পাইয়া যেমন তিনি গুলি করিয়াছেন, অমনি সিংহটা লাফ দিয়া তাঁহাকে ধরিল। সে তাঁহার একটা হাত ধরিয়া এমন ঝাকড়ানি মারিয়াছিল যে, তিনি একেবারে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁর হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বিড়ালের মুখে ইন্দুর পড়িলে তাহার মনে যে কি রকম ভাব হয়, তাহা লিভিংষ্টোন বোধ হয় সেই দিন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।
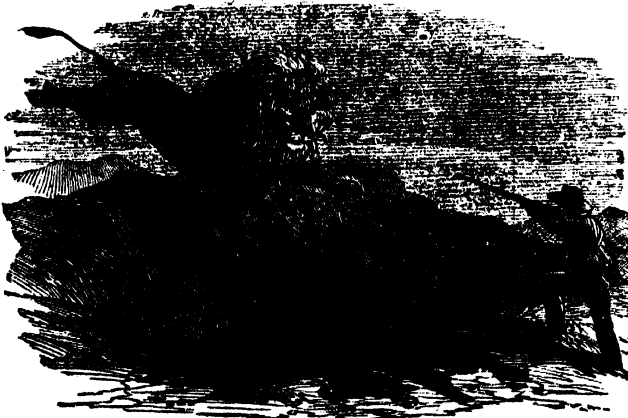
আফ্রিকার লোকে অনেক সময় ঘোড়ার পরিবর্ত্তে ষাঁড়ের উপর চড়িয়া যাওয়া আসা করে। লিভিংষ্টোনের এক ষাঁড় ছিল, তাহার নাম ছিল সিন্ব্যাড। এই সিন্ব্যাডের উপর চড়িয়া তিনি অনেক জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই ষাঁড়টা ভারি দুষ্ট ও খামখেয়ালি ছিল। সে চালকের কথা না শুনিয়া নিজের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ছুটিত। একবার সিন্ব্যাড লিভিংষ্টোনকে পিঠে করিয়া

একটা প্রকাণ্ড গাছতলা দিয়া এমন দৌড় দিয়াছিল যে, গাছের ডালে লিভিংষ্টোনকে আছড়াইবার যোগাড় করিয়াছিল। লিভিংষ্টোন ও বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন সিন্‌ব্যাড্ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

আর একবার লিভিংষ্টোন সিন্‌ব্যাডের পিঠে চড়িয়া একটা জলা পার হইতেছিলেন, সেই জলে আর কতকগুলি ষাঁড় ডুব দিতেছে দেখিয়া, সিন্‌ব্যাড্ লিভিংষ্টোনকে পিঠে করিয়া একেবারে গভীরজলে গিয়া নামিয়াছিল। সাহেব তখন নিরুপায় হইয়া সাঁতরাইতের আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আফ্রিকাবাসী সঙ্গীরা তাঁহাকে জলের মধ্যে দেখিয়া বড়ই ভয় পাইল এবং তৎক্ষণাৎ ২০ জন লোক জলের মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে টানিয়া তীরে তুলিল। এবং সকলেই তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল, কেহ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। বিশেষতঃ এক জন সাদা লোককে সাঁতরাইতে দেখিয়া তাহারা ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল! আফ্রিকার অসভ্যেরা লিভিংষ্টোনকে কেমন ভালবাসিত ও ভক্তি করিত তাহা এই ঘটনাটিতে ও বেশ বুঝা যায়।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু বি, এ।

ঠাকুর মা।

বয়স হয়েছে ভারি
বাটির উপর,
জড়িয়ে জড়িয়ে কথা
আধ আধ স্বর।

লাঠিতে করিয়া ভর
গুটি গুটি যান,
দাঁত পড়া খালি মুখে
গাল পোরা পান।

সাদা মুখে সদা হাসি
বড় চমৎকার,
উনিকে ? জান কি তুমি ?
ঠাকু মা আমার।

চারি দিকে নাতি পুতি
বসি সারি সারি,
রূপকথা বলিছেন
দুই পা পসারি।

ঘর ভরা সুখ, আর
বুক ভরা আশা,
পাকা আমে যত রস
তত ভালবাসা।

নাতিপুতি নিয়ে সুখে
আহার বিহার

আমাদের খেলা সাথী
ঠাকুমা আমার।

শ্রীমনোরঞ্জনগুহ।

আগ্রা।

কলিকাতা হইতে আগ্রা ৮৪৩ মাইল দূরে এবং যমুনার পশ্চিমতীরে স্থিত। আগ্রা বাদসাহি আমলের সহর। আগ্রায় কোনদিন হিন্দুদের রাজত্ব ছিল কিনা, তাহা জানা যায় না। মোগল দিগের পুর্ব্বে লোদীবংশীয়েরা আগ্রায় রাজত্ব করিত। মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে আগ্রা অধিকার করিয়া সেই থানে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র হুমাউন আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু হুমাউনের পুত্র আকবর পুনরায় আগ্রাকেই আপন রাজধানী করেন।

আগ্রা আকবর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে আকবর এই থানে একটি প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার রাজত্ব কালে আগ্রাই ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। এই প্রকাণ্ড দুর্গ মধ্যেই রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়, মোগল সম্রাট দিগের প্রথমই এই ছিল। মোগল রাজত্বের শেষে আগ্রা মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয় এবং তার পর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ আগ্রা অধিকার করেন। এখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদ। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এলাহাবাদ হইতে রাজধানী আগ্রায় লইয়া যান, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর পুনরায় এলাহাবাদেই রাজধানী হয়।

আগ্রায় অনেক দেখিবার জিনিস আছে। আগ্রার দিকে যাইতেই যমুনার পশ্চিম তীরে আকবর নির্ম্মিত দুর্গ ও জগৎ বিখ্যাত তাজমহল দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গটি রক্ত

প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার তিন দিক্ গভীর পরিখায় বেষ্টিত এবং পূর্ব্বদিক দিয়া যমুনা বহিয়া যাইতেছে। মোগল বাদসাহেরা দুর্গ মধ্যেই রাজ প্রাসাদ, মসজিদ ও অন্যান্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তার মধ্যে দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস্, জেনানা, মতি মসজিদ নগদাম মস্জিদ ও শিশমহল ইত্যাদিই প্রধান। আমরা একজন সেই দেশীয় লোক সঙ্গে একে একে সমস্তগুলি দেখিলাম :—

যে খানে বাদসাহের দরব্যার বসিত, সেই স্থানটির নাম দেওয়ানী আম্—এই দরবার গৃহটি ১২০ হাত লম্বা ও ৪০ হাত চওড়া। ইহা সুবর্ণ খচিত ও নানা প্রকার কারুকার্য্যে শোভিত ছিল। ভারতবর্ষে ইহা অপেক্ষা জমকাল দরবার গৃহ আর ছিল না। এই দরবার
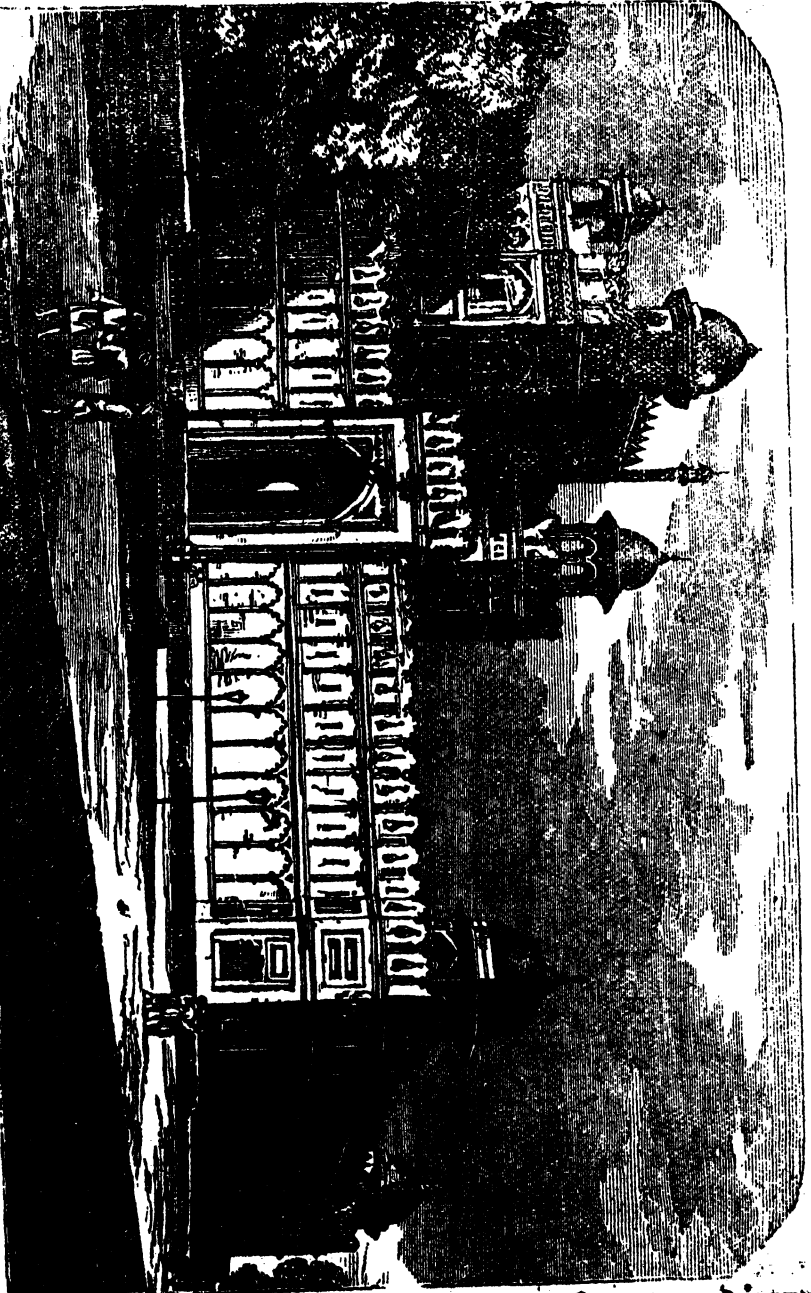
গৃহের পূর্ব দিকে আকবরের সিংহাসন রাখিবার মঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাদসাহ যেখানে তাঁহার প্রধান সেনাপতি মহারাজা মানসিংহ এবং রাজস্বমন্ত্রী মহারাজা টোডর মল্লের সহিত রাজ্য শাসন প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ করিতেন, সেইটির নাম দেওয়ানী খাস্। এটিও দেখিতে অতি সুন্দর।

জেনানা নামে যে স্থানটি আছে, তাহাও অতি মনোহর। এই খানে আকবরের বিখ্যাত 'নৌরজার' মেলা মিলিত।

দুর্গমধ্যে মতি মস্জিদ্ই সকলের অপেক্ষা সুন্দর অট্টালিকা। আকবরের পৌত্র সাজাহান বাদসাহ প্রায় এক কোটী টাকা ব্যয় করিয়া ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মাণ করেন। এই মস্জিদে বেগমেরা নমাজ করিতেন। এটি আগাগোড়া শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। মস্জিদের উপর তিনটি শ্বেত পাথরের গম্বুজ আছে এবং তাহার উপর তিনটি সোনার চূড়া শোভা পাইতেছে। দুর্গের সমস্ত অট্টালিকা হইতে এই গম্বুজ তিনটি উচ্চ। প্রাতঃকালে যখন সূর্য্যের কিরণ এই গম্বুজগুলির উপর পড়ে, তখন দেখিলে মনে হয় যেন সেগুলি সত্য সত্যই মতিনির্ম্মিত।

বেগমদের স্নান করিবার যে ঘর ছিল, তাহার নাম শিশমহল। শিশমহলের দেওয়াল পরকলায় মণ্ডিত, একটি আলো জ্বালিলে বোধ হয় যেন দেওয়ালে সহস্র সহস্র আলো জ্বলিতেছে।

সোমনাথের সেই চন্দন কবাটও দুর্গ মধ্যে দরবার গৃহের এক পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কবাট প্রায় ৮ হাত দীর্ঘ এবং প্রস্থে ৬ হাত। মহম্মদ ঘোরী সোমনাথের মন্দিরের এই চন্দন কবাট তাঁহার রাজধানী গজনীতে লইয়া যান। ইংরেজেরা পরে তাহা গজনী হইতে পুনরায় ভারতে আনিয়াছেন এবং আগ্রা-দুর্গ মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন।

পাঠক পাঠিকা! পর পৃষ্ঠায় যে মনোহর অট্টালিকা দেখিতেছ, বল দেখি ওটি কি? যদি তোমাদের মধ্যে কেহ আগ্রায় যাইয়া থাক, তবে অবশ্যই চিনিয়াছ, ওটি আগ্রার গৌরব—তাজমহল। তাজমহল যে কেবল আগ্রার গৌরব তাহা নহে, সমস্ত ভারতবর্ষের গৌরব। পৃথিবীতে এমন সুন্দর কারু-কার্য্য-পূর্ণ অট্টালিকা আর নাই, বহু অর্থ ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাজমহলে শিল্পের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। মোগল সম্রাট আকবর বাদসাহের পৌত্র সাজাহান, তাঁহার প্রিয়তমা বেগম মমতাজমহলের সমাধির উপর এই মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। বিশ সহস্র শিল্পী সতের বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে। জয়পুর হইতে শ্বেত প্রস্তর এবং ফতেপুর সিকরী হইতে রক্ত প্রস্তর আনাইয়া তাজমহল নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা নির্ম্মাণ করিতে দুই কোটী টাকা ব্যয় হয়। সাজাহান তাঁহার বেগমের নাম অনুসারে ইহার নাম তাজমহল রাখেন। আগ্রার এক ক্রোশ দক্ষিণে, যমুনাতীরে, তাজমহল শোভা পাইতেছে। ইহার প্রবেশ দ্বার রক্ত প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং অতিশয় প্রকাণ্ড এবং দেখিতেও অতি সুন্দর। প্রবেশ করিয়া দেখ, সম্মুখে একটি শ্বেত প্রস্তরের কৃত্রিম পুকুর রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে কতকগুলি ফোয়ারা। উদ্যানের বৃক্ষ শ্রেণীর ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখ, তাজমহলের অপূর্ব্ব দৃশ্য তোমার চক্ষে পড়িবে! প্রথমে তের চৌদ্দ হাত উচ্চ এবং প্রায় সাত শত হাত প্রস্থে রক্ত চন্দনের একটি ভিত্তি; তাহার উপর দশ হাত উচ্চ এবং দীর্ঘ প্রস্থে দুই শত হাত একটি শ্বেত প্রস্তরের ভিত্তি। তাহার উপর বিশুদ্ধ শ্বেত প্রস্তরের নির্ম্মিত তাজমহলের অপূর্ব্ব অট্টালিকা। ইহার চারি কোণে চারিটি-স্তম্ভ, প্রত্যেকটি ১৫০ হাত উচ্চ। চক্ষে না দেখিলে

তাজমহলের সৌন্দর্য্য লিখিয়া বুঝান যায় না। চন্দ্রের উজ্জ্বল শুভ্র জ্যোৎস্না যখন তাজের শুভ্র

তাজমহল।

দেহে পতিত হয়, তখন ইহা অতি মনোহর দেখায়; চন্দ্রালোকে তাজের যে শোভা হয়, তাহা বর্ণনা করাযায় না। তাজমহলের উপর ও মধ্যভাগ নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তর এবং অতুলনীয় সূক্ষ্ম শিল্প ও মনোহর কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ। প্রাচীরের শ্বেত প্রস্তরে নানাবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তর দ্বারা লতা পাতা

এবং ফুল খোদিত হইয়াছে। এই ফুল, পাতা ও লতাগুলি এমন সুন্দর এবং এমনি স্বাভাবিক যে, বোধ হয় যেন পার্শ্বস্থ উদ্যান হইতে এইগুলি তুলিয়া শ্বেত বরফ রাশির উপর কেহ বসাইয়া রাখিয়াছে। দরজাগুলি সমস্ত চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত। তাজমহলের নিম্নতলে মমতাজমহলের সমাধি এবং সেই সমাধির পার্শ্বেই তাঁর স্বামী সাজাহানের সমাধি। সমাধিমঞ্চ দুইটি বহুমুল্য প্রস্তরে সুশোভিত। তাজমহলের দ্বিতল গৃহেও সাজাহান ও তাঁহার পত্নীর কৃত্রিম সমাধিমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে যেরূপ কারুকার্য্য আছে, তাহা কল্পনায়ও ধারণা করা যায় না! মোগল রাজ্যের শেষ ভাগে জাঠ জাতি আগ্রা আক্রমণ করিয়া তাজমহলের মূল্যবাম প্রস্তর ও রত্নরাশি অপহরণ করে। কিন্তু এখনও তাজের যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা জগতে অতুলনীয়।

আগ্রায় আরও অনেক গুলি দেখিবার জিনিস আছে, তন্মধ্যে জুম্মা মসজিদ্ এবং সেকেন্দরাই (মলাটের চিত্র দেখ) প্রধান। জুম্মা মসজিদ্ একটিপ্রকাণ্ড অট্টালিকা। ইহার চারিকোণে চারিটি স্তম্ভ আছে।

সেকেন্দরা আগ্রা হইতে কয়েক মাইল দূরে। সেকেন্দরা মোগল কুলতিলক আকবরের সমাধি স্থান, ইহার সমস্তই রক্ত প্রস্তরে নির্ম্মিত। সেকেন্দরা প্রবেশদ্বারের চিত্রটি আমরা দিলাম। ইহার চারি কোণে চারিটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ; ইহার একটি এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেকেন্দরা একটি প্রকাণ্ড চৌতল গৃহ, মস্‌জিদের আকারে নির্ম্মিত। ইহার চৌদ্দটি চূড়া আছে। দ্বিতলে আকবরের কৃত্রিম সমাধিমঞ্চ নানা প্রকার কারুকার্য্যে সুশোভিত। নিম্নতলে একটি অন্ধকার কুঠারিতে আকবরের প্রকৃত সমাধিমঞ্চ, মোগলকুলতিলক আকবর সেই স্থানে চির নিদ্রায় অভিভূত। সেই ঘরে গান গাহিলে যেন বীণা ধ্বনি হয়। চৌতলে যে কৃত্রিম সমাধি-মঞ্চ আছে, তাহার চারি পার্শ্বে কোরাণে লিখিত ঈশ্বরের একশত আট নাম লিখিত আছে। ইহারই মধ্যস্থলে কোহিনুর মণি সংস্থাপিত ছিল —সেস্থান এখন শূন্য পড়িয়া আছে!

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমতী স্নেহলতা সেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার আমাদিগের হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে। যাঁহারা পুরস্কার পাইয়াছেন, কি প্রকার এখান হইতে তাঁহাদিগের লওয়া সুবিধা হইবে, তাহা আমাদিগকে জানাইলেই আমরা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে পারি।

সখা ও সাথীর গ্রাহকদের মধ্যে বার বৎসর বয়স্ক যে কোন বালক বা বালিকা "পশু পক্ষীর প্রতি ব্যবহার" সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট রচনা লিখিতে পারিবে, তাঁহাকে একটি পুরস্কার দেওয়া যাইবে। বার হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক বালক বা বালিকাদের মধ্যে "ভাই বোনের প্রতি ব্যবহার" সম্বন্ধে যাহার রচনা উৎকৃষ্ট হইবে, তাহাকে একটি পুরস্কার দেওয়া যাইবে। রচনা মাঘ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। পুরস্কার চৈত্র মাসের প্রথমে দেওয়া যাইবে।

দ্বাদশ বর্ষ | মাঘ ১৩০২ | ১০ম সংখ্যা।
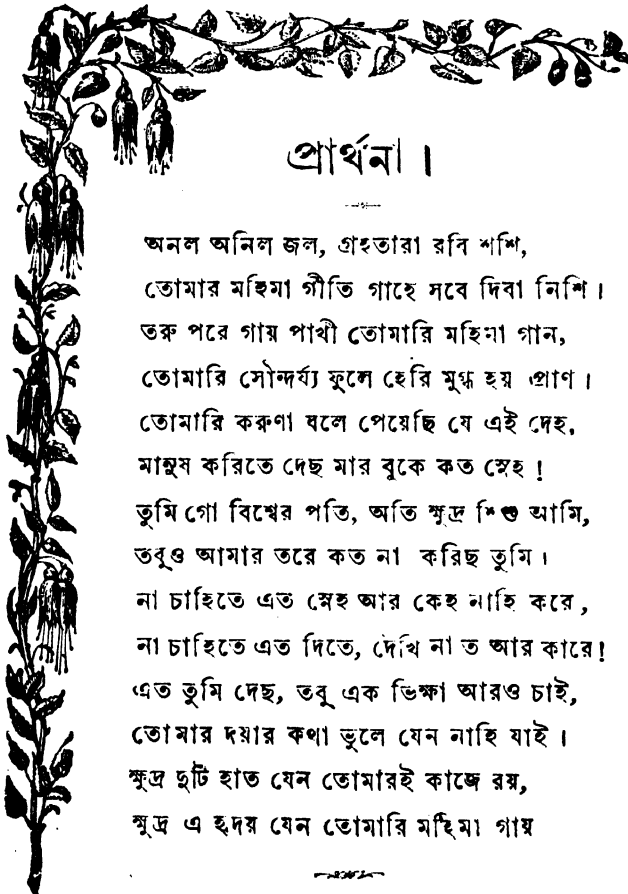
প্রার্থনা।

অনল অনিল জল, গ্রহতারা রবি শশি,
তোমার মহিমা গীতি গাহে সবে দিবা নিশি।
তরু পরে গায় পাখী তোমারি মহিমা গান,
তোমারি সৌন্দর্য্য ফুলে হেরি মুগ্ধ হয় প্রাণ।
তোমারি করুণা বলে পেয়েছি যে এই দেহ,
মানুষ করিতে দেছ মার বুকে কত স্নেহ!
তুমি গো বিশ্বের পতি, অতি ক্ষুদ্র শিশু আমি,
তবুও আমার তরে কত না করিছ তুমি।
না চাহিতে এত স্নেহ আর কেহ নাহি করে,
না চাহিতে এত দিতে, দেখি না ত আর কারে!
এত তুমি দেছ, তবু এক ভিক্ষা আরও চাই,
তোমার দয়ার কথা ভুলে যেন নাহি যাই।
ক্ষুদ্র দুটি হাত যেন তোমারই কাজে রয়,
ক্ষুদ্র এ হৃদয় যেন তোমারি মহিমা গায়

সবজান্তা লরেন্স।

দাদামহাশয়—চারু, চারু, এস দেখবে এস, বলত ঐ যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ওরা কে ?

চারু—ঐ যে আলখাল্লা গায়ে, চেপ্‌টা নাক, সাদা রং, অনেকটা সাহেবদের মত চেহারা—তাদের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ ? ওরা ভূটিয়া, না ? ঐ সে দিন শুনলাম যে ওরা দার্জ্জিলিঙ্গে এক স্কুলে ইংরেজী পড়ে, আর তাদের মাষ্টারের সঙ্গে এই শীতকালে ক'লকাতা দেখেতে এসেছে।

দাদামহাশয়—তাই বটে। ওরা ভূটানে বাস করে। ভূটান কোথায় জানত ?

চারু—জানি বইকি ? আসামের সোজাসুজি উত্তরে ভূটান। ভূটানের রাজধানীর নাম তাসিসূদন। তা, এই ভূটানীদের সম্বন্ধে দুএকটা গল্প বল না, দাদামশায় !

দাদামহাশয়—আচ্ছা এই ভুটানীদের সঙ্গে ইংরাজদের একবার লড়াই হয়েছিল জান ?

চারু—না, কেন লড়াই হয়েছিল বলনা ?

দাদামহাশয়—এই ভূটানীরা বড়ই দুরন্ত এবং সাহসীও খুব। সুবিধা পেলেই মাঝে মাঝে এসে আসাম হতে লোক জন ধরে নিয়ে যেত, গ্রাম সব লুঠ করতো; মাঝে মাঝে প্রায়ই এরূপ হ'ত। তা আমাদের সরকার বাহাদুর এতে বড় বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং ভূটিয়ার রাজাকে সাবধান ক'রে দেবার জন্য দূত পাঠালেন। ভূটিয়ারা সে দূতের বড়ই অপমান করলে। তাঁর মুখে থুথু দিলে, তাঁর কাপড় চোপড় ছিঁড়ে দিলে, আর তাঁকে কিছু কালের জন্য কয়েদের মত করে ফেল্লে। শেষটা তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিল। এই দূত কে জান ?

চারু—না, কে বল না ?

দাদা মহাশয়—ইডেন সাহেবের নাম শুনেছ ? সার এশ্‌লি ইডেন ?

চারু—শুনেছি বই কি। ঐ যাঁর মূর্ত্তি লালদিঘির পাশে রাস্তার উপরে বসান রয়েছে। তাঁর নামে একটা হাসপাতালেরও ত নাম আছে।

দাদামশায়—হাঁ ইডেন সাহেব সেইই বটে। তা এই ইডেন সাহেবেরই ভূটানে এত দুর্দ্দশা হয়েছিল। অপমানিত হয়ে শেষটা তিনি যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন ভূটানীদের জব্দ করবার জন্য আমাদের সরকার বাহাদুর খুব আয়োজন করতে আরম্ভ করলেন। বন্দোবস্ত ঠিক্ ঠাক্ হলে অবশেষে ভূটান আক্রমণ আরম্ভ হল। ভূটিয়ারা অসভ্য বর্ব্বর। তারা ইংরেজদের গুলি গোলার সাম্‌নে দাঁড়াতে পারবে কেন ? তারা তাদের দেশ গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগ্‌ল। ইংরেজের সিপাহীরাও একটা পাহাড়ের পর আরেকটা পাহাড় দখল করতে লাগ্‌লেন। ইংরেজদের কামানের সঙ্গে আঁটতে না পেরে অবশেষে ভূটানের রাজা ইংরেজ সরকারে এক চিঠি পাঠালেন। সে চিঠি পড়লে হাস্‌তে হাস্‌তে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যায়।

চারু—কি বলে চিঠি লিখেছিল, বলনা দাদামশায় ?

দাদামশায়—ভূটিয়াদের দুই রাজা, তা জানত ? একজনের নাম ধর্ম্মরাজা, আরএক জনের নাম দেবরাজা। দেবরাজা দেশের রাজা। আর ধর্ম্মরাজা ধর্ম্মের রাজা, পরকালের রাজা, আর যত সব ভূত প্রেতদের রাজা। ভূটিয়া প্রভৃতি যত অসভ্যজাতি সকলেই ভূত প্রেতে বিশ্বাস করে। তা, এই ধর্ম্মরাজা যখন দেখ্‌লেন যে, ইংরেজের গোলা গুলি ও কামানের সাম্‌নে

জ্যান্ত ভূটিয়ার তিষ্ঠান অসম্ভব, তখন তিনি আমাদের তখনকার লাট সাহেবের নিকট এক চিঠি লিখ্‌লেন। চিঠিতে আমাদের মহারাণীকে বোন্ বলে সম্বোধন করা হয়েছিল। ধর্ম্মরাজা লাট সাহেবকে লিখে পাঠালেন, "শান্তির জন্য যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে আমার প্রজা-দিগকে উত্যক্ত করিও না। আমার দেশের কোনও ক্ষতি না করিয়া নিজের দেশে ফিরিয়া যাওয়াই তোমার পক্ষে ভাল। কিন্তু যদি তুমি আমার ক্ষুদ্র দেশ দখল করিয়া নিজের দেশের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাও, তবে জানিও, আমি তোমার বিরুদ্ধে দ্বাদশ দেবতার সৈন্যদল প্রেরণ করিব। তাহাদের সংখ্যা ও বাসস্থান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহারা বড়ই দুরন্ত প্রেত। চামুর্চ্চিতে ইহাদের ৭ হাজার বাস করে। ধর্ম্মাতে ইহাদের ৫ হাজার বাস করে। বক্‌সাতে ইহাদের ৯ হাজার বাস করে এবং ঢালিম্‌দরজাতে ইহাদের ১২হাজার বাস করে। তুমি আমার দেশে বড়ই অত্যাচার করিয়াছ। আর এমন কাজ করিও না। করিলে এই দৈত্য-দের উৎপাতে ছারেখারে যাইবে।"

চারু—বাঃ বেশ চিঠিত। তা এইচিঠি পেয়ে লাট সাহেব কি কর্‌লেন্?

দাদা মশায়—তুমি যা কর্‌লে; একটু হাস্‌লেন, আর ভূটানের ভিতর ঢুক্‌বার জন্য আপনার সিপাহী দিগকে হুকুম দিলেন। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মরা মানুষে পারবে কেন? ভূটিয়ারা হটে' যেতে লাগ্‌ল। তারপর যখন ধর্ম্মরাজা দেখ্‌লেন যে, ভূতে আর কুলায় না, তখন ভূটিয়া দিগকে কোমর বেঁধে লড়াই করতে বললেন। ভূটিয়ারাও যখন দেখ্‌লে যে দেশ হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন তারাও মরিয়া হয়ে যুদ্ধে লাগ্‌ল। এবং

ইংরেজদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেল্লে। দু পাঁচ জায়গায় ইংরেজরা হেরে গেলেন। এবং অবশেষে যখন বোঝা গেল যে, ভুটিয়ারা শুধু মরা মানুষের উপর নির্ভর করে না; দায়ে পড়লে জ্যান্ত লোকেরাও দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, তখন আমাদের লাট সাহেব তাদের সঙ্গে সন্ধি করে ফেল্লেন। তা সে সময়কার লাট সাহেবও বেশ ভাল লোক ছিলেন। পরের দেশ কেড়ে নেওয়া তাঁর বড় ভাল লাগ্‌ত না। তাই তিনি সহজেই বর্ব্বর ভুটিয়াদের অপরাধ ভুলে গিয়ে, তাদের সঙ্গে মিল করে ফেলেছিলেন।

চারু—সে সময়ে কে আমাদের দেশের লাট ছিলেন দাদামশায়?

দাদামহাশয়—তাঁর নাম ছিল সার জন্‌ লরেন্স, কিন্তু তাঁকে পাঞ্জাবীরা সব্‌জান্‌তা লরেন্স বলে ডাক্‌ত। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় তাঁর ছবি দেখ। যখন তিনি পঞ্জাবের ছোট লাট ছিলেন, তখন সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তিনি এমনি চতুর ছিলেন যে, কোন্ জায়গায় সিপাহীরা কবে বিদ্রোহী হবে, তা আগে থেকেই বুঝ্‌তে পারতেন এবং সেই অনুসারে বন্দোবস্ত করে ফেলতেন। তাঁর বুদ্ধির জন্যেই পাঞ্জাবে সিপাহীরা বড় একটা কিছু করে উঠ্‌তে পারে নাই। আর সেই জন্যই তারা তাঁকে সবজান্তা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ বলে ভয় করত। ইনি যেমন চতুর ছিলেন তেমনি ভাল লোক ছিলেন। সে সময়ে ইংরেজরা এত ক্ষেপে গিয়েছিল যে, যদি তাঁর মত এবং ক্যানিং সাহেবের মত লোক না থাক্‌ত, তবে আমাদের দেশের বড়ই দুর্দ্দশা হত। লরেন্স আর ক্যানিং মিলে ইংরেজদের সে সময় থামিয়ে রেখেছিলেন, তাই রক্ষে। ইনি কেমন ভাল লোক ছিলেন, তা একটা কথাতেই বুঝ্‌তে পারবে। ইহাঁর এক ভাই ছিলেন, তাঁর নাম ছিল, সার হেণ্‌রি লরেন্স। সার হেণ্‌রী যেমন ভাল লোক ছিলেন, তেমনি বীর পুরুষ ছিলেন। লক্ষ্ণৌতে যখন সিপাহীরা ক্ষেপে ওঠে, তখন তিনি সেখানে খুব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই কাণ্ডে তিনি প্রাণ হারান। এমন গুণের ভাইকে হারিয়ে সর জন্‌ লরেন্স কোথায় প্রতিহিংসার জন্য ক্ষেপে উঠ্‌বেন, না তিনিই এদেশবাসী দিগের পক্ষ হয়ে, তাদের অনেককে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এত ভাল লোক ছিলেন, তাই ভুটানের রাজা অল্পে রক্ষে পেয়েছিলেন; নইলে তাঁর কপালে ঢের ভোগ হত। আর এক কথা এঁর সম্বন্ধে তোমায় বলি। ইনি প্রজাদের বড়ই হিতৈষী ছিলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রজাদের অবস্থা ভাল করবার জন্য তিনি একটি আইন করতে চেয়েছিলেন। বড় লোকদের ষড়যন্ত্রে তাতে কৃতকার্য্য না হলেও, তিনি যে কেমন লোক ছিলেন, তা এতেই বুঝতে পার। এঁর সময়ে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয়। তার জন্যও তিনি ঢের খেটেছিলেন। ইনি এদেশের লোকের খুব বন্ধু ছিলেন। আমাদের দেশের বাবু কেশবচন্দ্র সেন যখন বিলাতে যান, তখন অত বড় লোক হয়েও, এই লর্ড লরেন্স সাহেব তাঁর যথেষ্ট সমাদর ও অনেক উপকার করেন। ফল কথা এঁর মত ভাল লোক আমাদের দেশে অল্পই এসেছেন।

শ্রীকালীশঙ্কর সুকুল এম, এ।

লীলা।

তখন বাঙ্গলা দেশে ইংরাজের কেবল প্রথম পত্তন হইতেছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ জয়ী হইলেন। বাঙ্গলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মিরজাফরের সঙ্গে ইংরাজদের পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুসারে, মিরজাফর বাঙ্গলার নবাব হইলেন।

মিরজাফর নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন; রাজ্য শাসনের ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না। তিনি নবাব হইয়া কেবল আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে ইংরাজদিগকে যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল, তাহাও সমস্ত না দিতে পারায় তাঁহারাও মিরজাফরের উপর বিরক্ত হইলেন। মিরজাফরের নবাবী ফুরাইল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জামাতা মিরকাশিম বাঙ্গলার নবাব হইলেন। মিরজাফরের ন্যায় মিরকাশিম অকর্ম্মণ্য ছিলেন না। রাজ্য শাসনে তাঁহার শক্তি, সামর্থ্য এবং যোগ্যতা বিলক্ষণ ছিল, নামে মাত্র নবাব হইয়া বসিয়া থাকিবেন, সে প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তিনি রাজ্য শাসনের ভার নিজের হাতে লইলেন এবং মুর্শিদাবাদ হইতে রাজধানী মুঙ্গেরে লইয়া গেলেন।

কিন্তু মিরকাশিমের সহিতও ইংরাজদের বনিল না। যদিও তিনি ইংরাজদিগকে তাঁহাদিগের প্রাপ্য টাকা সমস্ত দিয়াছিলেন, তবুও ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া তাঁহার সহিত ইংরাজদের ক্রমে অল্পে অল্পে বিবাদ বাধিয়া উঠিল।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইংরাজদের একখানা নৌকা যুদ্ধের হাতিয়ার বোঝাই করিয়া পাটনা যাইতেছিল। নৌকা খানি মুঙ্গেরে পৌছিলে, নবাব সেখানি আটক করিলেন। এলিস্ নামে একজন সাহেব তখন পাটনায় ইংরাজদের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। হাতিয়ারের নৌকা নবাব মুঙ্গেরে আটক করিয়াছেন শুনিযা, তিনি পাটনা আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া বসিলেন। নবাবের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

নবাব পুনরায় পাটনা দখল করিলেন, পাটনার সমস্ত ইংরাজ সৈন্য বন্দী হইল। কাশিমবাজারে ইংরাজদের যে কুঠী ছিল, নবাব তাহাও দখল করিলেন এবং সেখানকার সমস্ত ইংরাজ বন্দী করিলেন।

শেঠেরা তখন বাঙ্গলার মধ্যে প্রধান ধনী। অনেককেই এই শেঠদিগের কাছে সাহায্য লইতে হইত। জগৎ শেঠ ত নবাবের ধনাধ্যক্ষই ছিলেন; তাঁহার গৃহে নবাবের নামে টাকা তৈয়ার হইত। ব্যবসা উপলক্ষে ইংরাজদিগকেও এই শেঠদিগের সহিত কারবার করিতে হইত।

নবাবের সহিত ইংরাজদের যখন বিবাদের সূত্রপাত হয়, তখন তিনি শেঠদিগকে ইংরাজদের সহিত কারবার বন্ধ করিতে হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্তু সে হুকুম সত্বেও কেহ কেহ ইংরাজদের সহিত গোপনে কারবার করিত। কাশিমবাজারের কুঠী দখল করিয়া যখন সমস্ত ইংরাজ বন্দী করা হয়, তখন সেই সঙ্গে নবাব তিন জন শেঠকেও বন্দী করিবার হুকুম দিয়াছিলেন। নবাবের কর্ম্মচারীরা দুইজন শেঠকে বন্দী করিল, কিন্তু লছমীপৎ শেঠ নামে একজনকে না পাইয়া, তাহার ভগ্নীকে বন্দী করিয়া পাঠাইয়া দিল।

লছমীপতের উপর নবাব বৃথা সন্দেহ করিয়াছিলেন। নবাবের হুকুমের পর সে ইংরাজদের সহিত আর কারবার করে নাই। লছমীপতের বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। তাহার পিতার মৃত্যুর সময় তাহার বয়স ১৬ বৎসর ছিল, পিতার

মৃত্যুর ৬ মাস পরে মাতারও মৃত্যু হয়। সংসারে তাহার একটি চৌদ্দ বছরের বোন ভিন্ন আর কেহ ছিল না; বোনটির নাম লীলা। লীলা যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি কর্ম্মা। মাতার মৃত্যুর পর সে সংসারের ভার লইয়া ভাইএর সেবা ও সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখিতে লাগিল। লছমীপতের পিতার বড় কারবার ছিল, তাহাকে সেই সমস্ত দেখিতে হইত। বয়স কম হইলেও তাহার যে প্রকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, তাহাতে দিন দিন ব্যবসার আরও উন্নতি হইতে লাগিল।

নবাবের সৈন্যেরা যখন কাশিমবাজারের কুঠী লুঠ করে, তখন লছমীপৎ বাড়ী ছিল না। সে কারবার উপলক্ষে তাহারই সাত আট দিন পূর্ব্বে কাশী গিয়াছিল। নবাবের কর্ম্মচারীরা লছমীপৎকে বন্দী করিতে যাইয়া দেখে, লছমীপৎ বাড়ী নাই। কিন্তু তাহা নবাবের কর্ম্মচারীরা প্রথমে বিশ্বাসই করিল না। বাড়ীর লোকজন দিগকে অনেক পীড়াপীড়িও করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা সত্য কথাই বলিয়াছিল। তাহাদিগকে, পীড়ন করিয়া কোন ফল হইল না দেখিয়া, তখন তাহারা লীলাকে নানা রকম ভয় দেখাইতে লাগিল। লীলা বালিকা হইলেও বুদ্ধিমতী এবং ছেলেবেলায় পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় নিজের উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছিল। সে তাহাদের কথায় ভীত না হইয়া ধীর ভাবে তাহাদিগকে বলিল যে, তাহার ভাই বাড়ী নাই। সে কোথায় গিয়াছে, নবাবের কর্ম্মচারীরা তাহা জানিতে চাহিল! লীলা এইবার বিপদে পড়িল। সে যদি বলিয়া দেয় যে, লছমীপৎ কাশী গিয়াছে, তবে নবাবের লোকেরা এখনি তাহাকে কাশী হইতে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবে। কাজেই সে তাহাদের কথার কোন উত্তর দিল না। নবাবের লোকেরা প্রথমে ভয় দেখাইতে লাগিল, শেষে অনেক পীড়াপীড়িও করিল, কিন্তু লীলা শত কষ্ট সহিয়াও ভাইএর সন্ধান তাহাদিগকে দিল না। নিরুপায় হইয়া তখন নবাবের কর্ম্মচারীরা লীলাকেই বন্দী করিয়া পাঠাইল।

বাড়ীতে একজন বুড়া চাকর ছিল, সে লছমীপৎ ও লীলাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে। সে লীলাকে বলিল, "লছমীপৎ বীর পুরুষ, তাহাকে কেহ বন্দী করিতে পারিবে না, আর বন্দী করিলেও বিচারে যখন সে নির্দ্দোষী প্রমাণ হইবে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিবে। মা আমার, তুমি এ বিপদে পা দিও না, দাদার কথা নবাবের লোকদের জানাও, সে বন্দী হইলেও তাহার উদ্ধার হইবে, কিন্তু তোমাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলে আর তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিব না।" এইরূপে বিস্তর বুঝাইল, কিন্তু লীলা কোন কথাই শুনিল না। দাদাকে যে সে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে, সে কেমন করিয়া তাহাকে সেই শত্রুর মুখে ফেলিয়া দিবে? "প্রতাপ দাদা, তুমিইত শিখিয়েছিলে যে, শত্রু যদি বিপদে পড়ে তবে তাকেও রক্ষে কত্তে হয়। দাদা কি আমার শত্রুরের চেয়েও বেশী যে, তাকে এই বিপদ থেকে রক্ষে কত্তে আমায় বাধা দিচ্ছ?" বুড়ার কথার এই মাত্র জবাব দিয়া বালিকা নির্ভয়ে পাটনা যাইতে প্রস্তুত হইল। সে নিজের বিপদ, কষ্ট, কিছুই ভাবিল না, তার দাদা যে রক্ষা পাইল, সেই সুখে তার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু ভরিয়া রহিল।

লছমীপৎকে না পাইয়া তাহার ভগ্নীকে বন্দী করিয়া আনা হইয়াছে শুনিয়া, নবাব মির কাশিম কর্ম্মচারীদের উপর অতিশয় বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "লছমীপৎপকে পাওয়া যায় নাই, ভাল; একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে বন্দী করিয়া আনার কি প্রয়োজন ছিল? ইহাতে আমার অতিশয় নিন্দা হইবে, বালিকাকে এখনি দেশে পৌছাইয়া দাও।" এমন সময় তাঁহার একজন পারিষদ বলিলেন যে, বালিকাকে দুই চারিদিন বন্দী করিয়া রাখিলে

লছমীপৎ আপনা হইতেই আসিয়া ধরা দিবে, সুতরাং দুই চারিদিন অপেক্ষা করিয়া দেখা মন্দ নয়। পারিষদের কথায় নবাব অসম্মত হইলেন না; লীলাকে একটি বাড়ীতে বন্দী করিয়া রাখা হইল।

প্রথম দু চারদিন লীলা বিশেষ কোন কষ্ট বোধ করে নাই। কিন্তু ক্রমে তাহার সেখানে বাস অসহ্য হইয়া উঠিল। সেই বাড়ীর ভিতরেই একটি ছোট বাগানের মত ছিল; ঘরের ভিতরে লীলার মন টিকিত না, দিন রাত্রি সেই বাগানে গিয়া সে বসিয়া থাকিত। কখনও কাঁদিত, কখনও চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিত, কখনও শূন্যমনে আকাশের পানে চাহিয়া থকিত।

সেই বাগানের মালী প্রতিদিন কাজ করিবার সময় ইহা দেখিত। সে লীলার কষ্টে ভারি কষ্ট বোধ করিত, কিন্তু নবাবের হুকুম, সে কি করিবে? ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, লীলার জন্য মালীর কষ্টও যেন তত বেশী হইতে লাগিল। ক্রমে লীলার চিন্তা তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। সে তখন মনে করিতে লাগিল, সেই শত্রুপুরী মধ্যে লীলার সেই এক মাত্র বন্ধু, সে ভিন্ন লীলার আর রক্ষার উপায় নাই। সে বুঝিল, লীলাকে রক্ষা করিতে হয়ত তাহার নিজের গরদান দিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। এক দিন লীলা আপন মনে বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় মালী তাহার কাছে গিয়া বলিল. 'মা এমন ক'রে আর কত দিন কাটাবে? এই কদিনে তোমার যে অবস্থা দেখ্‌চি; তাতে তুমি যে আর বেশী দিন বাঁচ্‌বে, তা বোধ হয় না। আমি চ'খের উপর তোমায় মরতে দেখ্‌তে পারবো না। তুমি আজই আমার সঙ্গে চল, এখন আমার বাড়ীতে নিয়ে তোমায় আমি লুকিয়ে রাখি, তার পর তোমার দেশে যাবার সুবিধে করবো।" মালীর কথায় লীলা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। সেই শত্রুপুরী মধ্যে তাহার দুঃখে দুঃখিত হয়, এমন লোক একটিও আছে, সে বিশ্বাস তাহার ছিল না। কিন্তু সে বুদ্ধিমতী, সে জানিত, মালী তাহাকে সেখান হইতে লইয়া গেলে, মালীর আর রক্ষা থাকিবে না; তাই বলিল, "কেন তুমি আমার জন্য

অত ব্যস্ত হচ্ছ, আমার দাদা এসে আমাকে নিয়ে যাবেন, তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ধরা পড়লে, নবাব তোমার গরদান নেবেন।” মালী বলিল, “তা আমি জানি, কিন্তু তোমার কষ্ট আর আমি দেখ্‌তে পারি না। দিন রাত্রি আমি কেবল তোমার কষ্টের কথা ভাবি, আর আমার অসহ্য যন্ত্রণা হয়। তুমি যদি আমার সঙ্গে না যাও, তা হলে আমি একটা ছল্‌ করে, আমার উপর পাহারাদের মনে সন্দেহ জন্মাব, তাতেও নবাব আমার গরদান নেবেন; এখন তুমি যাবে কিনা বল।” বালিকা মালীর কথায় ভয় পাইল, এবং যাইবে না, আর সে কথা বলিতে পারিল না। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বাগানের পিছন দিকের একটি ছোট দরজা দিয়া মালী তাহাকে তাহার বাড়ী লইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালেই প্রকাশ হইল যে, বন্দী পলাইয়াছে। অনুসন্ধানে মালীই ধরা পড়িল। কিন্তু লীলাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহা সে কিছুতেই বলিল না। বিচারে তাহার গরদান লইবার হুকুম হইল।

মালীর বাড়ীতে কান্নাকাটী পড়িয়া গেল। সেই কান্নার শব্দ লীলার কানে পৌছিল। লীলার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মালীর প্রাণদণ্ডের হুকুম হইয়াছে। সে দেখিল, তার জন্য একজন নির্দ্দোষী লোকের প্রাণ যায়। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সেই লুক্কাইত স্থান হইতে বাহির হইয়া, কাহারও নিষেধ না শুনিয়া, সে একেবারে নবাবের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল।

লীলা নতজানু হইয়া যোড়হাতে নবাবের সম্মুখে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া মালীর

প্রাণ ভিক্ষা চাহিল, এবং নিজে আবার সেই গৃহে গিয়া বন্দী হইয়া থাকিবে স্বীকার করিল। বালিকার কথা শুনিয়া নবাব অবাক হইলেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে লীলাকে আর দেখেন নাই। একটি অপরিচিত বালিকা, একাকী নির্ভয়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র বালিকা আপনার প্রাণের মায়া না করিয়া, মালীর প্রাণ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে! নবাবের হৃদয় গলিয়া গেল! তিনি বালিকার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, মালী রক্ষা পাইল। নবাব তখন লীলাকে বলিলেন, "তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমাকে আর বন্দী থাক্‌তে হবে না, আজই তোমাকে আমি তোমার দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করবো। তুমি আমার কাছে আর কি চাও বল।" লীলা বলিল, "আমার একটি আর প্রার্থনা আছে, আমার দাদাকে বন্দী করবার হুকুম হয়েছিল। দাদা নির্দ্দোষী। বিচার করে তাঁকে ক্ষমা করতে আজ্ঞা হয়।" নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাদা কোথায়?" লীলা বলিল, "তিনি কাশীতে আছেন।" নবাব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কথা তুমি আগে বল নাই কেন?" লীলা এ কথায় কোন উত্তর করিল না। সে মাথা হেঁট করিয়া রহিল এবং তাহার দুই চক্ষু হইতে দু ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। নবাব তাহা দেখিলেন এবং বুঝিলেন, ভাইএর বিপদের আশঙ্কা করিয়াই বালিকা প্রথমে সে কথা গোপন করিয়াছিল। তিনি আরও বুঝিলেন, ভাইকে বাঁচাইতে গিয়া বালিকা নিজের কষ্ট তুচ্ছ করিয়াছে, প্রাণেরও মমতা করে নাই। নবাব বলিলেন "আমি আর বিচার করিতে চাই না, তোমার কথায়ই আমি বিশ্বাস করিতেছি। তোমার ভাইকে বন্দী করিবার যে হুকুম দিয়াছিলাম, তাহা রদ্ হইল। বড় বড় উকিলেও হয়ত তোমার ভাইকে রক্ষা করিতে পারিত না, কিন্তু তুমি ক্ষুদ্র বালিকা আজ বাঙ্গলার নবাবকে জিতিলে।"

"এমন মা না হলে কি এমন ছেলে হয়!"

পৌরাণিক আখ্যান মালা।

প্রথম আখ্যান।

অনেকদিনের কথা, কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ আর এক ব্রাহ্মণী বাস কর্‌তেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা ভাল ছিল না। পূজা, পাঠ, স্বস্ত্যয়ন ক'রে, তিনি যা কিছু পেতেন, তাতেই তাঁদের, দুই স্ত্রী পুরুষ, একটি ছেলে, একটি মেয়ে, চার জনের, কোন রকমে চল্‌তো। ব্রাহ্মণ গরীব হলেও কিন্তু তাঁর মন বড় ভাল ছিল। নিজে না খেয়েও তিনি গরীব দুঃখীকে খাওয়াতেন, কারুর ব্যামো হ'লে তিনি সমস্ত রাত্রি জেগে সেবা কর্‌তেন, অতিথি পেলে আদর করে তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন, সেই জন্য গ্রামের লোকেরা তাঁকে বড় ভাল বাস্‌তো।

এই রকমে কিছুদিন যায়; একদিন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এক বিধবা আপনার পাঁচটি ছেলে নিয়ে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণ কথায় কথায় জান্‌তে পাল্লেন যে, বিধবা থাক্‌বার জন্য একটু জায়গা। চান্ ব্রাহ্মণের বাড়ীতে মোটে

দু তিন খানি মাত্র ঘর, কিন্তু তবুও তিনি শুনে বল্লেন, "মা, তোমার চেহারা দেখে তোমায় সামান্য ঘরের মেয়ে বলে বোধ হচ্চেনা। তোমার ছেলেগুলি ত যেন এক একটি রাজপুত্র। আমার এ ভাঙ্গা বাড়ী তোমাদের যোগ্য নয়, তা মা, যদি তোমাদের কষ্ট না হয়, তা হলে তোমরা আমার ওই বাইরের ঘর খানিতে যতদিন ইচ্ছা থাক্‌তে পার, আমি যেমন সাধ্য তোমাদের সেবা কর্‌ব।" বিধবা গ্রামের লোকের কাছে পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণের গুণ শুনেছিলেন; এখন তাঁর মিষ্ট কথা শুনে বল্লেন, "বাবা. আমি আপনার আশ্রয়ে থাক্‌বো বলেই এসেছি। আমি বড় দুঃখিনী; আমার এই ছেলেগুলি যখন ছোট, তখন আমার কপাল ভাঙ্গে। তারপর আমাদের বিষয় আশয় যা কিছু ছিল, জ্ঞাতিরা সব কেড়ে নিলে। বাবা, বলব কি, একদিন আমি ঘুমুচ্চি, পাপিষ্ঠেরা আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। দুঃখিনীর ধন বলে ভগবান আমার বাছাদের বাঁচিয়েছেন। সেই অবধি আমি বনে বনে, পথে পথে বেড়াচ্চি; এমন একটু যায়গা নাই যেখানে গিয়ে মাথা পেতে থাকি।"

বলতে বলতে বিধবার চক্ষুদুটি জলে ছল ছল্ কর্‌তে লাগ্‌লো। শুনে ব্রাহ্মণেরও চোকে জল এল। তিনি বল্লেন, "মা, তুমি দুঃখ করোনা, তোমার এমন দিক্‌পালের মতন সব ছেলে, তোমার ভাব্‌না কি মা? আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি, তোমার এই ছেলে গুলি হ'তে তুমি রাজার মা হবে।"

বিধবা ছেলেগুলিকে নিয়ে ব্রাহ্মণের বাইরের ঘরটিতে রইলেন। অতিথি পেয়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর আর আহ্লাদের সীমা রইল না। কি করে বিধবার মনের কষ্ট দূর হয়, তাঁর ছেলে গুলির খাওয়া দাওয়ার ভাল বন্দোবস্ত হয়, ইচ্ছামত ব্রত নিয়ম গুলি চলে, দুজনে কেবল সেই চেষ্টা কর্‌তেন। নিজেদের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, তবুও তেল টুকু, নুন্ টুকু যখন যা পার্‌তেন, দেবার জন্য ব্যস্ত হতেন। বিধবা সাধ্যমত তাঁদের কোন জিনিষ নিতেন না; তিনি বলতেন, "আমার ছেলেরা বড় হয়েছে, তারা রোজগার কর্‌তে পারে, আপনারা আমাদের জন্য এত করেন কেন?" তিনিও যখন যেমন সুবিধা ব্রাহ্মণকে সাহায্য কর্‌তেন। ব্রাহ্মণের ছেলে মেয়ে দুটি বিধবার এম্‌নি বাধ্য হল যে, মা বাপের কর্‌তে তাঁর কাছে থাক্‌তেই ভাল বাস্‌ত। কিছুদিন না যেতে যেতেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী আর বিধবা পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হয়ে পড়লেন।

বিধবা আর তাঁর ছেলে গুলিকে দেখে গ্রামের লোকেরা নানা রকম কাণাকাণি করতো। করবারই কথা। বিধবার মত সুন্দরী সে গ্রামে আর কেউ কখন আসে নাই;—তাঁর কাঁচাসোনার মতন রং, বড় বড় চোক্, সুন্দর গড়ন; এত যে বয়স হয়েছিল, তবুও তিনি যখন সকাল বেলা স্নান করে, গরদের কাপড়খানি পরে, নদী থেকে আস্‌তেন, তখন যেন রাস্তা আলো হতো। বিধবার ছেলেগুলিরও চেহারা তেম্‌নি। তাদের শালগাছের মত সতেজ শরীর, চওড়া বুক্, লোহার মুগুরের মত বাহু, অথচ তারির উপর সুন্দর লাবণ্য; যে দেখ্‌তো সেই মোহিত হত। তাঁদের চেহারাও যেমন, গায়ের জোরও তেম্‌নি। যখন তাঁরা হেটে যেতেন তখন মনে হত, যেন তাঁদের পায়ের ভরে মাটী কেঁপে উঠ্‌চে। সন্ধ্যার আগে পাঁচ ভায়ে মিলে যখন তাঁরা ব্রাহ্মণের বাড়ীর সুমুখের মাঠে কুস্তি করতেন, তখন গ্রামের লোক আপনার আপনার কাযকর্ম্ম ছেড়ে দেখ্‌তে আস্‌তো। পাঁচ ভায়ের মধ্যে মেজ ভাইয়ের গায়ে আবার সকলের চেয়ে বেশী জোর। তিনি যখন কোমর বেঁধে, তাল ঠুকে দাঁড়াতেন, তখন চারিদিকের দশ খানা গ্রামের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে তাঁর সুমুখে দাঁড়াতে পারে। তিনি লাথি

মার্‌লে, বড় বড় গাছ থর থর করে কেঁপে উঠ্‌তো, দেয়াল থেকে ঝর ঝর করে ইট খসে পড়তো। গাছ থেকে ফল পাড়তে হলে তিনি কখনও গাছে উঠ্‌তেন না; নীচে থেকেই, গাছের মোটা মোটা ডাল ধরে, এমন জোরে নাড়া দিতেন যে, রাশ রাশ ফল গাছের তলায় পড়্‌তো। তাঁর জোর দেখে লোকে অবাক হয়ে যেত। সামান্য ঘরের ছেলেদের এমন রূপ, এমন জোর হয় না, তাই কত জনে তাদের সম্বন্ধে কত কথা বল্‌তো। কেউ বল্‌তো, "এরা রাজার ছেলে দেশ খেলাতে বেরিয়েছে।" কেউ বল্‌তো "ওরে জানিস্ না, সেই কানা রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার ভাজ আর ভাইপো-দের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এরা হয়ত তারা।" কেউ বলতো "না না তা হবে কেন? কানা রাজার বড় ছেলে যে তাদের পুড়িয়ে মেরেচে, এরা তারা নয়, আর কেউ।" সকল কথাই বিধবার ছেলেদের কানে যেত, তাঁরা আপ্‌না আপ্‌নি হাস্‌তেন. কিন্তু কারুকে আপনাদের পরিচয় দিতেন না।

কিছুদিন থাক্‌তে থাক্‌তে, সেই গ্রামের লোকেরা তাঁদের পাঁচ ভায়ের গুণে খুব বাধ্য হ'ল। কারুর বাড়ীতে কোন কায কর্ম্ম হ'লে তাঁরা পাঁচ ভায়ে প্রাণপণে খাট্‌তেন। কারুর গরু, কি মহিষ বাঘে নিয়ে গেছে শুন্‌লে, তাঁরা অমনি তীর ধনু নিয়ে বেরুতেন; তাঁদের ভয়ে চোর ডাকাতেরা সে গ্রামে ঢুক্‌তে ভরসা কর্‌তো না। তারা আপনা আপনি বলাবলি কর্‌তো, "ওরে, ওখানে সেই পাঁচ ভায়েরা আছে, ওখানে যাওয়া হবে না।" সন্ধ্যা কালে যখন তাঁরা ধনুতে টঙ্কার দিয়ে শাঁক বাজাতেন, তখন সেই শব্দ শুন্‌লে বরাহের পাল ধানের ক্ষেতে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌তো না, ভালুকেরা আকের চাষ নষ্ট কর্‌তে পার্‌তো না; তাই গ্রামের চাষারা দুহাত তুলে তাঁদের আশীর্ব্বাদ কর্‌তো। আর ঠাকুর দেবতার কাছে বল্‌তো, "হে ঠাকুর, এরা পাঁচটি ভাই যেন চিরকাল আমাদের গ্রামেই থাকে, ঠাকুর এদের ভাল ক'রো।"

এই রকমে কিছুদিন গেল। একদিন বিধবা আপনার মেজ ছেলেটিকে নিয়ে আপ-নার ঘরে বসে আছেন, তাঁর আর চারটি ছেলে আপনার আপনার কাযে বেরিয়েছেন, এই সময় একটি কান্নার শব্দ ব্রাহ্মণের বাড়ীর ভিতর হ'তে তাঁদের কানে প্রবেশ কল্লে। ঠিক যেন বাড়ীতে কেউ মরেছে, শুনে তাঁরা দুজনেই চম্‌কে উঠ্‌লেন। বিধবার ছেলে মাকে বল্লেন, "মা তুমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখ দেখি, কি হয়েছে। আমরা ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এতদিন রয়েছি, যদি তাঁর কিছু বিপদ হয়ে থাকে, তুমি গিয়ে বুঝিয়ে বল। আর যদি কিছু কল্লে তাঁদের উপকার হয়, তুমি জেনে এস, আমি প্রাণপণে তা কর্‌বো।" বিধবা শুন্‌বামাত্র বাড়ীর ভিতর গেলেন; গিয়ে দেখলেন, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, আর তাঁদের দুটি ছেলে, মেয়ে, সকলে এক সঙ্গে বসে কাঁদছেন। ব্রাহ্মণ গালে হাত দিয়ে একদিকে বসে আছেন, তাঁর মুখে কথা নাই, চোক দিয়ে দর্ দর্ করে জল পড়চে; ব্রাহ্মণী ছোট ছেলেটিকে বুকে নিয়ে ডুক্‌রীপিটে কাঁদ্‌চেন; ছেলেটি এক একবার মার মুখের দিকে চাচ্চে, আর ফুলে ফুলে কাঁদ্‌চে; ব্রাহ্মণের মেয়েটিও মার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তারও কচি মুখ খানি চোকের জলে ভেসে যাচ্চে, বিধবা কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না। তাঁদের কান্না দেখে তাঁরও চোকে জল এল; কিন্তু হঠাৎ কারুকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে তাঁর ভরসা হল না। ব্রাহ্মণ এই সময় বল্লেন "ব্রাহ্মণী, তুমি কেঁদনা, তুমি থাক্‌লে এই শিশুটির উপায় হবে। আমিই যাই, তা হ'লে তোমরা সকলে রক্ষা পাবে। আমি যদি তোমাদের বাঁচাতে না পার্‌লাম, তবে আমার নিজের বেঁচে দরকার কি? তুমি কেঁদনা, আমিই যাব"। ব্রাহ্মণী বল্লেন,

"না, আমার প্রাণ থাক্‌তে আমি তোমায় যেতে দেবনা। তুমি গেলেই হতভাগা তোমায় মেরে ফেল্‌বে। কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিলেও দিতে পারে, আমিই যাব।" ব্রাহ্মণের মেয়েটি ছেলেটির করতে একটু বড়। সে বাপ্‌ মায়ের কথা শুনে বল্লে "মা তোমাদের কারুরি যেতে হবেনা, আমিই যাব; আমি গিয়ে তার পায়ে ধরে বল্‌বো, "ওগো আমায় মেরো না," তা হলে সে আমায় ছেড়ে দেবে। ছেলেটি বোনের কথা শুনে বল্লে "মা তুই কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন, আমি গিয়ে এম্নি করে সেই রাক্ষসকে মারবো।" বালক এই বলে একগাছি তৃণ নিয়ে, আপনার ছোট হাতখানি তুলে, রাক্ষসকে মার্‌বার ভাবে দাঁড়ালো। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, সেই দুঃখের সময়ও বালকের ভঙ্গী দেখে না হেসে থাক্‌তে পাল্লেন না। বিধবা সুবিধা বুঝে এই সময়ে ব্রাহ্মণীর কাছে গিয়ে বল্লেন "মা, তোমরা এত কাঁদ্‌চো কেন, কি হয়েছে আমায় বলো"।

ব্রাহ্মণী বল্লেন, "আর কি বলবো মা, আজ আমাদের এক জনের মৃত্যুর দিন, তাই আমরা কাঁদ্‌চি।" বিধবা তাঁর কথার ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না, বল্লেন, "সেকি? আমিত কিছুই বুঝ্‌তে, পাল্লাম না, আমায় সব খুলে বলুন"। এইবার ব্রাহ্মণ বল্লেন, "মা, আমাদের দুঃখের কথা কি বল্‌বো, যে দেশে আমাদের বাস, এক পাপিষ্ঠ সে দেশের কর্ত্তা। লোকের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন, এই তার কাজ। তার সঙ্গে অনেক দিন হ'তে এ দেশের লোকের এই নিয়ম আছে যে, এক এক জন গৃহস্থকে, এক এক দিন, তার জন্য এক গাড়ী অন্ন, দুটি মহিষ ও একজন মানুষ পাঠাতে হয়। যদি কেউ কখন না পাঠায়, তবে হতভাগা সবংশে তাকে বধ করে। সত্য মিথ্যা জানি না, লোকে বলে হতভাগা মানুষ, গরু সকলই খায়; কিন্তু যে তার কাছে যায়, সে আর কখনও ফিরে আসে না। আজ আমার পালা, আমি যে কি করবো ভেবে পাচ্চি না, সেইজন্য সপরিবারে বসে কাঁদ্‌চি।" বিধবা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "এর কি কোন উপায় নাই"? ব্রাহ্মণ বল্লেন "উপায় ভগবান। যাদের টাকা কড়ি আছে, তারা নিজে না গিয়ে, গরীব দুঃখী লোককে টাকার লোভ দিয়ে পাঠায়, কিন্তু আমার সে ক্ষমতা কোথায়? আর থাক্‌লেও, আমি আমার নিজের জন্য কখনও কোন গরীবের সর্ব্বনাশ কর্‌তাম না। মা, আমার মর্‌তে ভয় নাই, কিন্তু আমি মলে এই হতভাগাদের উপায় কি হবে, সেই কেবল ভাব্‌না।" ব্রাহ্মণ এই কথা বলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লেন। বিধবা ব্রাহ্মণের কথা শুনে, একটু ভেবে বল্লেন, "আপনারা ভাববেন না। আমার পাঁচটি ছেলে, আমি তার মধ্যে একটিকে রাক্ষসের কাছে পাঠাবো। আপনাদের ভয় নাই, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।" বিধবার কথা শুনে ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণী একেবারে অবাক্‌ হয়ে গেলেন। মানুষের কি এত দয়া হয়? পরের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মানুষ কি আপনার ছেলে দিতে পারে? ব্রাহ্মণের চোকের জল উথ্‌লে উঠলো; তিনি বল্লেন, "মা তুমি যে সামান্য মেয়ে নও, তা তোমাকে দেখে অবধি আমার বিশ্বাস হয়েছে। তুমি দেবতা, দেবতা না হলে কি পরের জন্য এমন করে কারুর প্রাণ কাঁদে? কিন্তু মা, আমার জন্যে তুমি যে তোমার একটি ছেলে দেবে, তা কখনই হবে না। মর্‌তে হয় আমিই মর্‌বো।" বিধবা ব্রাহ্মণকে অনেক বুঝুলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি বল্লেন, "সে কি? আপনারা আমার অতিথি! প্রাণ দিয়েও অতিথিসেবা করবে, এই হচ্ছে শাস্ত্রের উপদেশ। তা না করে আমি যদি তোমার ছেলেটিকে রাক্ষসের মুখে পাঠাই, তাহলে আমাতে আর সেই রাক্ষসেতে কি তফাৎ রইল? মা, তোমার যেমন দয়া, আর তোমার ছেলেগুলির যে রকম গুণ, তাতে তুমি একদিন

রাজার মা হবেই হবে। তখন আমার এই ছেলে মেয়ে দুটির কথা তুমি মনে রেখো, তা হলেই হল; তোমার আর কিছু কর্‌তে হবেনা।" শেষ কথা গুলি বলবার সময় মনের কষ্টে ব্রাহ্মণের গলার স্বর যেন ভেঙ্গে এল। বিধবা শুনে বল্লেন, "ঠাকুর, আমরা আপনার বাড়ীতে অতিথি। অতিথির প্রার্থনা না শুনলে অধর্ম্ম হয়, একথা স্মরণ রাখবেন। আপনি যদি আমার অনুরোধ না রাখেন, আমরা এই দণ্ডেই আপনার বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।" ব্রাহ্মণ তবুও সম্মত হইলেন না। তখন বিধবা হাত যোড় করে বল্লেন, "দেখুন্, আমি যে মা হয়ে আমার ছেলেকে রাক্ষসের মুখে পাঠাচ্ছি, তার কি কোন কারণ নাই? আমরা ক্ষত্রিয়, প্রাণ দিয়েও, লোক্‌কে বিপদ থেকে উদ্ধার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় হয়ে লোকের বিপদে সাহায্য না করে, তার নরক ভোগ হয়। সেই জন্যই আমি আমার ছেলেটিকে রাক্ষসের কাছে পাঠাচ্চি আমরা আপনার বাড়ীতে থাক্‌তে আপনাকে রাক্ষসে খাবে তা কখনই হবে না।"

বিধবা শেষ কথা গুলি এমন জোরের সঙ্গে বল্লেন যে, ব্রাহ্মণ আর কোন জবাব দিতে পারলেন না। তিনি চোকের জল মুছতে মুছতে বল্লেন, "মা, আমি আর কি বলবো? তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক্। আমি ব্রহ্মণ্যদেবের নিকট এই জানাচ্চি যে, জন্ম জন্মান্তরেও যদি আমার কোন পুণ্য থাকে, তবে তোমার ছেলের যেন কোনও বিপদ্ না হয়। আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, এ দেশের উদ্ধারের জন্যই নারায়ণ তোমায় এখানে পাঠিয়েছেন।" বিধবা বিদায় হলেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে রাক্ষসের খাবার অন্য সব আয়োজন করতে গেলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু বি, এ।

সমুদ্রের কথা।

ছেলেবেলা ভূগোলে পড়িয়াছিলাম 'পৃথিবীর এক ভাগ স্থল আর তিন ভাগ জল,' এত জল কোথা হইতে আসিল, ইহাতে কোন জীব জন্তুর বাস আছে কি না, তখন তাহার সবিশেষ কিছুই জানিতাম না।

পণ্ডিতেরা বলেন আমাদের এই পৃথিবী এক সময়ে জলে পরিপূর্ণ ছিল। এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি যে সমস্ত দেশ মহাদেশ এখন দেখিতেছ, তখন এ সকলের চিহ্নও ছিল না; জল ভিন্ন তখন আর কিছুই ছিল না। এই জল হইতেই ক্রমে আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই জলেই প্রথম জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং জলকে পৃথিবী ও জীব জগতের জননী বলা যাইতে পারে।

প্রথমে যে জলরাশী পৃথিবী বেষ্টন করিয়াছিল, দেশ মহাদেশের সৃষ্টির পর তাহার আকার অনেক ছোট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ছোট হইলেও এক প্রশান্ত মহাসাগর যতটা স্থান জুড়িয়া আছে, সমস্ত দেশ মহাদেশ একত্র করিলেও তত বড় হয় না। ইহাতেই তোমরা বুঝিতে পার, স্থল অপেক্ষা জল কত বেশী। শুধু যে বেশী স্থান জুড়িয়া আছে তাহা নয়, আটলাণ্টিক মহাসাগরের কোন কোন স্থান আট মাইলেরও বেশী গভীর। এই জলরাশীকে

এখন পাঁচটি মহাসাগর ও কয়েকটি সাগর ও উপসাগরে ভাগ করা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান। এই সকল সাগর মহাসাগরের আকৃতি প্রকৃতি এক প্রকার নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের 'আব্ হাওয়া' যেমন ভিন্ন ভিন্ন রকমের, জীব জন্তু ভিন্ন ভিন্ন রকমের, ইহাদের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে।

সমুদ্রে জীব—কত বাস করে, তাহা সংখ্যা করা দূরে থাকুক, কল্পনায়ও তাহা ধারণা করা যায় না। পৃথিবীর স্থল ভাগ অপেক্ষা জল ভাগ যেমন বেশী, তেমনি জলে জীব জন্তুর পরিমাণও অনেক বেশী। সৃষ্টির মধ্যে, এখনকার সকল চেয়ে বড় জীব তিমি হইতে আরম্ভ করিয়া, কত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু যে সমুদ্রে বাস করে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এক ফোঁটা জলে অণুবীক্ষণের সাহায্যে যে পরিমাণ জীব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই সংখ্যা করা অসাধ্য

আমরা এখানে দুই চারিটির মাত্র নাম করিব। যে সকল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী সমুদ্র জলে বাস করে, তার মধ্যে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র প্রাণী আছে, তাহাদের শরীর হইতে এক প্রকার আলোক বাহির হয়। এ গুলিকে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের সমুদ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রিতে স্থির সমুদ্রের উপর দিয়া যখন জাহাজ চলিতে থাকে, তখন ইহাদের দ্বারা বিস্তীর্ণ সমুদ্র জল আলোকিত হইয়া উঠিলে অতিশয় সুন্দর দেখায়।

প্রবাল কীট—সমুদ্রের এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট। ইহা নানা জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই কীট ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদ্বারা একটি খুব মস্ত কাজ হইয়া থাকে। আণ্ডামান, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি ভারত মহাসাগরের অনেক দ্বীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরেরও অনেকগুলি দ্বীপ এই ক্ষুদ্র প্রবাল কীটের দ্বারা তৈয়ার হইয়াছে।

'নটিলাস্' নামে এক প্রকার জীব আছে।
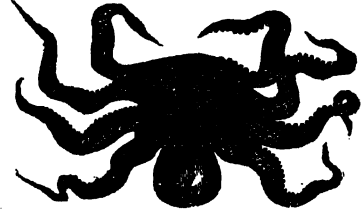
ইহাদের আট খানি পা থাকে, এই অষ্টপদী জলদৈত্যের হাতে পড়িলে আর রক্ষা থাকে না।

সমুদ্রে সকলের অপেক্ষা বড় জীব, তিমি। কেবল সমুদ্র নয়, সৃষ্টির সমুদয় জীব অপেক্ষা তিমি আকারে বড়। শীতপ্রধান দেশেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীন্ল্যাণ্ড দেশীয় তিমি লম্বায় ৫০ হাত হয় এবং ইহাদের

শরীরের বেড় প্রায় ২৬।২৭ হাত হইয়া থাকে। দক্ষিণ সমুদ্রে স্পার্ম হোয়েল নামে যে তিমি আছে, তাহা ৬০ হাত পর্য্যন্ত বড় হয়। তেলের জন্য এই তিমি শিকার করা হইয়া থাকে। তিমি অত বড় জন্তু হইলেও ইহাদের স্বভাব অনেকটা নিরীহ। কিন্তু সময় সময় ইহারা

খুব বিক্রম দেখাইয়া থাকে। ইহাদের লেজে অসীম বল, এই লেজের আঘাতে জাহাজ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

হাঙ্গর সমুদ্রের আর একপ্রকার জীব। ইহা তিমির ন্যায় বড় না হইলেও এমন ভয়ঙ্কর জীব সমুদ্রে আর নাই বলিলেই হয়। সিংহ,
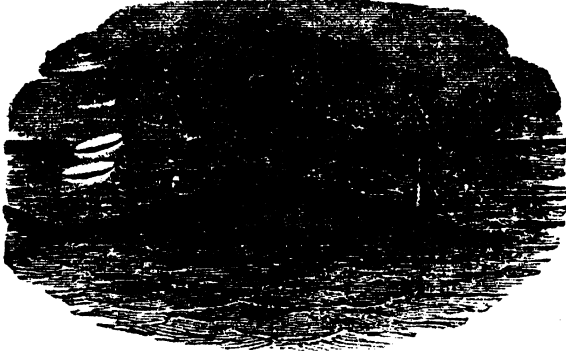
বাঘ, হাতী, গরিলা প্রভৃতি ভয়ানক জন্তু গুলি একত্র করিলে যত ভয়ানক না হয়, তার অপেক্ষাও ইহারা ভয়ানক। ইহা কুড়ি হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহাদের মুখের উপরের পাটিতে ছয় সারি এবং নীচের পাটিতে চার সারি ভয়ানক দাঁত আছে।

'ডগ্‌ফিস' নামে এক প্রকার জীব দেখা যায়। এ গুলি হাঙ্গরের মত অত বড় না হইলেও প্রায় তাহাদেরই মত ভয়ানক।

সমুদ্র জলের রং—আমরা সচরাচর নীল বলিয়াই জানি। কিন্তু 'লোহিত সাগর' 'কৃষ্ণসাগর' প্রভৃতির কথাও তোমরা ভূগোলে পড়িয়াছ; জলের রং এর জন্যই ইহাদের এপ্রকার নাম হইয়াছে। সমুদ্র জলের সাধারণ রং নীল ও সবুজ। সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ অনুসারে জলের রং এর ভিন্নতা দেখা যায়; যে স্থানের জলে অধিক লবণ তাহা বেশী নীল এবং এই লবণ যত কম হইতে থাকে, ততই নীল রং ক্রমে সবুজ রং এ বদ্‌লাইতে থাকে। কিন্তু 'লোহিত সাগর,' 'কৃষ্ণ সাগর' প্রভৃতির যে কথা পড়িয়াছ, তাহাদের রংএর অন্য কারণ আছে। সমুদ্র জলে এপর্য্যন্ত প্রায় ছয় হাজার রকমের তৃণ দেখা গিয়াছে। ইহাদের কোন কোনটি এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ ভিন্ন দেখা যায় না, আবার এক একটিকে পঞ্চাশ হইতে একশত হাতেরও উপর বড় হইতে দেখা যায়। এই সকল তৃণের ভিন্ন ভিন্ন রং অনুসারে সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রং কোথাও কাল, কোথাও লাল, কোথায় হল্‌দে, কোথাও বা সাদা হইয়া থাকে। এ ছাড়া এক রকম অতি ক্ষুদ্র কীটাণু সমুদ্র জলে অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে সমুদ্র জলের রংএর বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

সমুদ্রজল লবণাক্ত—উপরে একথা বলিয়াছি এবং তোমরাও জান যে সমুদ্রের জল নোনা। কিন্তু কেন নোনা তাহা হয়ত সকলে জান না। এক কড়া জল আগুনের উপর বসাইয়া দিলে খানিক পরে সেই জল হইতে ধূমের মত উঠিতে থাকে, তাহা সকলেই দেখিয়া থাকিবে এবং তাহাকে যে বাষ্প বলে তাহাও বোধ হয় তোমরা

অনেকে জান। জলে তাপ লাগিলে তাহা বাষ্প হইতে থাকে এবং বাষ্প বাতাসের অপেক্ষা হাল্‌কা বলিয়া তাহা উপরের দিকে উঠিতে থাকে। সূর্য্যের তাপেও সমুদ্রের জল এই প্রকার অনবরত বাষ্প হইয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছে। এই বাষ্প উপরের শীতল বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া আবার ঘন হইয়া যায়, ইহাই মেঘ। ইহা যখন আরও শীতল হয়, তখন আবার জল হইয়া পৃথিবীতে পড়ে, এবং মাটির ভিতর দিয়া চোয়াইয়া আবার গিয়া সেই সমুদ্রে পড়ে। মাটিতে নানা প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে নানা প্রকারের লবণ একটি প্রধান পদার্থ। বৃষ্টির জল যখন মাটিতে পড়িয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করে, তখন এই সকল লবণ তাহার সহিত মিশিয়া যায় এবং জলের সঙ্গে ক্রমে গিয়া সমুদ্রে পড়ে। সুতরাং পৃথিবীর সৃষ্টি হইতেই এই প্রকারে সমুদ্রে লবণ জমা হইতেছে। সূর্য্যের উত্তাপে যখন সমুদ্র জল বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায়, তখন জলের লবণ পড়িয়া থাকে, কেবল পরিষ্কার জলই বাষ্প হইয়া যায়। সুতরাং লবণ ক্রমাগত বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। এই লবণ আবার সকল স্থানের জলে সমান নয়। যে যে স্থানের জলে সূর্য্যের উত্তাপ খুব বেশী লাগে, সেই স্থানের জল বেশী নোণা। তাহার কারণ এই যে, সে সকল স্থানের জল বেশী তাপ পায় বলিয়া খুব বেশী বাষ্প হইয়া যায়, কাজেই লবণের পরিমাণও বাড়িতে থাকে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশে সূর্য্যের উত্তাপ কম, এই জন্য সে সকল স্থানের সমুদ্র জলও কম লবণাক্ত। এ ছাড়া যে সমুদ্রের মধ্যে অধিক নদী আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জল কম নোনা হয়; আবার যেখানে মোটেই নদী পড়ে নাই তাহার জল অধিক নোনা। ইহার কারণ এই যে, যেমন উত্তাপে বাষ্প হইয়া জলের পরিমাণ কমিয়া যায়, তেমনি আবার নদীর জল আসিয়া পড়াতে লবণাক্ততা দূর হয়। আর যেখানে নদী নাই, তাহার জল ক্রমাগত বাষ্প আকারে উঠিয়া যাওয়ায় এবং নির্ম্মল জল তাহাতে আসিয়া না পড়ায়, তাহার লবণ-ক্ততা ক্রমেই বাড়িয়া যায়।

সমুদ্রজলের লবণাক্ততার সঙ্গে ইহার ভিতরে যে সমস্ত জীবজন্তু বাস করে, তাহাদেরও খুব সম্বন্ধ আছে। নোনা জলে যে সমস্ত জীব দেখিতে পাওয়া যায়, নির্ম্মল জলে তাহা প্রায় দেখা যায় না। শামুক জাতীয় যে জীব আছে, তাহাদের শরীরের আবরণটি তৈয়ার হইতে লবণের দরকার, কাজেই যে স্থানের জল বেশী নোনা, সেই থানেই এই জাতীয় জীবকে দেখিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্রের তলদেশ—পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অনেকটা পৃথিবীর স্থল ভাগেরই ন্যায়। স্থল ভাগ যেমন সকল স্থান সমান নয়, কোথাও উচু, কোথাও নীচু, কোথাও প্রকাণ্ড পর্ব্বত, কোথাও সুন্দর উপত্যকা, সমুদ্রের তলাটাও সেই রকম। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মাটি যেমন ভিন্ন ভিন্ন রকমের, সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মাটিও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রকমের। পৃথিবীর কোন কোন স্থান যেমন গরম এবং কোন কোন স্থান ঠাণ্ডা, সমুদ্রের তলাও তেমনি কোথাও গরম কোথাও ঠাণ্ডা। আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে যেমন ভিন্ন ভিন্ন রকমের জীবের বাস দেখা যায়। সমুদ্রেও ঠিক তাহাই দেখা যায়।

পূর্ব্বে যে সমস্ত জীবের কথা বলা হইয়াছে তা ছাড়া সমুদ্রে আরও ছোট বড় নানা প্রকারের জীব আছে, সে সকল গুলির কথা এখানে বলা সম্ভব নয়। সীল, সিন্ধুঘোটক, জলহস্তী প্রভৃতি বড় বড় কয়েকটি জন্তুর কথা তোমরা 'সখা ও সাথীতে' পড়িয়াছ।

এই সকল ভয়ঙ্কর জন্তু ছাড়া, সমুদ্রে আরও কয়েকটি ভয়ানক জিনিষ আছে; সে গুলি

প্রাণহীন বটে, কিন্তু জীবিত জন্তুদের অপেক্ষা তাহাদের পরাক্রম কম নয়, বরং বেশী।

সমুদ্র যখন স্থির থাকে, তখন দেখিতে অতি সুন্দর। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল অগাধ জলরাশী ধূ ধূ করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকল সময় সমুদ্রের এই স্থির শান্ত মূর্ত্তিটি থাকে না।

সমুদ্রে ঝড়——উঠিলে যে ভয়ানক অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনা করাও অসম্ভব। সে তরঙ্গ, সে গর্জ্জন, সে ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিলে আর মনে হয় না যে, ইহাই আবার স্থির শান্ত মূর্ত্তি ধরিতে পারে। ঝড়ের সময় সমুদ্রের ঢেউ ৩০ হাত পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা গিয়াছে।

সমুদ্রে বাণ—ডাকিলেও বড় ভয়ানক অবস্থা হয়। এই বাণের মুখে কত দেশ নগর ভাসিয়া গিয়াছে, কত জীব জন্তর প্রাণ গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। হল্যাণ্ড ও ডেন্‌মার্ক প্রভৃতি দেশের ভূমি সমুদ্র অপেক্ষা নীচু। কাজেই সমুদ্রে বাণ ডাকিলে এ সকল স্থানের যে কি বিপদ হয় তাহা বুঝিতেই পার। ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে একবার বাণ ডাকিয়া হল্যাণ্ড দেশে বাহাত্তর খানি গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছিল এবং এক লক্ষেরও বেশী লোক মরিয়াছিল। সমুদ্র অপেক্ষা দেশ নীচু বলিয়া হল্যাণ্ডের তীরে প্রকাণ্ড বাঁধ আছে। কিন্তু ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাণের মুখে এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং সেবার চার লক্ষেরও বেশী লোক মরিয়াছিল।

ঘূর্ণীপাক—সমুদ্রের আর একটি ভয়ঙ্কর জিনিষ, মালষ্ট্রম নামে নরওয়ের নিকটে একটি ঘূর্ণীপাক আছে, সেইটি সকলের চেয়ে ভয়ানক। বহুদূর হইতে ইহার তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়, এবং ইহার 'পাকটি' ও বহুদূর লইয়া বিস্তৃত। এই

পাকের মধ্যে পড়িলে বড় বড় জাহাজও ডুবিয়া যায়। সমুদ্রের সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড জীব তিমিও ইহার পাকে পড়িলে তার রক্ষা থাকে না।

পাওয়া যায়। ক্রমে খানিকটা খুব ঘন মেঘ 'ফানেলের' আকারে নীচের দিকে নামিতে থাকে, এবং যত জলের কাছে আসে ততই

সমুদ্রে ঝড়।

জলস্তম্ভ—আর একটি ভয়ানক জিনিষ। জলস্তম্ভ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে আকাশ খুব কাল মেঘে আচ্ছন্ন হয়, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কাইতে থাকে, এবং বাতাসে অনেক সময় গন্ধকের গন্ধ

তার চঞ্চলতা বাড়ে। তখন জলও 'ফানেলের' আকারে উপরের দিকে উঠিতে থাকে। ক্রমে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ছুটিতে মিশিয়া যায় এবং একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভের আকারে খুব দ্রুত

বেগে জলের উপর দিয়া চলিতে থাকে। এই রূপে কতকদূর চলিয়া স্তম্ভটি ভাঙ্গিয়া যায়; এই সময়ে জাহাজ প্রভৃতি কাছে থাকিলে তাহা

তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যায়। বিপরীত দিক হইতে সমান জোরে যখন বাতাস বহিতে থাকে, তখন কেহ কাহাকেও হটাইতে না পারিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে থাকে। ইহাকেই 'ঘূর্ণীবায়ু' বলে। এই ঘূর্ণীবায়ুর মাঝখানটি শূন্য থাকার দরুণ, সমুদ্র হইতে জল ও আকাশ হইতে জলীয় মেঘ, এই শূন্য স্থান অধিকার করে। যতক্ষণ বিপরীত দিকের দুটি বায়ুর সমান জোর থাকে, ততক্ষণ স্তম্ভটি ঠিক থাকে, জোরের ব্যতিক্রম হইলেই তাহা ভাঙ্গিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। জল ভিন্ন স্থলেও জলস্তম্ভ দেখা গিয়াছে। মেঘে যে জল থাকে তাহাদ্বারাই ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকে, অনেক দিন হইল দমদমায় এই রূপ একটি জলস্তম্ভ দেখা গিয়াছিল। এটি প্রায় এক হাজার হাত লম্বা এবং আদ মিনিট কাল স্থায়ী হইয়াছিল। এটি যেখানে ভাঙ্গিয়া যায়, তার চারিপাশে প্রায় সিকি ক্রোশ স্থান ছয় ইঞ্চি পরিমাণ জলে ডুবিয়া গিয়াছিল।

আলোগৃহ—সমুদ্রের মধ্যে স্থানে স্থানে পর্ব্বত আছে। রাত্রিকালে সেই সমস্ত স্থান দিয়া জাহাজ চলিলে বিপদে পড়িয়া থাকে। স্রোতের বেগেও অনেক সময় জাহাজ গিয়া এই পর্ব্বতের গায়ে পড়ে এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। এই বিপদ হইতে জাহাজ রক্ষা করিবার জন্য ঐ সকল পর্ব্বতময় স্থানে 'লাইট হাউস্' বা আলোকগৃহ আছে। পর্ব্বতের উপর এই সকল আলোক গৃহ নির্ম্মাণ করা হয় এবং এই গৃহের উপরিভাগে আলো জ্বালিয়া রাখা হয়। এই আলোক বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং নাবিকেরা দূর হইতে এই আলোক দেখিয়া সময় থাকিতেই সাবধান

হইতে পারে।

মেরু প্রদেশ—বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময়ই বরফে আবৃত থাকে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশকে মেরু প্রদেশ কহে। এখানে

সমুদ্রের সে তরঙ্গ নাই, সে গর্জ্জন নাই, সে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল শ্বেত বরফ রাশীতে সমুদ্রকে আবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এই বরফময় সমুদ্রের পরপারে হইয়াছে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট প্যারী নামে এক ব্যক্তি কয়েক বৎসর ধরিয়া এ বিষয় খুব চেষ্টা করিতেছেন। যেথানে গিয়া জাহাজ বরফে আট্‌কাইয়া গিয়াছে, সেথান হইতে, কুকুরের
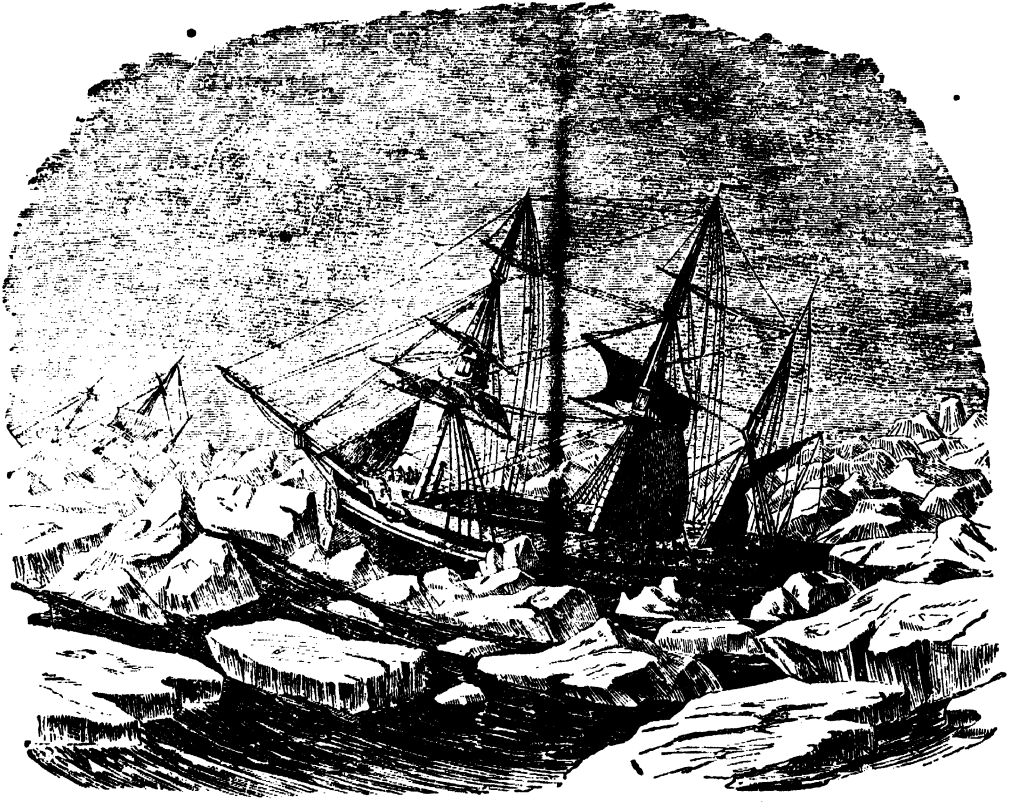
কোন দেশ আছে কি না, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইতেছে। এই রূপ আবিষ্কার করিতে গিয়া অনেককে জাহাজ সমেত বরফ বেষ্টিত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত বন্দী থাকিতে হইয়াছে, অনেককে প্রাণ হারাইতেও গাড়ী চড়িয়া তিনি এই বরফময় সমুদ্রের উপর দিয়া অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার আবিষ্কারের ফল কিছু জানিতে পারিলে তোমাদিগকেও জানাইব।

দ্বাদশ বর্ষ | ফাল্গুন ১৩০২ | ১১শ সংখ্যা
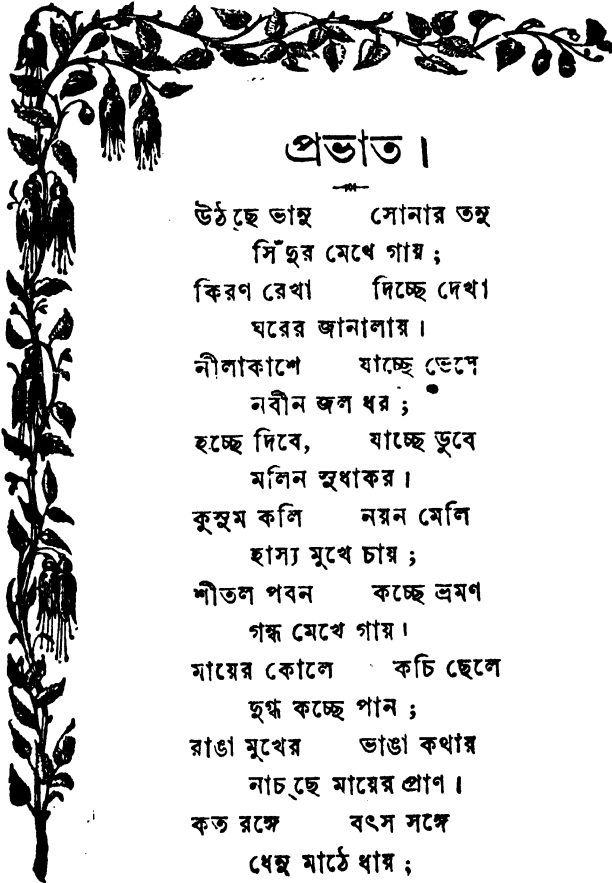
প্রভাত।

উঠ্‌ছে ভানু সোনার তনু
সিঁদুর মেখে গায়;
কিরণ রেখা দিচ্ছে দেখা
ঘরের জানালায়।
নীলাকাশে যাচ্ছে ভেসে
নবীন জলধর;
হচ্ছে দিবে, যাচ্ছে ডুবে
মলিন সুধাকর।
কুসুম কলি নয়ন মেলি
হাস্য মুখে চায়;
শীতল পবন কচ্ছে ভ্রমণ
গন্ধ মেখে গায়।
মায়ের কোলে কচি ছেলে
দুগ্ধ কচ্ছে পান;
রাঙা মুখের ভাঙা কথায়
নাচ্‌ছে মায়ের প্রাণ।
কত রঙ্গে বৎস সঙ্গে
ধেনু মাঠে ধায়;

সঙ্গে চালক রাখাল বালক
বাঁশরী বাজায়।
রাত পোহাতে রাজ পথেতে
চল্‌ছে গাড়ী ঘোড়া;
বাগানে মালী কুসুম তুলি
বাঁধছে ফুলের তোড়া।
নদীরজলে দলে দলে
কচ্ছে প্রাতঃ স্নান;
দেবালয়ে তানলয়ে
উঠ্‌ছে ভজন গান।
পথিক যত জাগরিত
ছুটছে বাড়ী পানে;
মুদী পকালি মাথায় ডালি
চলেছে আপণে।
যত নেয়ে ব্যস্ত হয়ে
ছেড়ে দিচ্ছে তরী;
মাঝি মাল্লা বল্‌ছে "আল্লা"
কেউবা "হরি হরি!"
সমস্তই ব্যস্ত যখন
নিজ নিজ কাজে;
উঠ শিশু, শুয়ে থাকা
এ সময় কি সাজে?
রাত পোহালে যে সাজালে
এম্‌নি করে ধরা,
কি আনন্দ! শব্দ গন্ধ
রূপ রসে ভরা!!
ভক্তি ভরে আগে তাঁরে
করি নমস্কার,
সযতনে কর বাছা
কার্য্য আপনার।

সূর্য্যকুমার গুডিভ্‌ চক্রবর্ত্তী, এম, ডি।

যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা সত্ত্বেও অনেকে মানুষ হইতে পারে না। আবার এক এক জন নানা প্রকার অসুবিধা ও দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে পড়িয়াও চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় গুণে আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়া থাকেন। দশ জনের যেমন করিয়া দিন কাটিতেছে, তোমারও যদি তেমন করিয়া দিন কাটিল, তবে তোমার জীবন বৃথায় গেল বলিতে হইবে। পৃথিবীতে কত লোক জন্মিতেছে, কতলোক মরিতেছে; আত্মীয় স্বজনেরা পর্য্যন্ত দু দিন পরে তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইতেছে। কিন্তু এক এক জন লোক হয়ত কত কাল মরিয়া গিয়াছেন, তবু দেশ বিদেশের লোক তাঁহার কথা স্মরণ করিতেছে এবং চির কাল করিবে।

একাত্তর বৎসর পূর্ব্বে, ঢাকা জেলার কনকসার নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে একটি ছেলের জন্ম হয়। গুডিভ্‌ চক্রবর্ত্তীর নাম তোমরা অনেকে শুনিয়া থাকিবে; এই ছেলেই পরে গুডিভ্‌ চক্রবর্ত্তী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

বালকের নাম সূর্য্যকুমার রাখা হইয়াছিল। সূর্য্যকুমারের পিতা রাধামাধব চক্রবর্ত্তী ঢাকার সদর কোর্টের উকীল ছিলেন এবং প্রথম বয়সে যথেষ্ট উপার্জ্জনও করিয়াছিলেন। কিন্তু বায়ুরোগ হওয়াতে অল্পকাল পরেই তাঁহাকে কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। সূর্য্য কুমারের পিতা যেমন উপার্জ্জন করিতেন, তেমনি তাহার ব্যয়ও খুব বেশী করিতেন। রোগে উপার্জ্জন বন্ধ হইল, এবং যে সামান্য টাকা সঞ্চিত ছিল, তাহা অল্পকাল মধ্যেই ফুরাইয়া গেল; কাজেই ছেলে কয়টিকে লইয়া শেষকালে তিনি অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

সূর্য্যকুমারের দেড় বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মার মৃত্যু হইল। তাঁহার বড় দুই ভাই এবং একটি বোন ছিলেন। সকলের বড় ভাই জমিদার সরকারে একটি সামান্য চাকুরী করি-

তেন। তাহাতে যাহা কিছু পাইতেন, তাহাদ্বারাই কোনমতে তাঁহাদের দিন চলিত। বিপদ কখনো একা আসে না। সূর্য্যকুমারের সাত আট বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল এবং তাহার এক বৎসর পরে তাঁর বড় ভাইএর মৃত্যু হইল। বড় ভাইএর মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে সূর্য্যকুমার ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা, লেখাপড়া শিখিবার জন্য কুমিল্লা গিয়াছিলেন। সেখানে প্রথমে গভর্ণমেণ্ট স্কুলের পণ্ডিত মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় থাকেন, এবং পরে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক কালিদাস মজুমদার মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে লেখা পড়া করিতেছিলেন। ঐ বাসায় তাঁহারা দুটি ভাই দুবেলা খাইতে পাইতেন, অন্যান্য খরচের জন্য বড় ভাইএর কাছে কিছু কিছু সাহায্য পাইতেন। কিন্তু বড় ভাইএর মৃত্যুতে তাঁহারা আরো বিপদে পড়িলেন, এবং এই সময়ে কালিদাস মজুমদার মহাশয়ের বাসায় থাকিবার সুবিধা না হওয়ায়, তাঁহাদিগকে সে বাসাও ছাড়িয়া আসিতে হইল। এই বিপদের সময় ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন মহাশয়ের পিতা, গোলক নাথ মুন্‌সী মহাশয় ইহাঁদিগকে আশ্রয় দেন। এই খানে দুটি ভাই খাইতে পাইতেন এবং স্কুল হইতে দুই টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন, তাহাদ্বারাই অন্যান্য ব্যয় চালাইতেন।
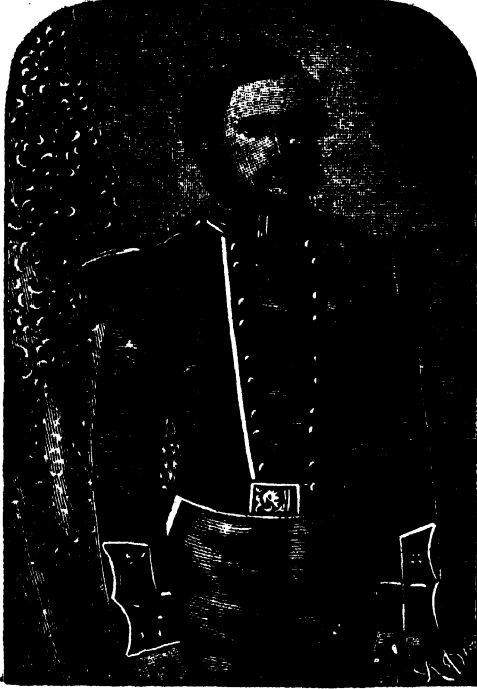
এই সময়ে জে, আলেকজাণ্ডার নামে এক সাহেব কুমিল্লার কলেক্টর ছিলেন। তিনি লেখা পড়ায় সূর্য্যকুমারের একান্ত অনুরাগ দেখিয়া, নিজে মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য দিয়া, তাঁহাকে কলিকাতার হেয়ার স্কুলে পড়িবার জন্য পাঠাইয়া দেন। তখন এণ্ট্রান্স, এল এ, বি এ, প্রভৃতি পরীক্ষা ছিল না। দুইটি মাত্র পরীক্ষা ছিল—জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলার সিপ্‌ পরীক্ষা। সূর্য্যকুমার ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এই জুনিয়ার স্কলারসিপ্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইলেন এবং মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন।

পড়া শুনায় মনোযোগ ও অনুরাগের জন্য এবং স্বভাব ও চরিত্র গুণে সূর্য্যকুমার সকল স্থানেই শিক্ষকের ভালবাসা পাইয়াছিলেন। এইচ্‌ গুডিভ্‌ সাহেব এই সময়ে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সূর্য্যকুমারকে অতিশয় স্নেহ ও যত্ন করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সূর্য্যকুমার একজন প্রকৃত প্রতিভাশালী বালক; উপযুক্ত রূপ শিক্ষা দিতে পারিলে, কালে সে একজন মানুষ হইতে পারিবে।

এই সময় দ্বারকা নাথ ঠাকুর দ্বিতীয় বার বিলাত যান। তিনি প্রথমবার বিলাতে যাইবার সময় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য, তাঁর নিজ

ব্যয়ে কয়েকটি ছাত্র বিলাত লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু সে বার কেহই যায় নাই। দ্বিতীয় বার যাইবার সময় তিনি পুনরায় সেই প্রস্তাব করেন এবং এবার গভর্ণমেণ্ট হইতেও দুইটি বৃত্তি দেওয়া হয়। সূর্য্যকুমার ইহারই একটি বৃত্তি লইয়া, ডাক্তার গুডিভের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতে যান। যথা সময়ে সূর্য্যকুমার লণ্ডনে পৌছিলেন এবং কলেজে ভর্ত্তি হইয়া খুব একাগ্রতার সহিত পড়া শুনা আরম্ভ করিলেন। আমাদের এদেশে যেটুকু পড়া শুনা কলেজেই হইয়া থাকে, কলেজের বাহিরে জ্ঞান চর্চ্চার বড় সুযোগ নাই। কিন্তু ইউরোপে অন্য প্রকার। সেখানে কলেজের শিক্ষা ছাড়া জ্ঞান চর্চ্চার জন্য নানাবিধ সভা সমিতি ও অন্যান্য অনেক প্রকার সুবিধা আছে। সূর্য্যকুমার কলেজের ছুটির সময়, প্যারিস্, ভিয়েনা বার্লিন, হিডেল্‌বর্গ প্রভৃতি অনেক স্থানে গিয়া, সেখানকার পণ্ডিত লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাদের নিকট নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যকুমার যথেষ্ট প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। বিলাতের সেই সময়কার প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণ একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। সূর্য্যকুমার প্রথমে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক হইয়া এদেশে আসেন। পাঁচ বৎসর পরে বাঙ্গালাদেশের মেডিকেল সার্ভিসে চাকরী পান। তাঁহার পূর্ব্বে এদেশবাসী কেহ কভ্‌ন্যাণ্টেড্‌ সার্ভিসে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে সূর্য্যকুমারই আমাদের দেশে প্রথম।

সূর্য্যকুমার যে একজন অতি বিচক্ষণ ডাক্তার হইয়াছিলেন, তাহা আর বলিতে হইবে না। তাঁহার চিকিৎসায় যে কেবল দেশের লোক উপকৃত হইয়াছিল তাহা নয়; দেশের লোক যাহাতে সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিতেন, 'বালক ও যুবকগণের শরীর ও মন সমান ভাবে উন্নত হইলেই দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে।'

সূর্য্যকুমার বিলাতে ডাক্তার গুডিভের প্রভাবে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তথায় একটি ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র ও কন্যারা এখন এদেশে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার দুই পুত্র সিভিলিয়ান। একজন বাঙ্গালায় আর একজন বোম্বায় প্রদেশে গভর্ণমেণ্টের উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যকুমারের মৃত্যু হয়।

আমরা সূর্য্যকুমারের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য শেষ করিব। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন "সূর্য্যকুমার শিশুকাল হইতেই অতিশয় শান্ত ছিল, কখনও কাহার সঙ্গে কলহ করে নাই। পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদর সূর্য্যকুমারের বাল্যাবস্থাতেই মরিয়া যান। আমি তাহা হইতে সর্ব্বদা সদ্‌ব্যবহারই পাইয়াছি। দেশীয় লোক কি আত্মীয় কোন কার্য্যের জন্য তাহার নিকট গেলে সে তাহা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই ও দেশে (কনকসার গ্রামে) না আসিলেও দেশের প্রতি তাহার মমতা ছিল ও দেশী লোক পাইলে দেশের আমূল ঘটনাবলি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিত।"

ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীমতী ললিতা রায় আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া একখানি ফটোগ্রাফ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে ছবি খানি তৈয়ার হইয়াছে; এবং ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ব্রজ নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তাঁহার বাল্য জীবন সম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। ইঁহার বয়স এখন ৭৩।৭৪ বৎসর হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সেজন্য তাঁহার নিকট এবং ছবি খানির জন্য ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীমতী ললিতা রায়ের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

কারিকর পাখী।

পাখীদের যত কারিকরী বাসা বানাইবার সময়। প্রায় সকল পাখীরাই খড় কুটা দিয়া নিজেদের সুবিধামত সুন্দর করিয়া বাসা বানায়। সকলেই যে গাছে বাসা করে তাহা নহে, ঘরের চালে, কিম্বা ছাদে, যাহার যেখানে ইচ্ছা বানাইয়া লয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পাখীরা ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারের বাসা বানাইয়া থাকে। বাসা বানায় যে, তাহা দেখিলে কখনই পাখীদের তৈয়ারী বলিয়া মনে হয় না, মানুষের তৈয়ারী বলিয়াই ভুল হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক রকম পাখী আছে তাহারা খড় কুটা দিয়া খুব সুন্দর বড় বড় বাসা বানায়। ইহার এক একটা বাসাতে প্রায় ১০০ পাখী থাকিতে পারে; এক একটা বাসাকে পাখীদের এক একটা ছোট খাটো সহর বলিলেই হয়। এই দক্ষিণ

বানাইবার সামগ্রীর মধ্যে খড় কুটার প্রচলনই কিছু বেশী। তবে ইহারা অনেক সময়ে নানা রকমের জিনিষ লইয়া গিয়া বাসা বানাইবার যোগাড় করে। নেকড়া, কাগজের টুকরা, পালক, যখন যাহা নিকটে পায় তাহাই লইয়া যায়। সকল পাখীতেই বাসা বানায় বটে, কিন্তু সকলের কারিকরী সমান নহে। এক এক জাতীয় পাখী এমন সুন্দর বাসা আফ্রিকা দেশেই নদী বা বিলের ধারে আর এক রকম পাখী দেখা যায়, তাহারাও খড় কুটা দিয়া খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাসা বানায়। হঠাৎ দেখিলে সে গুলিকে অসভ্য বুস্‌ম্যানদের কুঁড়ে ঘর বলিয়া ভ্রম হয়। এই দেশে আরও এক জাতীয় পাখী আছে, তাহারা তুলা কিম্বা পশম দিয়া সুন্দর শাদা ধব্‌ধবে বাসা বানায়।' তুলা বা পশম গুলি এমন করিয়া বুনে যে, মস্ত মস্ত

রেশমের গুটির মত এক একটা তুলা বা পশমের গুটি বলিয়া মনে হয়। এই রকম অনেক

কারিকর পাখী আছে, সকলের কথা এখানে বলা কিছু সহজ নয়।

এখন কেবল আমাদের দেশের দুই রকম কারিকর পাখীর কথা বলিব। তাহার মধ্যে একটিকে ইংরাজীতে বলে টেলর বার্ড বা দরজী পাখী। ইহারা নামেও যেমন কাজেও

তেমনি। ইহারা সচরাচর বেশ চওড়া পাতা আছে এমনতর গাছ দেখিয়া তাহাতে বাসা বানায়। গাছের ডালে, কাছাকাছি দুই খানা পাতার ধার গুলি একত্র করিয়া খুব সরু ঘাস, চুল বা বালাঞ্চি দিয়া সেলাই করে। অবশ্য সেলাইয়ের কাজটা ঠোঁট দিয়াই সারিয়া লয়। পাতা দুখানি একত্র করিয়া সেলাই করিলে ঠিক একটা থলির মত হয়। এই থলির ভিতরে নরম ঘাস কিম্বা তুলা দিয়া বাসা বানায় ও সেই বাসার মধ্যে ডিম পাড়ে। পাতা দুই খানি ছোট হইলে তিন খানি পাতা জুড়িয়াও সেলাই করে। ইহারা সাধারণতঃ তিনটা কনখও বা চারিটা ডিম পাড়ে। এই পাখীদের পুরুষেরা সাড়ে ছয় ইঞ্চি লম্বা হয়, আর তাহাদের লেজের মাঝখানের পালক দুটি লম্বা হয়। স্ত্রী পাখীদের লেজ ততটা লম্বা হয় না। পুরুষ পাখীদের লেজ স্ত্রী পাখী-দের চেয়ে দেড় ইঞ্চ বেশী লম্বা হয়।

বাবুই আমাদের দেশের আর এক জাতীয় বিশেষ পরিচিত কারিকর পাখী। আগে যে কারিকর পাখীর কথা বলিলাম, তাহাকে যদি 'দরজী পাখী' বলা যায়, তাহা হইলে ইহাকে 'তাঁতি পাখী' বলা উচিত। এবং ইংরাজীতেও এই জাতীয় পাখীকে "Weaver bird" বা বয়নকারী পাখী বলে। বাবুইএর বাসা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহারাও খুব সুন্দর বাসা বানায়। ইহাদের বাসা বুনি-বার কারিকরী দেখিলে মানুষের তৈয়ারী বলিয়াই বোধ হয়। ইহাদের বাসা প্রায়ই উচু গাছে ঝুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাল খেজুর প্রভৃতি গাছেই কিছু বেশী দেখা যায়। যে সকল উচু গাছ নদী বা জলের ধারে থাকে, সেই সকল গাছেই ইহারা বাসা বানাইতে ভাল বাসে। বাসাগুলি গাছের ডাল হইতে ঝুলিতে থাকে, এবং ৩ ফিট্ বা ৩॥ ফিট লম্বা হয়। বাসার ভিতরে প্রবেশ করিবার দরজা নীচের দিকে থাকে। এরূপ করিয়া বাসা বানাইবার একটা প্রধান কারণ এই যে, ইহারা সাপের হাত হইতে সহজে রক্ষা পায়।

বাসা গুলি খুব লম্বা লম্বা চোঙ্গের মত হয় ও এই চোঙ্গের মাঝে মাঝে কোন কোন

জায়গা গোল হইয়া যেন ফুলিয়া থাকে। এই গুলি পাখীদের থাকিবার স্থান। কখন কখন পাখীরা বাসার মধ্যে দু একটা জোনাকী পোকা ধরিয়া বন্ধ করিয়া রাখে। লোকে বলে রাত্রে ঘরে আলো হইবে বলিয়া ইহারা এরূপ করে। ঘরে রোশ্‌নাই করিবার মতলব ইহাদের আছে কি না বলিতে পারি না, তবে শুনিয়াছি ইহারা জোনাকী পোকা খায় এবং ছানাদের খাওয়াইবার জন্যও ধরিয়া লইয়া যায়। বাসা বুনিবার বিদ্যাটা ইহারা জন্মা-বুধিই কিছু কিছু লাভ করে। তবে শিক্ষা এবং অভ্যাসেরও যে বিশেষ প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ সকল বাবুইএর বাসাই ঠিক সমান সুন্দর ও পরিপাটি হয়না। কোন কোন বাসা নিতান্ত কাঁচা হাতের বলিয়া মনে হয়, সে গুলি সাধারণতঃ বাচ্চা পাখীদের। কোন কোন পাখীরা ভালরূপ কারিকরী শিখিতে পারে না, তাহাদের বাসাও তেমন পরিপাটি হয় না। করিকরদের শিক্ষা ও অভ্যাসের বিভিন্নতায় ওস্তাদীরও বিভিন্নতা হয়।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু, বি, এ।

কে বড়।

সে প্রায় আজ চল্লিশ বছরের কথা। তখন বাঙ্গালী বাড়ী ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র কোথাও বড় যাইত না। এখন পশ্চিম অঞ্চলে অনেক স্থানেই বাঙ্গালী দেখিতে পাওয়া যায় এবং এক একস্থানে তাহাদের সংখ্যাও বড় কম নয় কিন্তু সে সময় অত বড় লক্ষ্ণৌ সহরে আমরা চার পাঁচটি মাত্র বাঙ্গালী ছিলাম।

লক্ষ্ণৌ তখন অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী

এবং লক্ষ্ণৌ এ ওয়াজিদ আলি সা তখন নবাবী করিতেছিলেন। ওয়াজিদ আলি সার নাম তোমরা অনেকে শুনিয়া থাকিবে এবং অনেকে মেটেবুরুজে তাঁর বাড়ীও দেখিয়া থাকিবে। ওয়াজিদ আলি সার সময় অযোধ্যা প্রদেশের অবস্থা বড়ই মন্দ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্যের কায কর্ম্ম তিনি কিছুই দেখিতেন না, তাঁর কতগুলি প্রিয়পাত্র রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল, তিনি কেবল আমোদ প্রমোদে দিন কাটা-ইতেন; 'নবাবী' বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তিনি তাহাই করিতেন। রাজ্যে কত অবিচার, কত অত্যাচার হইত, তিনি তাহা চক্ষু তুলিয়া ও দেখিতেন না।

ক্রমে একথা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কাণে উঠিল। তাঁহারা ওয়াজিদ আলি সাকে রাজ কার্য্যে মনোযোগী হইতে বলিলেন এবং পুর্ব্বের সন্ধির সর্ত্তের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ইহাও জানাইলেন যে, দুই বৎসরের মধ্যে রাজ্যের অবস্থার উন্নতি না হইলে তাঁহারা সে জন্য তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিবেন। দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

লর্ড ডালহৌসী তখন এদেশে গভর্ণর-জেনারেল। তিনি লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেণ্ট কর্ণেল স্লীম্যানকে পত্র লিখিয়া জানিলেন যে, রাজ্যের অবস্থা ভাল হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে আরো মন্দ হইতেছে। ইংরাজ তখন অযোধ্যা প্রদেশ নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। ওয়াজিদ আলি সার অযোধ্যার নবাবী ফুরাইল; তিনি ইংরাজের নিকট মাসহারা লইয়া মেটেবুরুজে আসিয়া নবাবী করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি আফিসে তারানাথ বাবু কর্ম্ম করিতেন। তারানাথ বাবুর সঙ্গে আমার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না, লক্ষ্ণৌএ পরিচয় হয়। তখন সেখানে আমরা চার পাঁচটি মাত্র বাঙ্গালী ছিলাম, কাজেই আমাদের কজনের মধ্যে বেশ আত্মীয়তা ছিল।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় তারানাথ বাবুর বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল যে, তখনি আমাকে সে বাড়ীতে যাইতে হইবে; তারানাথ বাবু বড় অসুস্থ। আমি একটু ব্যস্ত হইয়া তখনি সেখানে গেলাম। গিয়া শুনিলাম, কর্ম্মস্থান হইতে বাড়ী আসিয়া তিনি হাত মুখ ধুইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ পড়িয়া যান। তার পর হইতে আর তিনি হাত পা নাড়িতে পারি-তেছেন না, কথাও বলিতেছেন না। আমি কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তারানাথ বাবুর পক্ষাঘাৎ হইয়াছে, হাত পা নাড়িবার শক্তি নাই এবং বাক্‌রোধ হইয়াছে।

বাড়ীতে তারানাথ বাবুর স্ত্রী এবং তের বছরের একটি ছেলে, তাঁর এই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। আমি তাহাদিগকে কতকটা সান্ত্বনা করিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে গেলাম। একমাস পর্য্যন্ত প্রাণপণে চিকিৎসা করাইলাম, টাকাও অনেক ব্যয় হইল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। একমাস রোগ ভোগের পর তারানাথ বাবুর মৃত্যু হইল।

এই ঘটনার পর প্রায় দুই মাস কাটিয়া গেল। তখন তারানাথ বাবুর স্ত্রী ও ছেলেটিকে দেশে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক মনে করিয়া, একদিন তারানাথ বাবুর স্ত্রীকে সে কথা জানাইলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন যে, দেশে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, সেখানে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন। আমা-দিগেই তিনি এখন আত্মীয় স্বজন মনে করিয়া, আমাদিগের উপরই অনেক ভরসা করিতেছেন। তাঁর ছেলেটি সেইখানে থাকিয়া যাহাতে মানুষ হইতে পারে, আমাদিগকে তখন সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন, সুতরাং সেইরূপ বন্দোবস্তই হইল।

লক্ষ্ণৌএ সুখনরাম নামে একজন মাড়ো-য়ারী মহাজন সেই সময়ে বাস করিত। এই

সুখনরাম একদিন আসিয়া আমাকে বলিল, “বাবু সাহেব, তারানাথ বাবু ত মারা পড়েছেন, তাঁর কাছে আমার কিছু টাকা পাওনা ছিল, তার কি হবে?” কত টাকা এবং কিসের জন্যই বা টাকা পাওনা, তাহা জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, তারানাথ বাবু বাড়ী করিবার সময় সুখন রামের নিকট হইতে চারি হাজার টাকা নিয়াছিলেন। আমি ইহার কিছুই জানিতাম না। কিন্তু তারানাথ বাবু যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহাতে তিনি এ টাকা লইলেও, তাহা যে এতদিনে পরিশোধ করেন নাই, তাহা আমার বিশ্বাস হইল না। যাহাই হউক, অনুসন্ধান করিয়া যাহা হয় পরে জানাইব, এই কথা বলিয়া সুখনরামকে তখন বিদায় করিলাম। তার পর তারানাথ বাবুর স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সুখনরামের নিকট হইতে টাকা লওয়া হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা পরিশোধ করা হইয়াছে কি না, তাহা তিনি জানেন না। আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। হঠাৎ পক্ষাঘাৎ হইয়া তারানাথ বাবুর বাক্‌রোধ হইয়া যায়; কাজেই, দেনা পাওনার কথা তিনি কিছুই বলিয়া যাইতে পারেন নাই। এদিকে তাঁর স্ত্রীর হাতে যে টাকা ছিল, চিকিৎসায় তাহা প্রায় সমস্ত ব্যয় হইয়া গিয়াছিল; সামান্য যাহা ছিল, তাহাদ্বারা কোনমতে তাঁহাদের দিন চলিতেছিল। তখন আমি এ বিষয়ে পরামর্শ লইবার জন্য একজন উকীলের কাছে গেলাম। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া, ইহার কোন দলিলপত্র আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। সুখনরামের কাছে দলিলপত্র কিছুই ছিল না, কেবল মাত্র তারানাথ বাবুর হাতের একখানি চিঠি ছিল। উকীল সেই কথা শুনিয়া বলিলেন, “দলিল পত্র না থাকিলে এজন্য আপনাদের কিছু ভাবিতে হইবে না।” আমি তারানাথ বাবুর স্ত্রীর কাছে গিয়া একথা জানাইলাম। সেখানে তারানাথ বাবুর ছেলে মনীন্দ্রনাথও ছিল। সে সেই কথা শুনিয়া বলিল, “দলিল পত্র নাই বলে কি সুখনরাম তাহার ন্যায্য পাওনা পাবে না? বাবা যখন তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন, এবং সে টাকা পরিশোধ করা হয়েছে কিনা আমরা যখন তাহা জানি না, তখন তাঁর সে ঋণ আমাদের পরিশোধ করতেই হবে। সুখনরাম বাবাকে বিশ্বাস করে বিনা দলিলে টাকা দিয়েছিল, আমরা কি এখন তাকে ফাঁকী দিব?” আমি বালকের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া তার মুখ পানে চাহিয়া রহিলাম। মনীন্দ্রনাথের মা তখন বলিলেন, “সত্যই যদি সুখনরামের টাকা পাওনা থাকে, তবে সে টাকা যে প্রকারেই হউক আমাদের পরিশোধ করতে হবে, তাকে ফাঁকী দিলে কি আমাদের ভাল হবে? অধর্ম্ম কল্লে কারও ভাল হয় না। যে উপায়ে এখন এ ঋণ শোধ হতে পারে, আপনি সেই চেষ্টা করুন।”

আমি তখন আর কোন কথা না বলিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার সময় সুখন রাম আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে বলিলাম যে, তারানাথ বাবুর দেনা পাওনার কোন হিসাব পত্র পাওয়া যায় নাই, সুতরাং তাহার এই টাকা সত্য সত্যই পাওনা আছে কি না, তাহা জানিবারও কোন উপায় নাই। সে এই কথা শুনিয়া বলিল, যে, হিসাব পত্র থাকুক আর নাই থাকুক, তাহার ন্যায্য পাওনা সে যে প্রকারে পারে আদায় করিবে। আমি তখন বলিলাম, যে, তাহার কোন দলিল পত্র নাই, বিনা দলিলে সে কি করিবে। তাহাতে সে বলিল, “দলিল দস্তাবেজের আমি বড় ধার ধারি না। সুখনরাম মাড়োয়ারীর টাকা এপর্য্যন্ত কেহ হজম্ করতে পারে নাই। দেখা যাবে টাকা আদায় হয় কি না।” আমি দেখিলাম দলিলের ভয় দেখাইয়া কোন ফল হইল না; কাজেই, তখন নরম হইয়া বলিলাম, “সুখন রাম, তারানাথ বাবুর পক্ষাঘাতে বাক্-

রোধ হয়ে গিয়েছিল, তা বোধ হয় তুমি জান। টাকা কড়ি কি আছে না আছে তা তিনি কিছুই বলে যেতে পারেন নাই। তাঁর স্ত্রীর হাতে যে সামান্য টাকা ছিল, তা প্রায় সমস্তই তাঁর চিকিৎসায় ব্যয় হয়ে গেছে। এখন অতি কষ্টে কোন প্রকারে তাদের দিন চল্‌ছে। তোমার এ টাকা তাদের এখন দেবার শক্তি নাই।” সুখনরাম বলিল, “কেন, অত বড় বাড়ী খানা রয়েছে, বাড়ী বেচে দেনা শোধ করুক।” আমি বলিলাম, “থাক্‌বার মধ্যে ঐ বাড়ী খানাই আছে, বাড়ী খানা বেচ্‌লে ওদের পথে দাঁড়াতে হবে।” সুখনরাম এ-কথার কোন উত্তর করিল না, কেবল এই মাত্র বলিল, “আমি সে সব কিছু জানিনা, আপনি তারানাথ বাবুর স্ত্রীকে বলবেন, সাত দিনের মধ্যে আমার সমস্ত টাকা চাই।”

সুখনরাম চলিয়া গেল। আমিও তারানাথ বাবুর বাড়ীর দিকে গেলাম। তারানাথ বাবুর স্ত্রী আমাকে দেখিয়া, সুখনরামের সঙ্গে কোন কথা বার্ত্তা হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সমস্ত কথাই বলিলাম। মনীন্দ্রও সেখানে ছিল; আমার কথা শেষ হইলে সে বলিল, “মা, আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম; বাড়ীর জন্যই সুখনরামের টাকা পাওনা রয়েছে, বাড়ী বেচেই সে টাকা পরিশোধ করা হোক্।” মনীর কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, “বাড়ী খানি গেলে যে তোমাদের মাথা রাখ্‌বার যায়গাটুকুও থাক্‌বে না?” তাহাতে মনীর মা বলিলেন; “আমাদের যা অদৃষ্টে থাকে হবে। বাড়ী বেচেই দেনা শোধ করা উচিত। তাঁর দেনা রেখে আমি এ বাড়ীতে বাস করতে পারবো না।” আমি দেখিলাম, মা ও ছেলে, কাহাকেও ফিরাইতে পারিব না। তখন অগত্যা বাড়ী বিক্রয়ের বন্দোবস্তই করিতে হইল। আলি মহম্মদ নামে এক জন ভদ্র মুসলমান পাঁচ হাজার টাকায় বাড়ী খানি কিনিলেন। সুখনরামের টাকা পরিশোধ করা হইল।

তারানাথ বাবুর স্ত্রীকে আমি আমার বাড়ীতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলাম; তাহাতে তিনি বলিলেন, “সকল বিষয়েই ত আপনার কাছে সাহায্য পাচ্ছি, আবশ্যক হ’লে আপনার বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌তেও হবে। তবে এখন যা কিছু হাতে আছে, তাতেই যখন চল্‌তে পারে, তখন আর সে বন্দোবস্ত না করে, আমরা দুটিতে থাক্‌তে পারি, এমনতর একটু স্থান আপনার বাড়ীর কাছে দেখে দিন, আমরা সেই খানে গিয়ে থাকি।” সেইরূপ বন্দোবস্তই হইল। দাস দাসী যাহারা ছিল, তাহাদিগকে জবাব দিতে হইল। তারানাথ বাবুর স্ত্রী ছেলেটিকে লইয়া কোনমতে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

এদিকে আলি মহম্মদ নূতন বাড়ীতে বসবাস করিতেছেন। একদিন তাঁহার বাগানের মালী আসিয়া তাঁহাকে বলিল, “হুজুর, আপনাকে একবার বাগানে আস্‌তে হবে, বিশেষ আবশ্যক, বিলম্ব ক’রবেন না।” আলি মহম্মদ মালীর ব্যস্ততা দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন কি হয়েছে?” মালী বলিল, “সেখানে গিয়েই দেখ্‌তে পাবেন, বেশী দেরী করবেন না।” আলি মহম্মদ তাহার সঙ্গে তখনি বাগানে গেলেন। মালী তাঁহাকে একটি গাছের তলায় লইয়া গিয়া বলিল যে, সে সেই খানকার মাটি খুঁড়িতেছিল; খুঁড়িতে খুঁড়িতে হঠাৎ একটা বাক্স সেই মাটির ভিতর পাইয়াছে। অস্ত্রের আঘাতে বাক্সের ডালা খানা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে দেখিল, বাক্সটা টাকায় পোরা রহিয়াছে! সে বাক্সটা মাটি চাপা দিয়া তাঁহাকে ডাকিতে গিয়াছে। তার পর সেই মালী মাটি খুঁড়িয়া তাঁহাকে সেই বাক্স দেখাইল। আলি মহম্মদ মালীর সততা দেখিয়া অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সে অনায়াসেই টাকাগুলি হস্তগত করিতে পারিত। গরীব হইয়াও যে সে এত টাকার

লোভ সাম্‌লাইতে পারিয়াছে, ইহাতে তিনি তাঁহাকে মনে মনে সহস্রবার প্রশংসা করিলেন।

তারপর আলি মহম্মদ সেই টাকার বাক্সটি লইয়া তখনি আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁর কাছে আমি সমস্ত ঘটনা শুনিলাম। তিনি বলিলেন, "খোদা মিলিয়ে দিয়েছেন; আহা,

তারানাথ বাবু এমন একটা লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও ছেলের কত না তক্‌লিফ হচ্ছিল! খোদার কৃপায় এখন তাদের কষ্ট দূর হলো। আপনি এখন এই সমস্ত টাকা গুলি নিয়ে তারানাথ বাবুর স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিন।" আমি আলি মহম্মদ সাহেবের সততা দেখে তাঁকে শতমুখে প্রশংসা করিলাম। তিনি তাতে বল্লেন, "এতে আমার প্রশংসার কি আছে? যদি প্রশংসার কাজ কেহ ক'রে থাকে তবেসে আমার বাগানের মালী। টাকা গুলো অন্য কারও নজরে পড়লে হয়ত তারানাথ বাবুর ছেলে তা হ'তে বঞ্চিত হতেন। ঐ বাড়ীতেই যখন টাকা গুলো পাওয়া গেছে, তখন এ টাকা তারই। আমি যার টাকা তার হাতে পৌঁছে দিতে পারলাম, এই আমার সুখ।" সেই মালী ও আলি মহম্মদ সাহেবকে আমি শত শত ধন্যবাদ দিলাম। সেই অনাথ বালক এবং অনাথা বিধবার দুর্দ্দশা এত দিনে ঘুচিল, ভগবান দুঃখীর মুখ পানে চাহিলেন। "খোদা মেহেরবানি করেছেন, এখন ইঁহারা পৈতৃক ভিটায় গিয়া বাস করুন" এই বলিয়া আলি মহম্মদ নিজেই ইচ্ছা করিয়া বাড়ীটি ছাড়িয়া দিলেন। বাড়ীর মূল্য তাঁহাকে ফেরৎ দেওয়া হইল। সেই মালীকেও যথেষ্ট পুরস্কৃত করা হইল। তারানাথ বাবুর স্ত্রী ছেলেকে লইয়া নিজ বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বল দেখি পাঠক পাঠিকা, আলি মহম্মদ, বাগানের মালী এবং তারানাথ বাবুর ছেলে, এই তিন জনের মধ্যে কে বড়?

পেন্‌গুইন্।

অপর পৃষ্টায় যে পাখীর ছবি দেখিতেছ উহাকে পেন্‌গুইন্ বলে। ইহারা দক্ষিণ মহাসাগরের তীরে বাস করে। ইহাদের ডানা দেখ কত ছোট! কেবল নাম মাত্র রহিয়াছে। ডানা এত ছোট বলিয়া ইহারা উড়িতে পারে না। মাটির উপরে তাড়াতাড়ি যাইতে হইলে এই ডানা দিয়া সম্মুখের পায়ের কাজ করিয়া লয়। ডানা ও পায়ের সাহায্যে ইহারা যখন শীঘ্র চলিতে থাকে তখন কোন ছোট চতুষ্পদ জন্তু বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা জলচর পক্ষী। হাঁস পা দিয়া সাঁতরায়, ইহারা পা ও ডানা দুই দিয়া সাঁতরায়। সাঁতরাইবার সময়ে ডানা দিয়া নৌকার দাঁড়ের ন্যায় জল সরাইয়া অগ্রসর হয়। ইহারা জলে ডুব দিয়া মাছ ধরিয়া খায়। নিশ্বাস লইবার জন্য মাঝে মাঝে উপরে উঠে। সেই সময়ে হঠাৎ জোরে জলের উপর লাফাইয়া উঠে, আবার তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। যখন পেন্‌গুইন্ এইরূপ করিতে থাকে, তখন কোন পাখী যে ঐরূপ করিতেছে তাহা বোধ হয় না; মাছ জলের উপর লাফাইয়া উঠিতেছে বলিয়া ভ্রম হয়।

ইহারা ছানাকে যখন খাওয়ায় তখন দেখিতে বড় মজা। ধাড়ি পাখীটা কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়ায়, আর গলা ও মুখ নাড়িয়া খানিকক্ষণ ঠিক যেন বক্তৃতা করে, পরে ছানার দিকে ঘাড়টা হেঁট করিয়া মুখটা হাঁ করে! সেই ছানাটা, যে এতক্ষণ চুপ্ করিয়া বক্তৃতা শুনিতে ছিল, তখন আপন ঠোঁট মায়ের মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া ভিতর হইতে এক গাল খাবার খাইয়া লয়। আবার সেই ধাড়ি পাখীটা

পূর্ব্বের মত ঘাড় মুখ নাড়িয়া কতক্ষণ বক্তৃতা করিয়া ছানাটার দিকে ঘাড় হেঁট করিয়া দিয়া হাঁ দিয়া আহার করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সন্তানের তৃপ্তি হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধাড়ি পাখীটা

করিয়া থাকে, আর ছানাটাও পূর্ব্বের মত নিজের মুখ মার মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া বারে বারে ঐরূপ ঘাড় ও মুখ নাড়িতে থাকে ও আপন মুখ হইতে বাচ্চাকে খাওয়ায়।

পেন্‌গুইনের সাহস খুব। মানুষকে পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া যায়। কিন্তু তাড়া করিলে কি হইবে; সামান্য এক ঘা খাইলেই পঞ্চত্ব পায়।

এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে হইলে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া সারি বাঁধিয়া হাঁটিয়া যায়। সম্মুখে পথে ইঁট পাথর থাকিলে সরাইয়া পথটি পরিষ্কার করিয়া লয়। কোন স্থান দিয়া পেন্‌গুইনের দল চলিয়া গেলে, সেখানটা সমান ও পরিষ্কার হইয়া যায়; দেখিলে বোধ হয় যেন একটা পথ হইয়া রহিয়াছে।

পেন্‌গুইন্ একবারে দুইটা ডিম পাড়ে; একটা ডিম বড় হয়, আর একটা ছোট হয়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ বসু

"এমন মা না হলে কিএমন ছেলে হয়!"

পৌরাণিক আখ্যান মালা,

প্রথম আখ্যান।

(২০৯ পৃষ্ঠার পর)

বিধবার মেজো ছেলেটি আড়াল হ'তে মায়ের কথা সব শুনে ছিলেন। বাইরে আস্‌বামাত্র মাকে প্রণাম করে, তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বল্লেন, "মা, যেন জন্ম জন্ম তোমার মত মা পাই। আমাকে যে পেটে ধরেছিলে, এতদিনের পর তা সার্থক হলো।" পুত্রের আহ্লাদ দেখে বিধবারও খুব আহ্লাদ হলো। এইসময় বিধবার আর চারটি ছেলে বাড়ীতে ফিরে এলেন; এসেই সকল কথা শুন্‌লেন। বিধবার বড় ছেলেটির স্বভাব সকলের কর্‌তে শান্ত। ঝগড়া, মারামারি, গোলমাল এ সকলের ভিতর তিনি বড় থাক্‌তে চাইতেন না। মেজো ভাইটির নাম করে তিনি মাকে বল্লেন, "মা তুমি এ কি করেছ? তুমি নাকি ভীমকে রাক্ষসের মুখে পাঠাতে মত দিয়েছ? মা, তুমি কি জাননা যে, আমাদের চারিদিকেই শত্রু; ভীমের ভয়েই পাপিষ্ঠেরা আমাদের কিছু কর্‌তে পারে না। সেই ভীমকেই তুমি কালসাপের গর্ত্তে পাঠালে! মা, তুমি ভাল কর নাই।", বিধবা শুনে একবার বড় ছেলের মুখের দিকে চাইলেন; একটা ভ্রুকুটী করে বল্লেন, "যুধি, আমি যে এত বার ব্রত করলেম, দেবতা ব্রাহ্মণের পুজো করলেম, তোর কি বিশ্বাস সে সকলই বৃথা! তুই বুঝি মনে করেছিস্, পৃথিবীতে দেবতা নাই, ধর্ম্ম নাই, এ ভূত প্রেতের রাজ্য? আমার ভীমের যদি কোন বিপদ হয়, তবে দেখিস্ আকাশ থেকে চন্দ্র, সূর্য্য খসে পড়্‌বে? ক্ষত্রিয় হয়ে তুই এমন কাপুরুষ হলি কেন?" এই কথা গুলি বলবার সময় বিধবার মুখখানি লাল হয়ে উঠ্‌লো। চোক্ দিয়ে যেন আগুনের ফিন্‌কি বেরুতে লাগলো। বড় ছেলেটি থতমত খেয়ে বল্লেন, "মা, আমি বুঝ্‌তে পারিনি, আমায় মাপ করো। আমি জান্‌তে পাচ্চি, তোমার আশীর্ব্বাদে ভীম রাক্ষসকে বধ করে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আস্‌বে; আমি আর কখনও তোমার কথার উপর কথা কব না।" বড় ছেলের ভাব দেখে বিধবা আর কিছু বল্লেন না। ভীমও সেই সময় বল্লেন, "দাদা, তোমার এত ভাব্‌না কেন? তুমি আর মা, দুজনে আমায় পায়ের ধূলো দিও, তারির জোরে আমি রাক্ষসকে গুঁড়ো-

করে রেখে আসবো। যখন আমরা হিড়িম্ব রাক্ষসের দেশ দিয়ে এসেছিলুম, তখন ত সে আমাদের মারতে এসেছিল। মনে [illegible] কি দশা করেছিলুম্? হ'লই বা রাক্ষস, তা ভাব্না কি?"

ভীমের কথা শুনে, বিধবা আর তাঁর চারটি ছেলে সকলই খুব সুখী হলেন। গরীব ব্রাহ্মণের যে প্রাণ রক্ষা হল, তাই ভেবে পাঁচ ভায়ের আর আহ্লাদের সীমা রইলো না। বিধবার যে ছেলেটি ঠিক ভীমের পরেই, তিনি মনে মনে ভাব্‌তে লাগলেন, "হায়! মা যদি মেজদাদাকে না পাঠিয়ে আমাকে পাঠাতেন তাহলে বেশ হতো। কেমন রাক্ষস একবার দেখ্‌তুম।"

ক্রমে বেলা শেষ হয়ে এল। ব্রাহ্মণ আবশ্যক মত অন্ন ও দুটি মহিষ সংগ্রহ করলেন। ভীম, মায়ের আর বড় ভায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে. সেই সব সঙ্গে করে, রাক্ষসের বাড়ীর দিকে চল্লেন। আর চারটি ভায়ের ইচ্ছা ছিল যে, ভীমের সঙ্গে সঙ্গে যান। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলেছিলেন যে, একা যাওয়াই নিয়ম, তাই তাঁরা খানিক দূর গিয়ে, যেখান হ'তে বনের পথ আরম্ভ হয়েছে, সেইখান হ'তে ফিরে এলেন। ভীম একাই যেতে লাগ্‌লেন। চারদিকে নিবিড় বন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় সন্ধ্যা না হ'তেই অন্ধকার হয়ে আস্‌ছিল। কোথাও পেঁচাগুলো ডাক্‌ছিল, কোথাও তক্ষক সাপগুলো গর্জ্জন কর্‌ছিল। দূর থেকে এক একবার বাঘ ভাল্লুকের শব্দ কানে প্রবেশ করছিল। মহিষ দুটো কোন মতেই এগুতে রাজি নয়; ভীম জোর করে টেনে নিয়ে চল্লেন। এই রকম যেতে যেতে, সন্ধ্যার আগে ভীম এক্‌টা প্রকাণ্ড বাড়ীর সুমুখে গিয়ে পঁহুছিলেন। বাড়ীটার চারিদিকে কাঁটা ঝোপ, আর বাঁশের ঝাড়। কেবল এক দিকে একটা লোহার দরজা; সেটা ভিতর দিক থেকে হুড়্‌কো দিয়ে বন্ধ। দরজার সুমুখে অনেক দিনের একটা পুরাণ বটগাছ, তার তলায় এক খানা প্রকাণ্ড পাথর, তাতে রক্ত মাখানো। পাথর খানার চারিদিকে মানুষের, গোরুর, আরও কতরকম জন্তুর হাড় ছড়ান রয়েছে। আর কেউ হ'লে সেই পাথর খানি দেখেই অজ্ঞান হয়ে পড়্‌তো, কিন্তু ভীমের শরীরে ভয়ের লেশ মাত্র নাই। ভীম বটগাছের এক্‌টা নীচু ডালে মহিষ দুটিকে বেঁধে, দরজার কাছে গেলেন; গিয়ে সজোরে এক্‌টা লাথি মেরে বল্লেন, "ওরে রাক্ষস, আয় বাইরে আয়।" ভীমের লাথিতে সেই লোহার দরজাটা ঝন্ ঝন্ করে উঠ্‌লো। আর চোকের পলক পড়্‌তে না পড়্‌তে; রাক্ষস একটা বিকট শব্দ করে, দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। তখনও সূর্য্য একেবারে অস্ত যায় নাই; একটু একটু লাল আলো তখনও গাছের ভিতর দিয়ে আস্‌ছিল। ভীম সেই আলোতে রাক্ষসের মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। ছোট খাট একটা তাল গাছের মতন লম্বা; মাথায় কটা কটা একরাশ চুল, গায়ের রং যেন কালী ঝুল; চোক দুটো কুলকাঠের আঙ্‌রার মত জলছিল। নাকটা চ্যাপ্টা, ঠোট দুখানা পুরু, তার ভিতর থেকে মূলোর মত দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল। গলায় হাড়ের মালা, কোমরে একটা চিতা বাঘের চামড়া জড়ান। শরীর থেকে এমন দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল যে, নিকটে যায় কার সাধ্য! ভীমকে দেখ্‌বামাত্র রাক্ষস দাঁতগুলো কড় মড় করে বল্‌লে, "কেরে তুই যে, আমার দরজায় লাথি মারিস্? তুই বুঝি জানিস্ না যে, এ বক রাক্ষসের বাড়ী? আয় তোর ঘাড়টা মট্‌কে ভাঙ্গি।" রাক্ষস এই বলেই একলাফে ভীমের সুমুখে এসে পড়লো। ভীমও তাই চাচ্ছিলেন; দুজনেই দুজনাকে খুব কশে ধর্‌লেন। রাক্ষসের ইচ্ছা ছিল যে, ধরেই ভীমের ঘাড়টা মট্‌কে দেয়, না হয়, সেই পাথরের উপর আছাড় দিয়ে তাঁর হাড়গোড় চূর্ণ করে। তা হল না দেখে, রাক্ষস রাগে গর্ গর্ করতে

লাগ্‌ল। ক্রমে দুজনে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেল। কেউ কারুর চেয়ে কম নয়; কখনও ভীম উপরে রাক্ষস নীচে; কখনও রাক্ষস উপরে ভীম নীচে, এই রকম যুদ্ধ চল্‌তে লাগ্‌ল। রাক্ষস আপনার ঝিনুকের মত বড় বড় নখ দিয়ে ভীমের শরীর একেবারে ক্ষত বিক্ষত করে ফেল্‌লে। ভীমও ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। এক একটি বজ্রের মত মুটকীতে রাক্ষসের এক একটি দাঁত, আর লাথির চোটে তার এক এক খানি পাঁজরার হাড় ভেঙে দিতে লাগলেন। যে অমন মায়ের ছেলে, তাকে কি কেউ যুদ্ধে হারাতে পারে? দণ্ড দুই যুদ্ধের এত কাল ধরে যে মানুষ গোরু খেয়ে পেট ভরিয়েছিল আজ তার উপযুক্ত ফল ফললো। এ পরিকারের লোক জনেরা দূর থেকে এই যুদ্ধ দেখ্‌ছিল। যখন দেখ্‌লে রাক্ষস মরেছে, তখন তারা চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে, কে যে কোথায় পালাল, ভীম তা দেখতে পেলেন না। তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছিল, বনের জন্তুরা সব বেরুতে আরম্ভ করেছিল। ভীমের মনে হল, মা, দাদা এতক্ষণে কত ভাবচেন, আর দেরি করা উচিত নয়। কিন্তু সেই অন্ধকারে তাঁকে বনের ভিতর পথ বলে দেবে কে? অনেক ভেবে চিন্তে তিনি মহিষ দুটিকে গাছ

পর রাক্ষস আর পারলে না, অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লো। তখন ভীম তার দুটো পা ধরে, সেই পাথরের উপর নিয়ে আছাড় দিলেন। রাক্ষস থেকে খুলে ছেড়ে দিলেন; ছেড়ে দেবা মাত্র তারা গ্রামের দিকে চল্‌লো; ভীমও পিছনে পিছনে যেতে লাগ্‌লেন।

এদিকে যতই রাত্রি হচ্ছিল, ভীমের ভাইরা ততই চিন্তিত হচ্ছিলেন। তাঁরা মনে [illegible] লেন, এতক্ষণে যা হয় একটা কিছু হয়ে [illegible] ভীমের সেজো ভাই আপনার ধনুক বাণ বার করে বল্‌ছিলেন, "মেজ দাদার যদি কিছু হয়, তা হলে পৃথিবীতে আর রাক্ষস রাখবো না।" তাঁর ছেলেরা যখন এই রকম কথা বার্ত্তা কচ্চিলেন, তখন বিধবা আপনার ঘরের দরজাটি বন্ধ করে, যোড়হাতে ভগবানকে ডাক্‌ছিলেন। তাঁর দুই চোক দিয়ে দর্ দর্ করে জল পড়ছিল; তিনি বল্‌ছিলেন, "দয়াময় হরি, এই দুঃখিনীর বাছাকে রক্ষা করো। বড় কষ্টে আমি আমার বাছাদের মানুষ করেছি, তাদের যেন কোন বিপদ না হয়, এই দুঃখিনীর কথা ভুলে যেও না ঠাকুর।" হঠাৎ কে যেন তাঁর কানে কানে বললে, "ভয় নাই, ওই যে তোর ভীম আস্‌ছে।" ঠিক সেই সময় ভীম এসে বাহিরের দরজায় ঘা দিয়ে বল্লেন, "মা, দোর খোল, আমি এসেছি।" বিধবা শোনবামাত্র ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন, আর ভীমকে দেখে পাগলের মত বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দুজনের যে কি আনন্দ, তা আর বলবার কথা নয়। ভীমের ভাইরা আর সেই ব্রাহ্মণও ছুটে এলেন। ব্রাহ্মণের মুখে কথাটি নাই। তিনি ভীমকে বুকে ধরবেন, বিধবাকে আশীর্ব্বাদ করবেন, না ভগবানকে স্তুতি কর্‌বেন, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না; অবাক হয়ে সকলের মুখপানে চেয়ে রইলেন। বিধবা ব্রাহ্মণকে বল্লেন, "ঠাকুর, আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ এ কথা কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না। আমার ইচ্ছা, যে লোককে না জানিয়ে আমার ছেলেরা যেন মানুষের উপকার করতে পারে।"

এই কথা শুনে বিধবার উপর ব্রাহ্মণের ভক্তি আরও দ্বিগুণ হল। তিনি বল্লেন, "মা, তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ, তোমার কথায় আমি অবাধ্য হব না। যত দিন তোমরা এ দেশে থাক্‌বে, ততদিন আমি এ কথা কারুকেও বলবো না। শাস্ত্র কি মিথ্যা! এমন মা না হলে কি এমন ছেলে হয়?"

ভীমের রক্তমাখা শরীর দেখে সকলেই ব্যাপার কি বুঝতে পাল্লেন, বড় আর জিজ্ঞাসা কর্‌তে হল না। ভীম দু চার কথায় ভাইদের কাছে সমস্ত বল্লেন। ক্রমে রাত্রি অনেক হয়ে এল। তখন মায়ের পায়ের কাছে বিছানা করে পাঁচ ভায়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। বিধবার গুণে সে দেশ সেই অবধি নিষ্কণ্টক হ'ল।

প্রিয় বালক বালিকা, এঁরা পাঁচ ভাই কে তা কি তোমরা বুঝতে পারলে? তোমরা মহাভারতে পঞ্চ পাণ্ডবের কথা অবশ্যই শুনেছ? এঁরা পাঁচ ভাই, সেই পঞ্চ পাণ্ডব। আর এই বিধবা তাঁদের জননী কুন্তী দেবী *। আমাদের দেশের ধার্ম্মিক বৃদ্ধেরা প্রাতঃকালে উঠে এখনও এঁর নাম করেন। যেমন পঞ্চ পাণ্ডব তেমনই তাঁদের জননী কুন্তীদেবী। ব্রাহ্মণ যথার্থই বলেছিলেন, "এমন মা না হলে কি এমন ছেলে হয়।"

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু, বি, এ,

* কুন্তীদেবী নকুল সহদেবের বিমাতা শিশুকালে তাঁহাদিগের মাতা মাদ্রী পরলোকগত হইলে, কুন্তীদেবী নকুল সহদেবকে মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করিয়াছিলেন

কয়েকটী অদ্ভুত পরিকীর জন্তু।

এই যে জন্তুর ছবি দেখিতেছ ইহাদের অষ্ট্রেলিয়া দেশে বাস। ইহাদের শরীর বড় বড় ছুঁচোর শরীরের মত। মুখ খানি দেখ হাঁসের
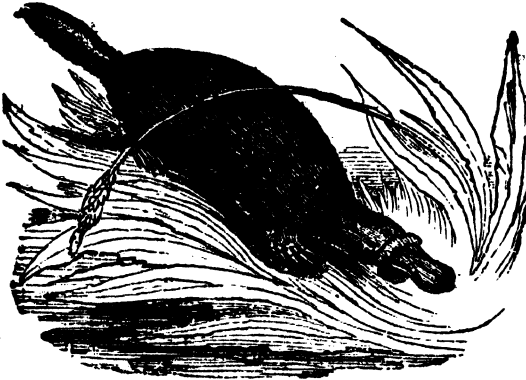
ঠোঁটের মত। পা ও হাঁসের পায়ের মত। ইহারা এক হাত বা দেড় হাত লম্বা হয়। ইহাদের শরীর মেটে রঙ্গের ঘন লোমে আবৃত। লেজটী গোল না হইয়া চেপ্‌টা হয়। ইহারা জলাশয়ের ধারে মাটীতে খুব লম্বা লম্বা গর্ত্ত করিয়া বাস করে। এই বাসায় প্রবেশ করিবার দুইটী করিয়া পথ থাকে। একটী মাটীর উপর দিয়া, আর একটী জলের তলা দিয়া। বাহিরের প্রবেশ পথ জঙ্গল ঝোপের মধ্যে লুকান থাকে। প্রবেশ দ্বার হইতে গর্ত্তে যাইবার মাটীর ভিতরের সরু পথ বা সুড়ঙ্গ প্রায় ১৫ হাত পর্য্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া যায়। পরে বাস করিবার বড় গর্ত্ত বা ঘর। এইটীতে ঘাস পাতা দিয়া বাসা বানায়। এই বাসায় ইহারা ডিম পাড়ে এবং কালে সেই ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। সে ছানারা মার দুধ খায়। তোমরা কি কখন কোন প্রাণীর বিষয় শুনিয়াছ যারা ডিম ফুটিয়া বাহির হয়, অথচ মায়ের দুধ খায়? যত প্রকার জীব ডিম পাড়ে মনে করিয়া দেখ। দেখিবে, তাহারা কেহই সন্তানকে স্তন দেয় না। কিন্তু এই যে জীবের কথা বলিতেছি, ইহারা অদ্ভুত। ইহারা ডিম পাড়ে, অথচ ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইলে তাহাকে স্তন দেয়। পেটের তলায় চামড়ায় ছিদ্র আছে তাহা হইতে দুধ বাহির হয়। ইহাদের স্তনের বোঁটা হয় না। ভয় পাইলে ইহারা 'বল'এর মত গোল পিণ্ড হইয়া পড়িয়া থাকে। ইহাদিগকে ইংরাজিতে duck-bill বা হংস-চঞ্চু বলে। ইহারা প্রায় জলেই থাকে। ইহাদের পা হাঁসের পার মত বলিয়া সহজে সাঁতরাইতে পারে। শরীরের লোম তেলতেলে, অনেকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিলেও গা ভিজে না। হাঁসের মত চেপ্‌টা ঠোঁট দিয়া কাদার ভিতর হইতে শামুক গুগ্‌লি বাহির করিয়া খায়। কীট পতঙ্গ ও জলের পোকা মাকড় খাইয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। পায়ের নখ ও ঠোঁট দিয়া মাটী খুড়িয়া গর্ত্ত করিয়া বাসা তৈয়ার করে।

ঐ জাতীয় আর একটী জন্তুর ছবি দেখ। ইহারাও ডিম পাড়ে ও সন্তানকে স্তন দেয়।

ইহাদের শরীর সাজারুর কাঁটার ন্যায় কাঁটায় আচ্ছাদিত। ইহাদের পা হংস-চঞ্চুর পায়ের ন্যায়। ঠোঁট সরু ও লম্বা। ইহারাও জলের ধারে মাটিতে সুড়ঙ্গ কাটিয়া তাহাতে বাস

করে। পোকা মাকড় খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদিগকে ইংরাজিতে '' বলে। ইহাদিগেরও বাস অষ্ট্রেলিয়া

আর একটী অদ্ভুত জন্তুর ছবি দেখ, ইহাকে "অপোসম" বলে। অপোসম তিন চারি প্রকারের হয়। ইহাদের পেটের তলায় একটা

চামড়ার থলিয়ার মত হয়। সেই থলিয়ায় আপন নিরুপায় ছোট ছানাদিগকে আশ্রয় দেয় ও বহন করিয়া বেড়ায়। পুরুষ অপোসমের পেটে থলিয়া জন্মে না। ছবিতে যে অপোসম দেখিতেছ ইহা অতি ক্ষুদ্র জাতীয়। খুব বড় ইন্দুরের মত হইবে। ইহাদিগকে মেরিয়ানস্ অপোসম বলে। ইহাদের পেটে থলিয়া হয় না। ছানা গুলি মার পিঠে চড়িয়া আপনাদের লেজ দিয়া মার লেজ শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। আর এই ভাবে ছানা পিঠে করিয়া ধাড়ি অপোসমটা গাছে গাছে ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়ায়। অপোমস ফল মূল ও ছোট ছোট পাখী ধরিয়া খায়। আমেরিকা, দেশে ইহাদের বাস। তথায় বাগানে গাছের ফল খাইয়া ও নষ্ট করিয়া লোকের বড় ক্ষতি করে। রাত্রে গৃহস্থের ঘরে ঢুকিয়া শৃগালের ন্যায় পালিত হাঁস ও মুরগী মারিয়া লইয়া চলিয়া যায়। ইহাদের লেজ খুব বড় হয়। লেজ দিয়া গাছের ডাল জড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া দুলিয়া, অন্য ডাল ধরে। বিড়াল বা কুকুরের ছানার প্রথম অবস্থায় চোক বন্ধ থাকে। ইহাদের ছানার চোক ও কান দুইই বন্ধ থাকে, পরে একটু বড় হইলে ফোটে।

নীচে দেখ কাঙ্গারুর ছবি। ইহাদের মেয়েদেরও পেটের তলে একটা থলিয়া জন্মে। সেই থলিয়ায় শাবক দিগকে আশ্রয় দেয় ও তাহাতে শাবক গুলি বহন করিয়া বেড়ায়।

কাঙ্গারু অনেক প্রকারের হয়। কোন কোন জাতীয় কাঙ্গারুর শরীর চার হাত লম্বা হয়, দাঁড়াইলে মানুষের অপেক্ষা উঁচু হয়। আবার কোন কোন জাতীয় কাঙ্গারু খরগোসের অপেক্ষা বড় হয় না।

কাঙ্গারুর মাথাটা দেখিতে হরিণের মাথার মত। ইহাদের সম্মুখের পা দুখানি খুব ছোট, পিছনের পা দুখানি খুব বড়। লেজে এত

জোর যে, লেজের এক আঘাতে মানুষের পা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। ইহারা প্রায়ই পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়া বসে। লম্বা ঘাস ও ঝোপের উপর দিয়া দূরের জিনিষ দেখিবার

সময়ে পিছনের পা ও লেজের উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়, এবং চলিবার সময়ে লম্বা পায়ের ভরে লাফাইতে লাফাইতে যায়। এক এক লাফে দশ বার হাত পার হইয়া যায়। সন্তান জন্মিলেই মাতা তাহাকে পেটের তলায় থলিয়ায় রাখে। তখন ছানাগুলির শরীর বড় কোমল থাকে। ক্রমে যখন বড় হয়, তখন মাঝে মাঝে অ[illegible] করিয়া থলিয়ার ভিতর হইতে মুখ [illegible] পরিষ্কার চারিদিক দেখিতে থাকে। আরও বড় হইলে বাহির হইয়া মায়ের নিকট থাকিয়া ঘাস পাতা খায়। ভয় পাইলেই আবার থলিয়ায় প্রবেশ করে।

সমালোচনা।

বাল্যগ্রন্থাবলী নং ২। নদী—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে অতি সরল ও সুমিষ্ট কবিতায় উৎপত্তি হইতে শেষ পর্য্যন্ত নদীর প্রাকৃতিক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তক খানি পড়িয়া বালক বালিকারা নদী সম্বন্ধে অনেক কথা শিখিতে পারিবে। বরফে ঢাকা সাদা পাহাড়ের দেহ হইতে ঝিরি ঝিরি করিয়া বাহির হইয়া, বড় বড় বনের অন্ধকারের ভিতর দিয়া ক্রমে নীচে আসিয়া সঙ্গী জুটাইয়া, মাটী পাথর কাটিয়া, নানা বাধা অতিক্রম করিয়া, কত নগরের নিকট দিয়া বহিয়া সমতল ভূমে আসিয়া, ক্রমে প্রশস্ত হইয়া নদী কিরূপে সমুদ্রে পড়িয়াছে, এই সকল অতি চমৎকার ভাবে সরল ওসুমিষ্ট কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকে আমরা যুক্তাক্ষর খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে স্থানে স্থানে ইহার কবিত্ব ছোট ছেলে মেয়েরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। অপেক্ষাকৃত বড় ছেলে মেয়েদের বেশভাল লাগিবে।

আর এক কথা। "নদীতে" ছবি দেওয়া উচিত ছিল। বাঙ্গালা দেশের ছেলেরা পাহাড়, ঝরণা, নদীর আরম্ভ স্থানের আকৃতি, বড় বড় নুড়ির ভিতর দিয়া ক্ষুদ্রকায় নদীর গতি, পাহাড়ের গা কাটিয়া নদীরগমন, এবং ঢেউপূর্ণ সমুদ্র, ইহার কিছুই কল্পনা করিতে পারে না। এই সকলের ছবি দিতে পারিলে তাহাদের বুঝিবার সুবিধা হইত।

বাল্যগ্রন্থাবলী নং ৩। ক্ষীরের পুতুল—শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত। অবনীন্দ্র বাবুর শকুন্তলার (বাল্যগ্রন্থাবলী নং১) কথা আমরা পূর্ব্বে পাঠক পাঠিকাদিগকে বলিয়াছি। তাঁহার ক্ষীরের পুতুল পাঠ করিয়াও আমরা প্রীত হইলাম। এই রকমের রূপকথা ও আরো নানা প্রকার গল্প ছেলে মেয়েদের পাঠের উপযোগী করিয়া সহজ ভাষায় যিনি যত লিখিবেন তিনি সেই পরিমাণে দেশের একটী অভাব দূর করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। আমাদের এখন বেশ স্মরণ হয় খুব ছেলেবেলায় রূপকথা শুনিতে কত আগ্রহ প্রকাশকরিতাম; তখন বিলাতি সণ্ডেস্কুলের শুষ্ক নীতিপূর্ণ গল্প শুনিয়া বিশেষ কোন লাভ হইত না। তাহাতে মনে হঠাৎ বিশেষ কোন নৈতিকভাব জাগিয়া উঠিত না, অথচ গল্প শুনিয়া যে একটা সুখ বা তৃপ্তি বোধ তাহাও হইত না। আমাদের বিশ্বাস অবনীন্দ্র বাবুর বাল্য গ্রন্থগুলি বালক বালিকাদিগের নিকট বিশেষ আদৃত হইবে এবং ইহা পাঠ করিয়া তাহারা যথেষ্ট আমোদ ও তৃপ্তি লাভ করিবে।

আমরা অভিভাবকদিগকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা নিজেদের ছোট ছোট ছেলেদের এই বই দুখানির এক এক খণ্ড কিনিয়া দেন। প্রত্যেক খানির মূল্য ।৴০। প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

দ্বাদশ বর্ষ } চৈত্র ১৩০২ { ১২শ সংখ্যা
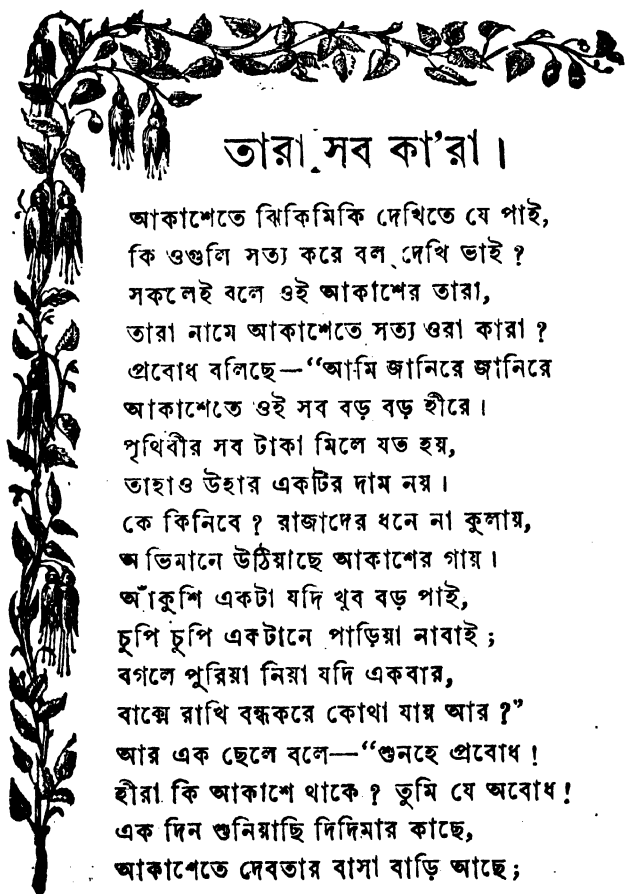
তারা সব কা'রা।

আকাশেতে ঝিকিমিকি দেখিতে যে পাই,
কি ওগুলি সত্য করে বল দেখি ভাই ?
সকলেই বলে ওই আকাশের তারা,
তারা নামে আকাশেতে সত্য ওরা কারা ?
প্রবোধ বলিছে—"আমি জানিরে জানিরে
আকাশেতে ওই সব বড় বড় হীরে।
পৃথিবীর সব টাকা মিলে যত হয়,
তাহাও উহার একটির দাম নয়।
কে কিনিবে ? রাজাদের ধনে না কুলায়,
অভিমানে উঠিয়াছে আকাশের গায়।
আঁকুশি একটা যদি খুব বড় পাই,
চুপি চুপি একটানে পাড়িয়া নাবাই ;
বগলে পুরিয়া নিয়া যদি একবার,
বাক্সে রাখি বন্ধকরে কোথা যায় আর ?"
আর এক ছেলে বলে—"শুনহে প্রবোধ !
হীরা কি আকাশে থাকে ? তুমি যে অবোধ !
এক দিন শুনিয়াছি দিদিমার কাছে,
আকাশেতে দেবতার বাসা বাড়ি আছে ;

প্রদীপ জালিয়ে বুঝি আকাশের ঘরে
দেবতার ছেলে গুলি লেখা পড়া করে।
আমি যদি হইতাম দেবতার ছেলে,
আকাশে তারার বাতি রাখিতাম জেলে;
রাত্রে আলে দিনে ওরা দেয় নিভাইয়া,
আমি রাখিতাম রাতদিন জালাইয়া।"
মাধব বলিছে,—"তোরা বলিস্ যে ভুল,
ইন্দ্রের বাগানে ওরা পারিজাত ফুল;
দিনেতে কলিকা থাকে রাত্রিকালে ফুটে,
কখনদেখিতে পাই খসে পড়ে ছুটে।
আহা, একদিন যদি পাই এক ফুল,
কুড়াইয়া কানে পড়ি বাহারের দুল।"
বচু বলে শুনিয়াছি পিসিমার কাছে
পুণ্যবান লোক সব তারা হয়ে আছে।
আমি যদি তারা হই তবে কি বাহার,
দুই পা দোলায়ে হব মেঘেতে সোয়ার;
চাঁদের দেশেতে আমি বেড়াইতে যাব,
তুচ্ছ করি ধরা পানে মিটি মিটি চাব;
পাহাড়েরা পা'র নীচে গড়া গড়ি যাবে,
বৃষ্টিরা যতন করি চরণ ধোয়াবে,
সাবান বদলে গায়ে জোছনা মাখিব,
রামধনু [illegible] শিরে মুকুট পরিব,
বিদ্যু[illegible] হার পরিব গলায়,
তোমরা অবাক হ'য়ে দেখিবে আমায়।
প্রবোধের পিতা সেথা দূরে দাঁড়াইয়া,
শুনেছেন সব কথা আড়ালে থাকিয়া;
কাছে আসি হাসি হাসি বলেন তখন,
"তোমাদের সব কথা করেছি শ্রবণ,
হীরে নহে, ফুল নহে, নহে কোন জীব,
দেবতার ছেলে সব জালেনি প্রদীপ,
বহুদূর হতে তাই ছোট দেখ অত,
বড় বড় ওরা সব পৃথীবির মত।
তারা হতে চেয়ে যদি দেখে কোন জন,
পৃথিবী দেখিবে ঠিক তারার মতন।
এমনি আশ্চর্য্য দেখ সৃষ্টি বিধাতার,
আকাশে পৃথিবী ঘোরে হাজার হাজার"।
চমকি ছেলেরদল শু'নে সব কানে,
অবাক্ হইয়া চায় আকাশের পানে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ

শজারু।

আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই শজারু দেখিতে পাওয়া যায়। শজারুর সর্ব্বাঙ্গ লম্বা লম্বা শক্ত কাঁটায় ঢাকা। শজারু ইচ্ছা করিলে এই কাঁটা গুলিকে পাতিয়া শরীরের সহিত সমান করিয়া রাখিতে পারে। আবার রাগিলে সমস্ত কাঁটা খাড়া করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। সে সময়ে ইহার নিকটে থাকা নিরাপদ নহে। শজারুর কাঁটার আঘাতে শরীরে যে ক্ষত হয় তাহা প্রায়ই মারাত্মক হইয়া পড়ে। শজারু একবার বেগে যে প্রাণীর শরীরের উপর গিয়া পড়ে তাহার দেহে কাঁটা ফুটিয়া যায়, এবং কয়েকটী কাঁটা শজারুর দেহ হইতে খসিয়া তাহার দেহে বিঁধিয়া লাগিয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া না ফেলিলে সেই কাঁটা ক্রমে ক্রমে শরীরের ভিতর অধিকতর প্রবিষ্ট হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটায়। ভারতবর্ষে যে সকল বাঘ ও চিতাবাঘ শিকারীদের হাতে মারা পড়িয়াছে তাহাদের অনেকের শরীরের মাংসে শজারুর কাঁটা বিঁধিয়া রহিয়াছে, ও সেই ক্ষত স্থান সকল ঘা হইয়া পচিয়া রহিয়াছে দেখা গিয়াছে।

ইহারা দিবাভাগে আপন গর্ত্তে লুকাইয়া

থাকে এবং রাত্রিকালে আহার অন্বেষণে বাহির হয়। সেই জন্য দিনের বেলায় ইহাদিগকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় [illegible]হারা

শজারু।

সাধারণতঃ জল পান করে না, ছোট ছোট গাছের রসাল মূল ও ডাঁটা খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। ইহারা খরগোসের ন্যায় ফল মূল পাতা ও গাছের ছাল খাইয়া জীবন ধারণ করে, এবং মাটীতে গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে বাস করে।

বেত দিয়া যে রূপে ডালা, পাল্লা ও বাক্স তৈয়ার হয়, শজারুর কাঁটা সকল একত্র করিয়া সেই রূপে খুব সুরঙ্গ সুন্দর ডালা, বাক্স

ও পাখা তৈয়ার হয়। এই কাঁটায় কলমের হ্যাণ্ডেল বা বাঁট ও তৈয়ার হয়।

শজারুর ঘাড় ও মাথা কাঁটার পরিবর্ত্তে লম্বা কঠিন লোমে আবৃত। ভয় পাইলে বা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ইহারা শরীর গুটাইয়া "বল" বা পিণ্ডের মত হইয়া পড়ে, এবং শরীরের চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ কঠিন কাঁটা খাড়া হইয়া থাকে। শজারু সচরাচর দুই হাত লম্বা হ[illegible] ইহারা ধীরে ধীরে গমন করে, এবং [illegible]র সময়ে শরীরের কাঁটায় কাঁটায় ঘর্ষণে কর কর শব্দ হইতে থাকে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ বসু।

অপব্যয়ী পুত্র।

য়িহুদিদের মধ্যে এক সময়ে একজন ধনী ও ধার্ম্মিক সওদাগর ছিলেন। ধন, মান, বিদ্যা বুদ্ধিতে তাঁহার সমান লোক খুব কম ছিল। সকলের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল, গরীব দুঃখীর প্রতি দয়া ছিল এবং সাধু লোকের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল।

সওদাগরের দুইটি ছেলে ছিল। বড় ছেলেটি অনেকটা পিতার ন্যায় ধীর ও শান্ত ছিল, কিন্তু ছোটটি ভিন্ন প্রকৃতির হইয়াছিল। বাপের অগাধ সম্পত্তি; সুতরাং সুখ ও আরামের কোন জিনিসেরই ছেলেদের অভাব ছিল না। তাহাদের সেবা সুশ্রূষার জন্য দলে দলে দাস দাসী সর্ব্বদা হাজির থাকিত। সওদাগরের সর্ব্বদাই ত্রাস ছিল তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রদের কখন কি কষ্ট হয়, কখন তাহারা কি অভাব বোধ করে। নিমেষে যেন তিনি তাহাদিগকে হারাইতেন।

কিন্তু মানুষের কেমন মন! এত সুখ এত আরামের মধ্যেও সওদাগরের ছোট ছেলে-টির মন উঠিত না, আশা মিটিত না। কেমন তাহার কুমতি হইয়াছিল! সে ভাবিত, "এই-রূপ নজরবন্দিতে থাকিয়া কি সুখ হইতে পারে! যদি বাবার হাতের বাহির হইয়া স্বাধীনভাবে দশজন বন্ধুবান্ধব নিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে পারি, তবেই প্রকৃত সুখ। তাহা না হইলে জেলে বসিয়া মিষ্টান্ন ভোজনে কে কবে সুখী হইয়াছে"! অনেক দিন ক্রমাগত এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া সেই নির্ব্বোধ যুবক তাহার পিতার নিকট গিয়া এক দিন স্পষ্টই বলিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর বিষয় সম্পত্তির সে যে ভাগ পাইবে তাহা তাহাকে এখনই দেওয়া হউক; গৃহে থাকিয়া তাহার সুখ নাই; সে বিদেশে গিয়া স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারিলেই সুখী হইবে। আর তাহা না হইলে তাহার মনের অশান্তি কিছুতেই যাইবে না। কি নিষ্ঠুর কি নিষ্ঠুর! বুড়া সওদাগরের মাথায় যেন হঠাৎ বজ্রাঘাত হইল! তিনি বুদ্ধিমান লোক, সহজেই ছেলের মত-লব বুঝিতে পারিলেন। চারিদিক তাঁহার নিকট তখন যেন শূন্য বোধ হইতে লাগিল। কত রকমে ছেলেকে বুঝাইলেন, কত চক্ষের জল ফেলিলেন; কিন্তু সেই নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ যুবকের সব কথায় একই উত্তর—"গৃহে তাহার সুখ নাই"।

সওদাগর বুঝিলেন ছেলের দুর্ম্মতি মুখের কথায় ফিরিবার নয়। তাহার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ ক্লেশ আছে; সেই দুঃখক্লেশে একবার না পড়িলে তাহার শিক্ষা হইবে না, দুর্ম্মতিও দূর হইবে না। এখন তাহাকে জোর করিয়া গৃহে রাখা বৃথা; কারণ, তাহা হইলে

কোন দিনই তাহার মনের অসন্তোষের ভাব ঘুচিবে না। কাজেই, সওদাগর তাঁহার [illegible] সম্পত্তির সমান দুই ভাগ করিয়া [illegible] বড় ছেলের জন্য রাখিলেন, অন্য [illegible] ছোটছেলেকে দিলেন। নগদ টাকা ভিন্ন গরু ঘোড়া উট ইত্যাদি গৃহপালিত পশু এবং আরও নানা প্রকার জিনিসপত্র যাহা কিছু তাহার ভাগে পড়িল তাহা সমস্ত বেচিয়া ছোট ছেলে নগদ টাকা করিল, এবং সেই সব টাকা সঙ্গে লইয়া সুখী হইবার জন্য সে বিদেশে যাত্রা করিল। নির্ব্বোধ যুবক! তাহাকে বিদায় দিবার সময় বুড়া সওদাগর কত বুঝাইলেন, কত দুঃখ করিলেন, কিন্তু সে তাহাতে একটুও টলিল না। সওদাগর চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

দূরদেশে যাইয়া সওদাগরের ছেলে একখানি সুন্দর বাড়ী করিল। অতি সুন্দর সুন্দর কত রকমের জিনিস পত্রে বাড়ী খানি সাজাইল। দশজন বন্ধু বান্ধব নিয়া আহার ব্যবহার, আমোদ আহ্লাদ করিতে হইলে যাহা কিছু আবশ্যক তাহার সমস্ত বন্দবস্ত হইল। তখন দলে দলে আসিয়া সঙ্গী জুটিতে লাগিল। আহারের সময় ইয়ার ও বন্ধুর দলে বাড়ী খানি ভরিয়া যাইত। যে যাহা হুকুম করিত, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা আনিয়া দাস দাসীরা তাহার নিকট হাজির করিত। কোন জিনিসের অভাব ছিল না, বা কোন বিষয়ে ত্রুটি ছিল না। দিন রাত্রি সে বাড়ীতে নাচ গান আমোদ কৌতুক চলিত। কিন্তু এ সকল কয়দিনের জন্য! দেখিতে দেখিতে সেই নির্ব্বোধ যুবকের টাকার পুঁজি ফুরাইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে নাচ গান প্রভৃতি আমোদ কৌতুকের

মাত্রাও কমিতে লাগিল। এদিকে সখের বন্ধু ও ইয়ারগণও সময় বুঝিয়া একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে অতি অল্পদিনের মধ্যে সেই সওদাগরের ছেলে দেখিতে পাইল যে, তাহার যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে, ঋণের জাল তাহাকে ঘিরিয়াছে, এবং দেনার জন্য তাহার বাড়ী খানি পর্য্যন্ত পাওনাদারের হাতে গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, টাকার অভাবে শেষে তাহাকে পথে দাঁড়াইতে হইল। এক সময় বন্ধু ভাবে যাহারা তাহার বাড়ীতে কত খাইয়াছে, কত আমোদ করিয়াছে, এখন আর সে তাহাদের দেখা পায় না; আর দেখা হইলেও এখন আর তাহারা তাহাকে চিনিতে পারে না। এই সময় সেই হতভাগ্য যুবকের দুঃখের মাত্রা বাড়াইবার জন্যই যেন সেই দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ [illegible] দিল। পেটের দায়ে সওদাগরের ছেলে [illegible]রে দুয়ারে ঘুরিতে লাগিল,—কোথায়ও [illegible] চাকরী জুটিল না। কি এমন তাহার গুণ আছে যে চাকরী জুটিবে! অবশেষে বাধ্য হইয়া তাহাকে এক গৃহস্থের অধীনে শূকর চরাইবার কাজ নিতে হইল। য়িহুদিদের মধ্যে শূকর চরান একটী অতি ঘৃণার কাজ; কিন্তু পেটের জন্য লোকের কি না করিতে হয়! ক্ষুধা তৃষ্ণায় জ্বালায় সওদাগরের ছেলে হইয়াও তাহাকে আজ অতি ঘৃণার কাজ, শূকর রাখিবার কাজ, লইতে হইল। এখানেই যে তাহার

দুঃখ ক্লেশের শেষ হইল তাহা নহে। ঐ গৃহস্থ বড় নির্দ্দয় লোক ছিল। তাহার নিকট

সময়মত মাহিয়ানা পাওয়া যাইত না। অনেক সময় সামান্য ত্রুটির জন্য সমস্ত মাসে‐ য়ানা হয়ত সে কাটিয়া রাখিত। কাজে‐ গরের ছেলের অনেক সময়ে অনাহারে থাকিতে হইত। মাঠে রৌদ্রের মধ্যে সে শূকর চরা ইত, আর ক্ষুধা তৃষ্ণায় যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হইত, ছুইটি চক্ষের জলে তাহর বুক ভাসিয়া যাইত। তখন সে ভাবিত—"হায়. আজ এই শূকরের খাদ্য পাইলেও আমি খাইয়া বাঁচিতে পারি, কিন্তু তাহাও আমার ভাগ্যে জুটে না। আমার পিতার গৃহের অতি সামান্য একজন চাকর আজ যাহা খাইতে পরিতে পাইতেছে, আমি শত চেষ্টা করিয়াও তাহা পাইতেছি না। আমার আপনার মাথার আপনি কুড়াল মারি‐ য়াছি, অন্যে কে কি করিবে! এভাবে এত ছুঃখ ক্লেশের মধ্যে কত দিন যে এ পাপের ভোগ ভুগিতে হয় কে জানে! হায়! হায়! ইহার উপায়ই বা আর কি আছে!"

একদিন বসিয়া বসিয়া এইরূপ ভাবি‐ তেছে এমন সময়ে কে যেন তাহার মনের মধ্যে বলিল—"নির্ব্বোধ যুবক, তুই চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, তাহা না হইলে তোর এ দুর্দ্দশা কেন! তোর পিতা যে এখনও বেচে আছেন। তুই নিষ্ঠুর ও অকৃতজ্ঞ হইলেও, তিনি স্নেহমমতা‐ শূন্য নহেন। তোর ভাবনায় ভাবনায় তাঁহার জীবনের সুখ ও শান্তি সব গিয়াছে। এখনও যদি গিয়া সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিস্ তিনি তোকে কখনই ঠেলিয়া ফেলিবেন না।" সওদাগরের ছেলে তখন যেন অতিশয় দুঃখকষ্টপূর্ণ একটী স্বপ্ন দেখিয়া

হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত গত দুর্ব্বুদ্ধি ও দুষ্কর্ম্মের কথা মনে করিয়া সে যেন পাগলের মত হইল। আর বিলম্ব না করিয়া তখনই সে গৃহে রওনা হইল। পথে চলিতে চলিতে মনে ভাবিতে লাগিল—"বাবার নিকট গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব; তাঁহার গৃহে একটী সামান্য চাকরের মত থাকিয়া যাহাতে দুই বেলা দুই মুঠা ভাত পাই সেই ভিক্ষা চাহিব। তাঁহার পুত্রের স্থান পাইবার আশা করা আমার পক্ষে অন্যায়। আমি ঘোর পাপী, কোন মুখে তাঁহার কাছে সে আশায় যাইব! তবে তাঁহার দয়া ও স্নেহ অসীম, এই আমার ভরসা।"

বৃদ্ধ সওদাগর বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। দূরে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার বাড়ীর দিকে কে একজন লোক আসিতেছে। আস্তে আস্তে সে ঐ বাড়ীর দিকে আসিতেছে। সে নিকটে আসিতেই চিনিতে পারিলেন পরিষ্কার তাঁহার সেই হতভাগ্য ছোট ছেলে। তখন দৌড়িয়া গিয়া সওদাগর তাহাকে বুকে ধরিলেন। ছেলে যে মনে করিয়া আসিয়াছিল যে, তাঁহার পায়ে পড়িয়া সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিবে, তিনি সে সময়টুকুও তাহাকে দিলেন না। আজ্ঞা পাইয়া অবিলম্বে দাসদাসীগণ তাহার জন্য অতি সুন্দর পোষাক আনিয়া হাজির করিল। তাহার হাতে অঙ্গুরীয় ও পায়ে জুতা পরান হইলন। তখন নানা প্রকার সুস্বাদুখাদ্যে সওদাগর তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিলেন। পরে তিনি তাঁহার গৃহের সমস্ত লোক জনকে উৎসবের আয়োজন করিতে বলিলেন। আজ তাঁহার বড়ই আনন্দের দিন। তাঁহার মৃত পুত্র ফিরিয়া আসিয়াছে, তাঁহার

তাহার অতি মলিন বেশ, অন্নাভাবে শরীর | হারানিধিকে তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন।
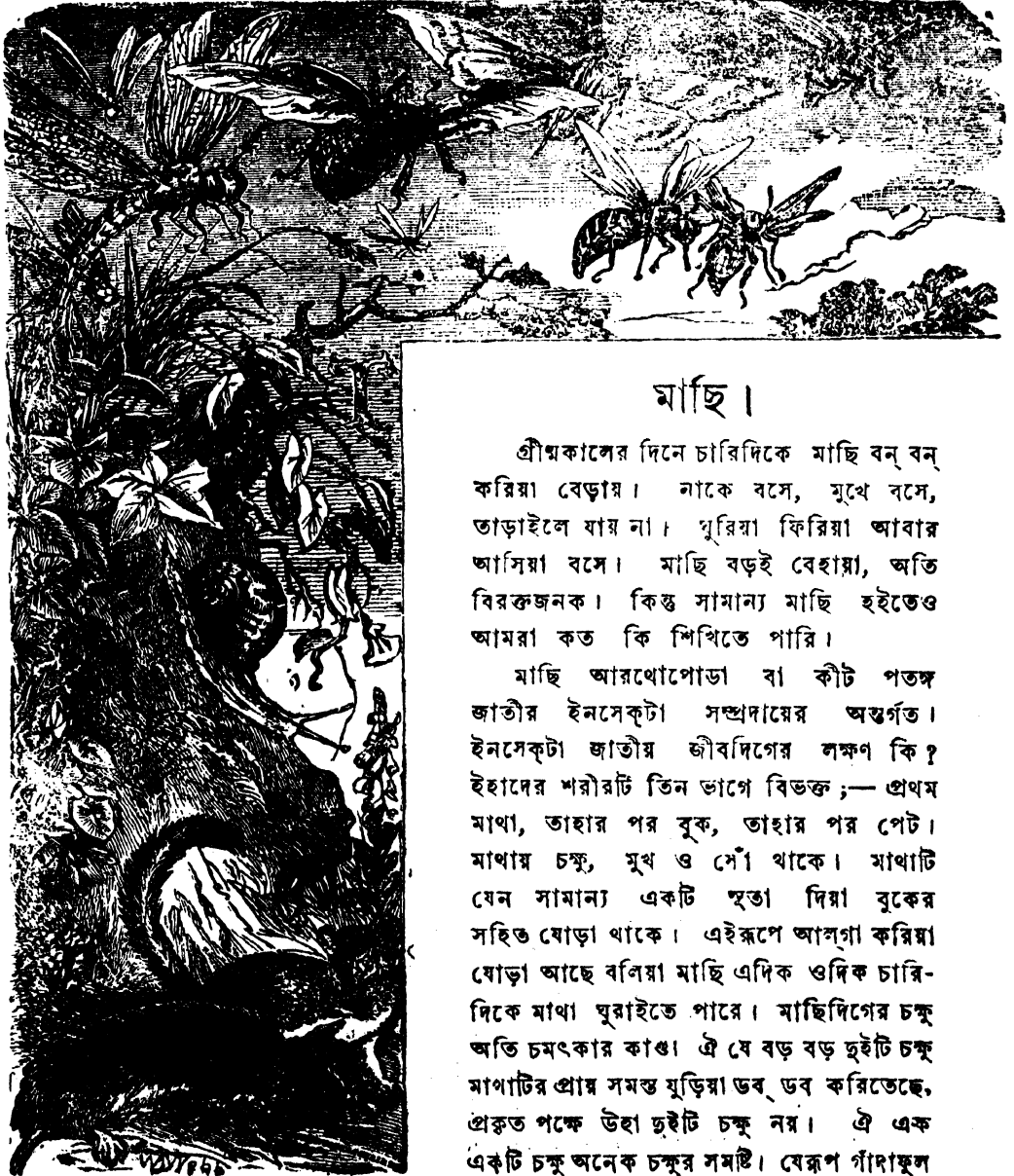
মাছি।

গ্রীষ্মকালের দিনে চারিদিকে মাছি বন্ বন্ করিয়া বেড়ায়। নাকে বসে, মুখে বসে, তাড়াইলে যায় না। ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিয়া বসে। মাছি বড়ই বেহায়া, অতি বিরক্তজনক। কিন্তু সামান্য মাছি হইতেও আমরা কত কি শিখিতে পারি।

মাছি আরথোপোডা বা কীট পতঙ্গ জাতীয় ইনসেক্টা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইনসেক্টা জাতীয় জীবদিগের লক্ষণ কি? ইহাদের শরীরটি তিন ভাগে বিভক্ত;— প্রথম মাথা, তাহার পর বুক, তাহার পর পেট। মাথায় চক্ষু, মুখ ও শোঁ থাকে। মাথাটি যেন সামান্য একটি সূতা দিয়া বুকের সহিত যোড়া থাকে। এইরূপে আল্গা করিয়া যোড়া আছে বলিয়া মাছি এদিক ওদিক চারিদিকে মাথা ঘুরাইতে পারে। মাছিদিগের চক্ষু অতি চমৎকার কাণ্ড। ঐ যে বড় বড় দুইটি চক্ষু মাথাটির প্রায় সমস্ত যুড়িয়া ডব্ ডব করিতেছে, প্রকৃত পক্ষে উহা দুইটি চক্ষু নয়। ঐ এক একটি চক্ষু অনেক চক্ষুর সমষ্টি। যেরূপ গাঁদাফুল

একটি ফুল নয় শত শত ফুলের সমষ্টি, সেইরূপ মাছিদিগের এক একটি চক্ষু প্রায় চারি

হাজার চক্ষুর সমষ্টি। মাছি মহাশয়েরা এই চারি হাজার চারি হাজার, আট হাজার চক্ষু দিয়া চারিদিক দর্শন করেন। তাই গায়ে বসিলে তাঁর কাছে হাতটি লইয়া যাইতে না যাইতে অমনি বিদ্যুৎ বেগে উঠিয়া পলায়ন করেন। মাথার সম্মুখে মাছিদিগের দুইটি সোঁ থাকে। গায়ের উপর বসিয়া মনের সুখে সোঁ দুইটি নাড়িতে থাকে। কীঠ পতঙ্গ-দিগের এই সোঁ দুইটি প্রাণ-স্বরূপ। মৌমাছি বা পিপীলিকারা যখন চরিতে যায়, তখন পথে আর একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরে এই সোঁ দিয়া আলিঙ্গন করে। সে লোকটি এই দলের লোক কি না, এই সোঁ দিয়া তাহা জানিতে পারে। এই সোঁ দিয়া কথা বার্ত্তা হয় কি না তাহা বলিতে পারি না। মৌমাছিদিগের সোঁ কাটিয়া দিলে তাহারা আর ঘর চিনিতে পারে না, চক্ষু থাকিতে ও তাহারা আর চাকে ফিরিয়া আসিতে পারে না অনেকের মত এই যে কীট পতঙ্গদিগের এই সোঁয়ে স্পর্শ শক্তি, শ্রবণ শক্তি ও আঘ্রাণ শক্তি নিহিত আছে। তাই বলিতেছি, যে, কীটপতঙ্গদিগের পক্ষে এই সোঁ দুইটি প্রাণ-স্বরূপ।

মাছিদিগের মুখ হাতির শুঁড়ের মত। কিন্তু এই মুখ দিয়া তাহারা কোনও বস্তু চিবাইতে পারে না, ইহা দ্বারা কেবল কোমল বস্তু ভেদ করিয়া তাহার রস চুসিয়া খাইতে পারে। আর মাছি গায়ে বসিলে, সেই যে সুড় সুড় করিয়া প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হয় ...নন্দটি আমরা এই শুঁড়ের প্রভাবেই পরিষ্কার...

উপভোগ করি।

এখন মাছির শরীরের মধ্যভাগের কথা বলিব। মাছিদিগের মাথায় মস্তিষ্ক অতি সামান্য, ইহাদিগের স্নায়ুমণ্ডল ও জ্ঞানবুদ্ধির অধিক ভাগ শরীরের এই মধ্যভাগেই নিহিত। তাই মাছিদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিলেও ইহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। মাথা কাটিয়া ফেলিলেও জ্ঞান বুদ্ধি থাকে। কারণ এই সময় একটি কাটি দিয়া ছুইলে উড়িয়া যাইবার চেষ্টা করে। গায়ে ধূলার রেণু ফেলিয়া দিলে ঝাড়িয়া ফেলে। মক্ষিকাদিগের তিন যোড়া পা। সকল পা গুলিই এই শরীরের মাঝখানে, শরীরের অপর অংশে একটিও পা নাই। মাছিদের দুইটি পাখা আছে। সেই জন্য এই

জাতীয় পতঙ্গদিগকে ডিপটেরা (Diptera) দ্বিপক্ষ বলে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পাখা দুইটী দেখিতে অতি চমৎকার। পাখা দুইটি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমে আবৃত। জলে ধূলায় পাখা দুইটি নষ্ট না হইয়া যায় সেই জন্য এইরূপ লোমে আবৃত। অনেক জাতীয় পতঙ্গদিগের চারিটি পাখা থাকে, মাছিদের কেবল দুইটি। কিন্তু এই দুইটি পাখার পাশে আর দুইটি অতি ছোট পাখা আছে। নৌকার যেরূপ হা'ল, এই ক্ষুদ্র পাখা দুইটি মাছির শরীরে সেইরূপ। ইহার সহায়তায়

উড়িবার সময়ে মক্ষিকা আপনাকে এদিকে ওদিকে চালাইতে পারে। এই পক্ষের উপরিভাগে এক প্রকার গঠন আছে। ...র মত এই যে, উড়িবার সময় এই আঁইস হইতেই বন্ বন্ করিয়া শব্দ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তাহা নহে, পাখার ঘর্ষণেই এইরূপ শব্দ হয়। পাখীরা সম্মুখের দিকে উড়িয়া যাইতে পারে, উপরে উঠিতে পারে ও নীচে নামিতে পারে। মাছিদের কিন্তু আরও অধিক ক্ষমতা আছে। মুখ না ফিরাইয়া আশে পাশে উড়িয়া যাইতে পারে, পিছনদিকেও উড়িয়া আসিতে পারে। মক্ষিকার ঝাঁকে তাড়া দিলে এই রহস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীরের গায়ে, কাচের সারসির উপর কিংবা ঘরের ছাদের উপর মক্ষিকারা অনায়াসে উঠিতে পারে, নীচেও নামিতে পারে। ইহারা পড়িয়া যায় না। ঘরের কড়ি-কাঠের উপর বসিয়া, নীচের দিকে আমাদের পানে চাহিয়া মক্ষিকারা কি মনে করে, কে জানে? তখন তাহাদের চক্ষে আমাদিগকে উল্টা দেখায়। তাহারা হয় তো ভাবে যে দুইটা পা দিয়া মাটির উপর আমরা ঝুলিতেছি! অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে জানিতে পারা যায় যে মাছিদের ছয়টি পা অতি আশ্চর্য্য ভাবে গঠিত।

সেই জন্য অতি মসৃণ খাড়া স্থানে ইহারা এরূপ চলিতে ফিরিতে পারে। ইহাদের পা সাত ভাগে বিভক্ত; এই সাতটি ভাগ পরস্পরের সহিত যোড়া। পায়ের উপর অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম। প্রতি পায়ের শেষভাগে দুইটী করিয়া থাবা। এই থাবার মাঝখানে মখমলের মত একপ্রকার কোমল পদার্থ আছে। পূর্ব্বকালের পণ্ডিতগণ মনে করিতেন যে, থাবার এই মখমল কাচ প্রভৃতি পিচ্ছল বস্তুর উপর সবলে লাগাইয়া মক্ষিকারা অনায়াসে ইহাদের উপর দিয়া চলিতে পারে। কিন্তু ইদানিং পণ্ডিতগণ আরও বিচক্ষণতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, থাবার এই মখমলের পাশে অনেক

গুলি সোঁ আছে। এই সোঁয়ার অগ্রভাগ চেপটা ও বাটির মত। এই কারণে উহা কাচ প্রভৃতি বস্তুর উপর চাপিয়া দিলে সে স্থানের বায়ু দূরীভূত হয়, তাহাতেই মক্ষিকার পা যেন এই সমুদয় মসৃণ পদার্থের উপর যুড়িয়া যায়। আরও কথা এই যে, মাছির পায়ের এই স্থানে অনেক গ্রন্থি (Gland) আছে। তাহা হইতে এক প্রকার আটার মত পদার্থ নির্গত হয়। সেই আটার জন্য মাছির পা কাচ প্রভৃতি বস্তুর উপর ঈষৎ যুড়িয়া যায়।

যাঁহারা রেশম কীটের পরিচয় অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, মক্ষিকা প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গদিগের জীবন কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল। ইহাদের জীবনের প্রথম অবস্থা হইল অণ্ড। প্রজাপতির ডিমের মত মক্ষিকার ডিম গোলাকার নয়, ঈষৎ লম্বা। ইহা এক প্রকার আবরণে বা 'মেম্ব্রেণে' ঢাকা থাকে। দুর্গন্ধময় অথবা পচা স্থানে মক্ষিকারা অণ্ড প্রসব করে। এই অণ্ড হইতে পোকার উৎপত্তি হয়। সুতরাং

মক্ষিকা জীবনের দ্বিতীয় অবস্থা হইল পোকা। এই পোকা দেখিতে ঠিক মুড়ির মত। ইংরাজিতে ইহাদিগকে ম্যাগট (Maggot) বলে।

পচিত দুর্গন্ধময় পদার্থ ভক্ষণ করিতে ইহারা অতিশয় ভাল বাসে। ইহাদের ক্ষুধার যেন কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। অন্যান্য পতঙ্গের পোকা অনেক বার চর্ম্ম বা খোলশ ছাড়ে, কিন্তু মক্ষিকার পোকা তাহা করে না। ইহারা একবার মাত্র খোলশ ছাড়িয়া থাকে। পোকা-জীবনের শেষ অবস্থায় গুটিপোকা আপনার শরীরের চারিদিকে রেশমে আবৃত করে। এই অবস্থায় জড়ভাবে তাহারা কিছুদিন নিদ্রা যায়। তাহার পর প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। মক্ষিকা পোকার শেষ অবস্থায় ইহাদের শরীর এক প্রকার কঠিন খোলায় আবৃত হইয়া পড়ে। পতঙ্গদিগের এই অবস্থাকে ক্রুসালিস (Chrysalis) অর্থাৎ গুটি বলে। কাল পূর্ণ হইলে ইহার ভিতর হইতেই পক্ষযুক্ত মক্ষিকা বাহির হয়। সুতরাং পতঙ্গ জীবনের চারিটী অবস্থা আছে ;—(১) ডিম্ব, (২) কীট, (৩) গুটি, (৪) পূর্ণাবয়ব পতঙ্গ।

মক্ষিকারা নানা অপরাধে অপরাধী তো বটেই ; চিরকাল ইহারা গালি খাইয়া আসিতেছে। মাছির ভ্যান্‌ভ্যানানি কে আর ভাল বাসে বল? বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প[illegible]পর মক্ষিকা গিয়া [illegible]স, সেই মক্ষিকা [illegible]ত্র গিয়া সেই রোগের বিস্তার ক[illegible]হাও মানিলাম [illegible]ন্তু মক্ষিকা যে মানবকুলের কোনও উপকারে আসে না এ কথা আমি মানি না। চারিদিকে দুর্গন্ধময় পচা দ্রব্য রাখিয়া মনুষ্যেরা আপনার শরীর বিষাক্ত করে। মক্ষিকারা সেই পচা দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া মানুষের বিশেষ উপকার করে। আমাদের এই বায়ুতেও নানরূপ উৎকট রোগের বিষাণু সমুদয় সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে। মক্ষিকারা সেই সমুদয় বিষাণু খাইয়া মনুষ্যকুলের জীবন রক্ষা করে। পূতিগন্ধ বিষময় দ্রব্য দ্বারা আপনাদিগের ঘর ঘিরিয়া রাখিও না। তোমাদের জীবনের রাক্ষসস্বরূপ সেই বিষাণুকে খাইতে না পাইলে মক্ষিকা সে স্থানে যাইবে না।

মক্ষিকা ঘোরতর বিরক্তিজনক হইলেও উহা হইতে মানবকুলের কথঞ্চিৎ উপকার হয়।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়, এফ, এল, এস্।

সিমলা পাহাড়।

তোমরা সকলেই সিমলা পাহাড়ের নাম অবশ্যই শুনিয়াছ। গ্রীষ্মের হাওয়া বহিতে আরম্ভ হইলেই বড় লাট বাহাদুর নিজের অমাত্যবর্গ ও কর্ম্মচারীর দলবল লইয়া এই স্থানে যাইবার জন্য ব্যস্ত হন, এবং সাত মাস কাল এখানে কাটাইয়া শীতের প্রারম্ভেই পুনরায় নামিয়া আইসেন। বড় লাট এবং তাঁহার অধীনস্থ বড় বড় সাহেবেরা গ্রীষ্মকালে সহরের দারুণ উত্তাপ সহ্য করিতে পারেন না, কারণ বিলাতে এত অধিক গরম তাঁহারা কখনও ভোগ করেন নাই। সিমলা পাহাড়ে বার মাস শীত ; সুতরাং এখানে তাঁহারা অনেকটা স্বদেশের মত বোধ করেন, তাঁহাদের শরীর সুস্থ থাকে, এবং রাজ কার্য্যেরও সুবিধা হয়। এই সকল উচ্চপদস্থ সাহেবদিগের সহিত তাঁহাদের আফিষের অনেক বাঙ্গালী বাবুরাও সিমলায় যাইতে পান ; সরকারী খরচে তাঁহারাও বেশ আরাম সম্ভোগ করিয়া থাকেন। এখন

উচ্চ। সিমলায় যাইবার পথ ধরিতে গেলে বড়ই দুর্গম; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সুবন্দোবস্তে এখন তাহা অনেক সহজ হইয়াছে। রেলগাড়ীতে কাল্‌কা পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। কাল্‌কা ঠিক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এখান হইতে পাহাড়ে উঠিতে হয়। পাহাড়ের উপর দিয়া ২৯ ক্রোশ চলিলে তবে সিমলায় পৌছান যায়। এইটুকু যাওয়াই কষ্টকর। পূর্ব্বে "ঝাঁপান" বা চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া এই পথে যাইতে হইত। এখন টমটমের মত এক প্রকার ছোট দুই চাকার গাড়ী হইয়াছে। ইহার নাম "টঙ্গা"। টঙ্গা দুই ঘোড়ায় টানে। ইহাতে সম্মুখে চালক লইয়া দুই জন ও পশ্চাতে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া দুই জন বসিতে পারে। ইহা বেশ দ্রুত চলে এবং কাল্‌কা হইতে ৮ঘণ্টায় সিম্‌লা পৌছে। ৫।৬ মাইল অন্তর ঘোড়ার ডাক আছে তাহাতে "টঙ্গার" ঘোড়া বদল হয়। পাহাড়ের উপর দিয়া কি করিয়া ঘোড়ার গাড়ী চলিবার রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়। পাথর কাটিয়া পাহাড়ের গায়ে এই রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহাতে এত ব্যয় হইয়াছে যে, বোধ হয় রাস্তার একটি টাকা পরিমাণ অংশ তৈয়ার করিতে এক টাকা পড়িয়াছে। রাস্তার পরিসর তত বেশী নহে; কোন ক্রমে এক খানি "টঙ্গা" যাইতে ও আর এক খানি আসিতে পারে। যেমন একটি বৃহৎ ও উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় উঠিবার সিঁড়ি প্রস্তুত করিতে হইলে তাহা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ক্রমশঃ উন্নত করা হয়, এ রাস্তা ও ঠিক সেই প্রকার পাহাড়ের গাত্র বেষ্টন করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। তবে স্থানে স্থানে যেখানে এক পাহাড় ছাড়িয়া আর এক পাহাড়ে উঠিয়াছে সেখানে রাস্তা আবার নামিয়া আসিয়াছে। পাহাড়ের গা কাটিয়া যখন রাস্তা হইয়াছে তখন বুঝিতেই পারিতেছ যে, রাস্তার এক ধারে উচ্চ পাহাড় আর এক ধারে গভীর উপত্যকা বা "খড"। [illegible] ভীর [illegible] থাকে। [illegible] পাথর সাজান আছে। [illegible] পড়িয়া যাইবার সম্ভা[illegible] কোন কারণে একটু এই দিকে ঝুঁকিলেই আর নিস্তার নাই। রাস্তা হইতে কেহ পড়িয়া গেলে পাথরের আঘাত খাইতে খাইতে সে যখন খড়ে পৌছায় তখন বোধ হয় তাহার দেহ ধূলিবৎ হইয়া যায়। এই ত এক আশঙ্কা; তারপর পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড রাস্তার উপর এমন ভাবে ঝুলিয়া আছে যে দেখিলেই মনে হয় এই বুঝি খসিয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে বর্ষাকাল ব্যতীত এরূপ বিপদ বড় একটা ঘটেনা, তবে ঘটা আশ্চর্য্যের কথা নহে। এই রাস্তায় চলিতে চলিতে স্তরে স্তরে সজ্জিত বৃক্ষরাজি ও ঝরণা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতের এই বিচিত্র শোভা দেখিলে বিধাতার শিল্প নৈপুণ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া মন আপনিই মুগ্ধ হয়।

সিমলায় পৌছিবার পূর্ব্বে পথে সৈন্য থাকিবার অনেক গুলি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে মুশুরি পাহাড় ভিন্ন আর কোনটির নাম তত প্রসিদ্ধ নহে। প্রায় ৫।৬ মাইল দূর হইতে সিমলা দেখিতে ঠিক একখানি ছবির মত। কোন একটি গ্যালারীতে থাকে থাকে যেমন লোক বসে, পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে তেমনি বাটী সাজান। গাছপালার ভিতর থাকে থাকে সারি সারি নানা রংএর বাড়ি সাজান, আর মধ্যে মধ্যে উচ্চনীচ পথ; দেখিলে বোধ হয় যেন সব তুলি দিয়া আঁকা। কোন স্থানে ঝরণার জল পড়িতেছে, কোন বাটী হইতে বা ধূম উঠিতেছে,—দূর হইতে সিমলার এই দৃশ্য দেখিতে বড়ই সুন্দর। নিকটে পৌছিলে প্রথমেই অতি উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর লাটসাহেবের রাজপতাকাযুক্ত বৃহৎ

সিমলা।

আছে। তারপর প্রায় সমান উচ্চে স্থিত সাহেবদের গির্জ্জা দেখা যায়। ক্রমে অন্যান্য পাহাড়। ইহা ঘন বৃক্ষরাজিতে আচ্ছাদিত, সুতরাং বড়ই মনোরম স্থান। ইহার শিখরে এক

[illegible] ছুটির [illegible] অসংখ্য বানরের আড্ডা। অনেক লোক ঘোড়া প্রভৃতি লইয়া [illegible] ডাকিয়া [illegible] এবং [illegible] কৌতুক দেখেন [illegible] এবং পেট [illegible] করিতে হয়। [illegible] এই দুই খান আমাদের এখানকার [illegible] মাসের [illegible] শীত কালে প্রায়ই জিনিষের ও [illegible] এখানে মধ্যে মধ্যে বরফ পড়িয়া থাকে। বরফ পড়িলে বৃক্ষাদি ও রাস্তার এক অপূর্ব্ব শোভা হয়। গাছের পাতায় ও শাখায় যেন মুক্তা ঝুলিতে থাকে, এবং পথগুলি যেন তুলাদ্বারা আবৃত বোধ হয়। বর্ষাকালে কুআশার ন্যায় মেঘ চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং দুয়ার জানালা খোলা থাকিলে ঘরের ভিতরও প্রবেশ করিয়া বস্ত্রাদি ভিজাইয়া দেয়। এই সময় নিকটের জিনিসও দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃষ্টির পর মেঘের শোভা দেখিতে আরও প্রীতিকর। তখন কুআশা কাটিয়া যায় ও সব দিক বেশ পরিষ্কার হয়। কেবল স্থানে স্থানে পাহাড়ের গায়ে খণ্ড খণ্ড মেঘ শুভ্র তুলারাশির ন্যায় লাগিয়া থাকে। বোধ হয় যেন লোকালয় হইতে তাড়িত হইয়া তাহারা পাহাড়ের কোণে লুকাইতে চেষ্টা করিতেছে। আবার একটু বাতাস হইলেই তাহারা নড়িয়া গুড়ি গুড়ি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়। মেঘের এই খেলা দেখা সিমলায় একটি বিশেষ আমোদ।

সিমলায় আর একটি সুন্দর দৃশ্য, চির-তুষারাবৃত পর্ব্বত শ্রেণীর। এই সকল পাহাড় সিমলা হইতে অনেক দূরে। তাহারা এত উচ্চ যে সেখানে বার মাসই বরফ পড়িয়া আছে। বরফ ঢাকা এই সকল পাহাড়ের উপর প্রভাত সূর্য্যের কিরণ পড়িলে ঠিক যেন বিশুদ্ধ হীরক রাশির ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে। প্রথমে সিমলায় যাইয়া এই শোভা দেখিলেই কিছুকাল চকিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। সিমলার [illegible]

[illegible]

সিমলার অধিবাসীরা [illegible] বড় বেশ ফরশা এবং চেহারাও মন্দ নহে। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই গায়ে জামা পরিয়া থাকে। এই সকল পাহাড়ীরা কেহ বা কৃষিজীবি, কেহ বা মহিষ ও গরুর দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পাহাড়ে কি প্রকারে ফসল জন্মে তাহা জানিবার জন্য তোমরা উৎসুক হইতে পার। পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মত কতক গুলি ধাপ কাটিয়া তাহাই শস্য ক্ষেত্র করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে কত কষ্ট এবং শস্যও কত কম হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পার। ফল কথা, শস্যাদি প্রধানতঃ অন্যান্য স্থান হইতে আমদানি হইয়া থাকে। এখানে বা[illegible] বাণিজ্যের প্রধান বাহন উট ও খচ্চর; তাহারাই নিম্ন দেশ হইতে জিনিস পত্র বহিয়া আনে। উটের সংখ্যাই অধিক; তাহারা একটির পর আর একটি সারি বাঁধিয়া চলে, দেখিতে বড়ই সুন্দর

বড় লাট ও প্রধান সেনাপতি ব্যতীত আর কেহ নিজ সিমলা পাহাড়ে ঘোড়ার গাড়ি চড়িতে পারেন না; কারণ, রাস্তা বড় সঙ্কীর্ণ ও বিপদ জনক। অন্যান্য লোকে ঠেলা গাড়িতে বা ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়। এখানে ঘোড়ায় চড়ার বড়ই ধুম, বিশেষতঃ ইংরাজ রমণীদের তাহাতে অধিক আগ্রহ দেখা যায়। লোকে বলিয়া থাকে সিমলায় ঘোড়া, ঠেলা গাড়ি, কুকুর ও বিবির আড্ডা। বাস্তবিক এখানে এই কয়টি জিনিসের বড়ই আধিক্য। এক সময় সিমলা পাহাড় একটি প্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এখন বহু লোকের সমাগম হওয়ায় আর সেরূপ নাই, সকল প্রকার ব্যারামই এখন এখানে হইয়া থাকে। তত্রাচ তুলনায় অনেক স্থান অপেক্ষা এখনও সিমলা ভাল আছে।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ, বি, এ।

নিম্ন লি...

কোন কোন ... নাম লুকান আছে, বাহির কর।

ক। এ বিষয় তুমি রটনা করিয়া বেড়াইতেছ কেন ?

বিভু পালন কর্ত্তা সর্ব্ব বিশ্বের।

তুলা ও পাট নানা দেশ হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়।

। তোমার যেমন ইচ্ছা পুরস্কার দিও।

। সে আমার নিকট কখনও আইসে নাই।

। তোমার মিছা পরামর্শ করা।

২

...ঙ্গের সর্ব্বোজ্জল কবি কে ?

... বড় সোজা লেখক নহেন ?

বঙ্গের বহুমুল্য কবি কে ?

বঙ্গের নুতন কবি কে ?

কোন্ লেখক চিরস্থায়ী ?

৩

এলো মেলো অক্ষর রহিয়াছে, ঠিককরিয়া বসাইয়া লও।

ক। ধরি লাগিব।

ঘ। বিশ্ব চর ...

৪

ক। কোন ভদ্রলোক ৭টী বোম্বাই আমের চারা ক্রয় করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা এই ৭টী গাছ তাঁহার বাগানে ৬ সারে রোপন করেন। প্রত্যেক সারে আবার তিনটা করিয়া গাছ থাকিবে। কি করিয়া করিবেন বলিয়া দাও।

খ। এক সাহেব কোন স্বর্ণ কারকে হীরা বসান একটী সোনার ক্রুশ (+) মেরামত করিতে দেন। তিনি গুনিয়া দেখিলেন যে ক্রুশের নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত ৯টী হীরক খণ্ড বাসান আছে। এবং নীচ হইতে প্রত্যেক বাহুর শেষ পর্য্যন্তও ৯টী হীরক আছে। স্বর্ণকার গৃহে গিয়া তাহা হইতে দুইটী হীরক চুরি করিয়া লইয়া ক্রুশটী মেরামত করিয়া লইয়া আনিল। সাহেব পূর্ব্বে যেরূপ হীরাগুলি গুনিয়া রাখিয়াছিলেন, এবারও গুনিয়া দেখিলেন সেইরূপ ৯টা করিয়া রহিয়াছে। স্বর্ণকার কি ভেল্কি করিল ?

পড় দেখি